গৌড়ীয় প্রবন্ধ-মালা

চতুর্থ খণ্ড

সংগ্রাহক :—

শ্রীভক্তিভূষণ ভারতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা

চতুর্থ খণ্ড

সংগ্রাহক ঃ—

শ্রীভক্তিভূষণ ভারতী

প্রথম সংস্করণ ঃ

প্রকাশকঃ

শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবাশ্রম।

শ্রীধাম গোদ্রুম ; নবদ্বীপ

পোষ্ট ঃ স্বরূপগঞ্জ

জেলা—নদীয়া।

পিন কোড নং—৭৪১৩১৫

ফোন নং—০৩৪৭২—২৪৮১৫৯

প্রকাশ কাল ঃ—

শ্রীগুরুপূর্ণিমা বা শ্রীব্যাস পূর্ণিমা

শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন পরিক্রমা

শ্রীল সনাতন গোস্বামী পাদের তিরোভাব তিথি।

২৯ বামন, ১৫১৮ গৌরাব্দ,

১৮ই আষাঢ়, ১৪১১ সন

২রা জুলাই ২০০৪ খৃঃ

এই গ্রন্থ বিক্রয় হয় না, শ্রদ্ধামূল্যে বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বিনম্র নিবেদন

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটস্সুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু বঃশচীনন্দনঃ।"

(চৈঃ চঃ ১।১।৪)

সুবর্ণকান্তিসমূহদ্বারা দীপ্যমান শচীনন্দন শ্রীগৌরহরি তোমাদের হৃদয়ে স্ফূর্তি লাভ করুন। তিনি যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বলরস জগৎকে কখনও দান করেন নাই, সেই স্বভক্তি-সম্পত্তি দান করিবার জন্য কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

পরমকরুণাময় মহাভাব শিরোমণি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর জগতে এসেছিলেন মহাপ্রেম অর্থাৎ উন্নত উজ্জ্বলরস দান করবার জন্য। কারণ এই উন্নত উজ্জ্বলরস শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অত্যন্ত সুদুর্লভ সম্পদ। আবার সে সম্পদের মালিক তিনি নিজেও নহেন। সেই সম্পত্তির একচেটিয়া মালিক করুণাময়ী মহাভাবময়ী-শ্রীমতি রাধাঠাকুরাণী। তাঁর কাছ থেকে তিনি ধার করে অর্থাৎ তাঁর ভাব ও কান্তি নিয়ে শ্রীগৌরহরি এসেছেন, সেই প্রেম আস্বাদন করবার জন্য। আস্বাদন করতে গিয়ে তিনি এতই বিহ্বল হয়ে পড়েছেন যে কখনও

হয়েছেন কূর্ম্মাকৃতি কখনও যমুনা ভ্রমে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছেন দীঘল শরীরে। কখনও সারারাত্রি গম্ভীরার ভিত্তিতে শ্রীমুখ ঘর্ষণ করে হয়েছেন ক্ষত বিক্ষত। কি সেই মহা আনন্দ, মহাপ্রেম, মহাভাব, যার জন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এই ভাব দশা। যা আস্বাদন করেছেন শ্রীস্বরূপ ও রামরায়, রঘুনাথ. ও অন্যান্য শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গ এবং সেই সম্পদের ভিতরে আছে আরও সুগোপ্য রহস্য তা হলো মঞ্জরীভাব। যে মঞ্জরী ভাবে মহাভাবের সমস্ত আনন্দ মঞ্জরীগণ আস্বাদন করেছেন এবং যা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, এমনকি সখীগণ চন্দ্রাবলী আদিরও সুদুর্ল্লভ। সেই মহাভাব সম্পদ শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গ আস্বাদন করে জগতে গ্রন্থাকারে দান করে গেছেন ও তা পাওয়ার উপায় উদ্‌ঘাটন করে গেছেন।

নিত্যবদ্ধ জীব অনাদি কাল হতে স্ব-সুখ বাসনায় তাড়িত হয়ে নিজ দেহ সুখের অনুসন্ধান করতে করতে দেহেতেই অভিনিবিষ্ট হয়ে পড়েছে। দেহাভিনিবেশই তার ভজনের বাধা। যখন সাধক ভজন করতে আসে তখন যদি ক্রমধরে ভজন না করে এবং রূপ-রঘুনাথের ভজন প্রণালী সঠিকমত অনুশীলন না করে তবে সে দুর্ল্লভ বস্তু লাভ করতে পারবে না এবং সাধনক্রিয়া,সাধনভক্তি, ভাবভক্তি. প্রেমভক্তির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিচার ধরতেও পারবে না। তাই সাধন ক্রিয়াকে সাধনভক্তি মনে করে এবং ভাব ভক্তি যে কত দুর্ল্লভ তা জানতেও পারে না। ভাবভক্তি লাভ হলে জগতের সমস্ত বস্তু তুচ্ছাতিতুচ্ছ বোধ হয়। তাই শ্রীলরূপ গোস্বামী চরণ জানিয়েছেন,—

"মনাগেব প্ররূঢ়ায়াং হৃদয়ে ভগবদ্রতৌ।
পুরুষার্থাস্তু চত্বারস্তৃণায়ন্তে সমন্ততঃ॥" (ভঃ রঃ সি ১।১।৩৩)

অর্থাৎ "হৃদয়ে বিন্দুমাত্র ভগবদ্‌রতির উদয় হইলেই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয় তৃণবৎ মনে হয়।" শ্রীমৎ রূপ-গোস্বামিপাদ শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করে বলেছেন,— হরিভক্তি মহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদি সিদ্ধয়ঃ। ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যা-চেটি-কাবদনুব্রতাঃ॥" অর্থাৎ "মুক্তি প্রভৃতি সিদ্ধি সকল, অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয় ভোগাদিও শ্রীহরিভক্তিরূপা মহাদেবীর দাসীর ন্যায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকে।"

সুদুর্ল্লভা যথা—

"সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।
হরিণা চাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা সাৎ সুদুর্ল্লভা॥"

(ভঃ রঃ সিঃ ১।১।৩৫)

বহুকাল যাবৎ অনাসঙ্গ বা আসক্তি বিরহিত সাধন সমুহ দ্বারাও হরিভক্তি লভ্য নহে, আবার আসক্তি যুক্ত হয়ে সাধন করিলেও শ্রীহরি উহা শীঘ্র প্রদান করেন না। কিন্তু বিলম্বে দান করেন বলিয়া উহা সুদুর্ল্লভা।" যতক্ষণ পর্যন্ত গাঢ় আসক্তি জাত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রীহরি উহা প্রদান করেন না। "যাবৎ ফলভূতে ভক্তিযোগে গাঢ়াসক্তির্ন জায়তে তাবন্ন দদাতীত্যর্থঃ।"

(শ্রীজীবপাদ ভঃ রঃ সিঃ ১।১।৩৭ টীকা)

শ্রীজীবপাদ আরও লিখিয়াছেন— "নাযোগ্য সহসা দাতুং যোগ্যেতি, যাবদযোগ্যতা তাবদ্ ভগবতা ন দীয়ত এব যোগ্যতা চ সর্ব্বান্যস্বহিতনিরপেক্ষত্বমেব।" (ভঃ রঃ সিঃ ১।১।২২ টীকা)।

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ অযোগ্য পাত্রে সহসা প্রেমভক্তি দেন না উহা যোগ্য পাত্রেই দিয়া থাকেন। যোগ্যতা হইতেছে একমাত্র শ্রীহরি-ভক্তিই নিজের মঙ্গল, ভক্তি ব্যতীত অন্য স্বহিত সর্ব বিষয়ে নিরপেক্ষতা।"

শ্রীভক্তিবিনোদ ধারায় মহা কৃপালু শ্রীগুরুবর্গ সাধক যাতে ভজন করে সিদ্ধিলাভ করতে পারে, তার জন্য বিপুল শ্রীহরি কথা প্রচার করেছেন এবং তা' প্রবন্ধাকারে লিখে গেছেন। বিশেষ করে এই গ্রন্থে 'ভাড়াটিয়া', 'প্রভুপাদ ও দৃগ-দৃশ্য বিচার', 'আনুগত্য', 'শ্রীল প্রভুপাদ ও রাধাদাস্য', 'শ্রীল প্রভুপাদ ও ভক্তি সিদ্ধান্ত', 'সেবাবিঘ্ন ও সেবোৎসাহ' ও অন্যান্য বহু প্রবন্ধে বহু অমূল্য সিদ্ধান্ত এই গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছেন।

ভাড়াটিয়া প্রবন্ধে ভাড়াটিয়া ভক্ত (?) নিজ নিজ ভাড়াটিয়া শরীরের ভাড়া আদায় করিয়া লইতেছেন। আদায়ীভাড়াগুলি নিজ প্রতিষ্ঠা, নিজ কনকার্জ্জন, নিজ কামিনী অর্জ্জন কার্যে লাগাইয়া দিয়া গৌরভক্তি লাভ করিতেছেন মনে করেন। যে ভাড়াটিয়ার মাশুল বা বেতন যত বেশী সেই ভাড়াটিয়া ততোধিক ভক্তিপথ হইতে ভ্রষ্ট। গুরু বৈষ্ণবের নিকট হতে যিনি যতটা অধিক পরিমাণে কনক, কামিনী, বা প্রতিষ্ঠাশারূপ ভাড়া আদায় করিয়াছেন, করিতেছেন বা করিবেন তিনি ততোধিক বঞ্চিত হইয়াছেন, হইতেছেন বা হইতে চাহেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ও দৃগ্-দৃশ্য বিচার প্রবন্ধে জীবের আপনাকে কৃষ্ণ-ভোগ্য দৃশ্য অভিমানই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। দ্রষ্টৃ, অভিমানে জগৎকে ভোগ্যজ্ঞান বা ভোক্তৃ অভিমানে অহংকার ফলে অমঙ্গল

লাভ হয়. জগতের প্রতি ভোগ্য দৃষ্টিতে অনুপাদেয়তা বা ভোগাত্ব দূর করিয়া সেব্যত্ব বা অপ্রাকৃতত্ব প্রকটন অর্থাৎ কৃষ্ণের সংসার ও গোকুল দর্শন জীবের নিত্য মংগল ও কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণ। 'আমি দ্রষ্টা নহি,— কৃষ্ণ দৃশ্য', 'আমি ভোক্তা নহি.—কৃষ্ণ-ভোগ্য' এই বিচারের সম্পূর্ণ বিপরীত বিচারে জগৎ প্রধাবিত।"

এই অমূল্য সম্পদ-রূপ বাণী এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই সমস্ত অমূল্য বাণী সাধক জীবের ভজন পথের অদম্য উৎসাহ, নব নব প্রেরণা ও নতুন আলোর পথ দেখাবে এবং বাণীই শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেম সেবা লাভ করাবেই করাবে ইহা আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবাশ্রমের সেবক-সেবিকাগণ এই গ্রন্থের বিবিধ সেবা সম্পাদন করেছেন। শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের শ্রীপাদপদ্মে তাঁদের উত্তরোত্তর ভজনোন্নতি প্রার্থনা করি।

অবশেষে সুধী পাঠক বৃন্দের শ্রীচরণে প্রার্থনা তাঁরা যেন এই গ্রন্থের মুদ্রণ জনিত-ত্রুটি বিচ্যুতির দিকে গুরুত্ব না দিয়ে গ্রন্থের সার নির্য্যাস গ্রহণ করেন, তাহলে আমাদের সকল শ্রম সার্থক হবে ও জীবন ধন্যাতিধন্য হবে।

নিবেদন ইতি—

শ্রীগোদ্রুম কানন কুঞ্জ | শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণব কৃপারেণু প্রার্থী
শ্রীগুরুপূর্ণিমা বাসর | দাসানুদাস
২রা জুলাই ২০০৪ | **শ্রীভক্তিভূষণ ভারতী।**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় প্রবন্ধমালা

(চতুর্থ খণ্ড)

সূচীপত্র

—০—

শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের উপদেশাবলী

১। কখনও মর্কটদের (বিরক্তবেশী যোষিৎসঙ্গী কপটী ব্যাক্তি-গণের) সহিত মিশিও না। ২। কখনও বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করিও না, করিলে বিষয়ী হইয়া যাইবে।
৩। গৌরধাম কৃপা করিলে ব্রজবাস হয়। ৪। সাংসারিক অম-ঙ্গলকে ভগবানের দয়া বলিয়া জানিবে। ৫। অন্তরে কৃষ্ণসেবার জন্য অনুরাগ না আসিলে বাহিরে বেষ গ্রহণ করিলেই তাহাকে 'সন্ন্যাসী' বলা যায় না। ৬। ভজনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের শরীরে কষ্টকর ব্যাধি সকল উপস্থিত হইলে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য না পাইয়া আপনা হইতেই পলাইয়া যায়। বাবু ও বিলাসিগণের শরীরে তাহা আদর পাইয়া অধিকদিন অবস্থান করে। ৭। 'সেবা করিয়াছি' বলিয়া অন্তরেও ঢাক পিটাইবার যত্ন করিও না ; তখন আর উহাকে সেবা বলা যাইবে না। ৮। নির্জ্জন-ভজনের ছলনায় অলস হইও না। ৯। অনবধানের সহিত লক্ষ লক্ষ মালা টানা অপেক্ষা বৈষ্ণবসেবার জন্য বাগান-চাষ ও গাছে জল দেওয়া অধিক মঙ্গলজনক ; বৈষ্ণবসেবার ফলে নামে অকপট রুচি হইবে। ১০। বৈষ্ণবের অনুকরণ করিও না, পুড়িয়া মরিবে ; তাঁহার অক-

পট সেবা যাচ্ঞা কর। ১১। হরিসেবার অর্থ ভোগ করিলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাষণ্ডী হইতে হয়। ১২। সাধারণ চোরের কখনও মঙ্গল হয়, কিন্তু গুরুবৈষ্ণবের অর্থ ভোগ-কারীর কখনও মঙ্গল হয় না। ১৩। সকল ভগবত্তত্ত্বের মধ্যে কৃষ্ণ যেমন সর্ব্বাপেক্ষা বঞ্চক, সেইরূপ সকল বৈষ্ণবাপেক্ষা রূপানুগ-বৈষ্ণব বঞ্চকতম। ১৪। অন্যাভিলাষের সহিত গুরুবৈষ্ণবের সেবা করিলে তাঁহারা সেবকাভিমানীকে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা দিয়া সরিয়া পড়েন। ১৫। 'যাহারা আমার সেবা করিয়াছে', তাহাদের পেটের জন্য কোন কষ্ট পাইতে হইবে না বা ভাবিতে হইবে না। যাহারা আমার নিকট উদরপূর্ত্তির রসদ আদায় করিয়াই সন্তুষ্ট হইল, তাহারা কৃষ্ণসেবা পাইবে না। ১৬। গৃহস্থ মাত্রেরই গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া গিরিধারীর অর্চ্চন করা কর্ত্তব্য। ১৭। নিরপরাধে শ্রীনাম-কীর্ত্তনই মহাপ্রভুর শিক্ষার সার। ১৮। গুরুবৈষ্ণবের অনুগত হইয়া গৌরনাম প্রচার করিবে। ১৯। আনুগত্যই শ্রেষ্ঠ সদাচার, স্বতন্ত্রতাই ভ্রষ্টাচার। ২০। হরিসেবায় কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও তৃপ্তিবোধ থাকিলে প্রকৃত সেবাবৃত্তি প্রকাশিত হয় না। ২১। সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বপ্রকারে সেবা করিয়াও অতৃপ্তিবোধ হইলে সেবাবৃত্তির উন্মেষ হয়। ২২। রাত্রি জাগরণ করিয়া সাধুসঙ্গে হরিবাসর পালন করিবে। ২৩। প্রতি হরিবাসরে আত্মপরীক্ষা করিবে, তোমার নিষ্কপট হরিভজনে আগ্রহ বৃদ্ধি হইতেছে, না অন্যাভিলাষ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিয়া গুরুবৈষ্ণবের চরণে আত্মনিবেদন করিবে। ২৪। হরিভজন করিতে হইলে সহিষ্ণু, অমানী, মানদ

হইবে এবং শত বাধা-বিঘ্নেও অবিক্লবমতি ও পরমোৎসাহী থাকিবে। ২৫। এক মুহূর্ত্তও হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তন ও বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত থাকিবে না, থাকিলেই মায়া গ্রাস করিবে। ২৬। সকল বস্তু ও ব্যাপারের দ্বারাই বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সেবার অনুসন্ধান করিবে। ২৭। সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাসের লেশও হৃদয়ে থাকিলে বৈষ্ণবাধিকার লাভ হয় নাই, জানিতে হইবে। ২৮। পরিছিদ্রান্বেষণের পরিবর্ত্তে নিজের গলদগুলি দূর করিবার চেষ্টা করিবে। ২৯। শরণাগত না হইলে শ্রবণ-কীর্ত্তন হয় না। ৩০। মহান্তগুরুগ্রহণ ও গুরুসেবা ব্যতীত মায়াজাল ছিন্ন হয় না। ৩১। কৃত্রিম স্মরণ-পদ্ধতি রূপানুগ-পথ নহে। ৩২। শ্রীনাম-কীর্ত্তনমুখে স্বাভাবিক স্মরণই গৌড়ীয়গণের সিদ্ধান্ত।

—০—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় প্রবন্ধ মালা

শ্রীভক্তিগ্রন্থের গ্রাহক ও পাঠকের প্রতি

শ্রীভক্তিগ্রন্থসমূহ অন্যান্য সাধারণ গ্রন্থের ন্যায় জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণের ইন্ধন নহে। এ-জন্যই বহির্ম্মুখতার সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত-বৃত্তি যে কৌতূহল পরিতৃপ্তি করিবার অভিলাষ অথবা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য বা প্রতিষ্ঠা অর্জন করিবার যে অভিসন্ধি, তাহা হৃদয়ে পোষণ করিয়া যাহারা ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিবার অভিনয় করে, সেই সকল অপরাধীর নিকট শ্রীভক্তিগ্রন্থের প্রকৃত সিদ্ধান্ত কখনই আত্মপ্রকাশ করেন না। বিশেষতঃ, তাহারা গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিচার ও আচার অনুসারে জীবন নিয়মন করিবার বল প্রাপ্ত হয় না। তাহারা ভারবাহী হইয়া গ্রন্থকীটের ন্যায় গ্রন্থের বিরাট্ রূপেই মুগ্ধ হইয়া থাকে।

ভক্তিগ্রন্থের মধ্যে বিভিন্ন অধিকারের ও স্তরের গ্রন্থ আছে। সুতরাং ভক্তিপথে যাঁহারা চলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সকল ভক্তিগ্রন্থ-পাঠের যোগ্য নহেন। অধিকার বা

যোগ্যতা নিজে নির্ণয় করিতে গেলে আত্মবঞ্চনা অবশ্যম্ভাবী। অতএব অযোগ্য বা অনধিকারী হইয়া 'যোগ্য বা অধিকারী হইয়াছি'—এইরূপ আত্মবঞ্চনামূলক ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের দ্বারা নিজের যোগ্যতা ও অধিকার নির্ণয় না করাইয়া স্বয়ং-নির্দ্ধারিত বা নিরূপিত, কল্পিত অধিকার বিচার হইতে কেবল মাত্র ভাষার সাহায্যে শ্রীভক্তিগ্রন্থ-অধ্যয়নে উদ্যম ও উৎসাহ অনর্থ-রোগেরই উপসর্গবিশেষ। যাঁহারা শরণাগত এবং যাঁহারা শ্রীমহন্মুখরিত শ্রীহরিকথা-শ্রবণের পূর্ব্বে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া মহতের সেবা করিয়াছেন এবং যাঁহারা সর্ব্বদা নিষ্কিঞ্চন মহতের পরিচর্য্যা ও প্রসঙ্গরূপা সেবায় সর্ব্বদা উন্মুখ, তাঁহারাই শ্রীভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিয়া মহতের কৃপায় অপ্রাকৃত গ্রন্থকারের হৃদ্গত অভিপ্রায় ও সারস্য উপলব্ধি করিতে পারেন। অতিমর্ত্ত্য গ্রন্থকারের হৃদ্গত অভিপ্রায়, বাহ্যপাণ্ডিত্য, মেধা বা বিদ্যা-বুদ্ধিদ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। শ্রীশ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপানুগবর শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামি-প্রভু 'শ্রীভাগবত-সন্দর্ভে' শ্রীমদ্ভাগবতের যেরূপ অভিপ্রায় বিবৃত করিয়াছেন, তাহা পৃথিবীতে কোন কালে কাহারও দ্বারা সম্ভব হয় নাই, হইবে না বা হইতে পারে না। সেই 'শ্রীমদ্ভাগবত সন্দর্ভে'র অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রাকৃত পাণ্ডিত্যের দ্বারা কেহ কেহ করিবার চেষ্টা করিতে পারে; কিন্তু তাহাতে তাহাদের গ্রন্থ-সারস্য উপলব্ধি হইবে না। তাহারা শিব গড়িতে বানর গড়িয়া ফেলিবে ও আত্মবঞ্চিত হইবে; কিছুতেই শ্রীশ্রীরূপানুগবর মহাজনের হৃদ্গত-ভাব উপলব্ধি করিতে পারিবে না, তাঁহার শ্রীচরণে অপরাধ করিয়া ফেলিবে।

যিনি সমগ্র-সত্ত্বা শ্রীরূপের শ্রীপাদপদ্মে আহুতি দিয়াছেন, যিনি কোটিপ্রাণের দ্বারা শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীজীবপ্রভুর শ্রীপাদ-পদ্ম নিত্য নিম্মঞ্ছন করিতেছেন, তাঁহারই নিকট শ্রীশ্রীজীবপ্রভু তাঁহার গুহ্যতম ভাণ্ডার উন্মুক্ত করেন। সুতরাং সমগ্র-সত্তা আহুতি-প্রদানরূপ গুরুদক্ষিণা না দিয়া কেবলমাত্র 'কৌতূহল-পরিতৃপ্তি, জ্ঞানসংগ্রহ বা অল্পায়াসে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তের চুম্বক আহরণ করিয়া লইব'—এইরূপ মনোভাব থাকিলে তাহার নিকট 'শ্রী ভক্তিসন্দর্ভে'র প্রকৃত মর্ম্ম নিত্যকাল আচ্ছাদিত থাকিবেন।

জড়বিদ্যা-অর্জ্জনকারিগণ যেইরূপ অধ্যাপকের সেবা না করিয়াও 'Made easy note' আট আনা বা এক টাকার বিনিময়ে ক্রয় করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, ভক্তিরাজ্যে সেইরূপ 'Made easy' করিবার চেষ্টা করিলে আত্মবঞ্চিত হইতে হইবে। সর্ব্বাত্ম-সমর্পণ ব্যতীত এই গ্রন্থরহস্য শত শতবার পাঠ করিবার অভিনয় করিয়াও ব্যর্থকাম হইতে হইবে।

শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু শ্রবণের পূর্ব্বে নীরাগ-বক্তা বা চিদ্‌বিলাসা-নুভবযুক্ত শ্রবণগুরুর শুশ্রূষার কথা বলিয়াছেন। সেই শ্রবণগুরুর সেবা ব্যতীত কখনও শ্রবণ হইতে পারে না। অতএব সমগ্র জীবনী শক্তি পরিচালনা না করিয়া নিষ্ফল পাঠের উদ্দেশে যে ত্বরাগ্রহ বা নিয়মাগ্রহ, তাহা শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের আদেশ, উপদেশ ও নির্দ্দেশের প্রতিকূল আচরণ-মাত্র।

যদি কেবল অর্থ বা অন্য কোন উপায়ে ভক্তিগ্রন্থ-সংগ্রহের সামর্থ্য থাকিলেই অপ্রাকৃত গ্রন্থের অনুভবযোগ্যতা-লাভ হইত,

তবে বণিক-সম্প্রদায় ও আধ্যক্ষিক সাহিত্যিক সম্প্রদায়ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত হইতে পারিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারা অর্থব্যয় বা নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়া বহু শাস্ত্রীয় প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহপূর্ব্বক শাস্ত্রগ্রন্থের যাদুঘর সাজাইলেও বা গবেষকরূপে গ্রন্থকীট হইলেও ভক্তিগ্রন্থের বিরুদ্ধ আচার ও প্রচারের দ্বারা তাঁহাদের জীবন পরিচালিত হয়। কয়জন গবেষক নির্গুণা ভক্তির অপ্রাকৃততত্ত্বে আকৃষ্ট হইয়াছেন? কয়জন ব্যক্তি গৃহব্রত-ধর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণব্রত হইয়াছেন? কয়জন নিষ্কিঞ্চন মহতের পাদরজে অভিষিক্ত হইয়া শ্রীভগবৎসেবানুরাগী হইয়াছেন? কয়জন জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীধর-স্বামী, তত্ত্ববাদগুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্য. বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ-গুরু শ্রীরামা-নুজাচার্য্য, তদুচ্ছিষ্টভোজী শ্রীকুরেশ, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদ-পদ্মে নিবেদিত-সর্ব্বাত্মা শ্রীশ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথদাস, শ্রীরঘুনাথভট্ট, শ্রীগোপালভট্ট বা শ্রীরূপের উচ্ছিষ্টভোজী অন্তেবাসী শ্রীজীবপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের রেণুগণের সেবা-লাভের জন্য একান্ত আর্ত্ত হইয়াছেন? বরং শুদ্ধভক্তিগ্রন্থের গবেষকের অভিমানে প্রাকৃত 'ডক্টরেট্' প্রভৃতি উপাধি-দ্বারা আবৃত হইয়া কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠাদি শৌকরী বিষ্ঠার লেহনকারী এবং শ্রীভগবান্, শ্রীভক্ত ও শ্রীভাগবতের বিরোধী পাষণ্ডী হইয়া পড়িয়াছেন! কেহ কেহ আত্মপ্রতিষ্ঠা-সংরক্ষণের জন্য মুখে ভক্তিশাস্ত্রের মর্য্যাদা প্রদর্শন করিলেও ভক্তিশাস্ত্রের দ্বারা প্রতিষ্ঠাদি অর্জ্জনের অভিসন্ধিরূপ 'শালগ্রামের দ্বারা বাদাম ভাঙ্গিয়া ভোজন করিবার' নীতির দাস হইয়া পড়িয়াছে! ইহাদের জীবনের কোন অংশেও ভক্তি বা

ভক্তের অকপট আচরণের কোন লেশ পাওয়া যায় না। কতকগুলি লোক প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া আচরণহীন প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠাকামী বাক্যবাগীশ বা সরাগ বক্তা হইয়া পড়িয়াছে। কেহ কেহ বা অপ্রাকৃতে প্রাকৃতত্ব আরোপ করিয়া সম্ভোগবাদের গুপ্ত ও ব্যক্ত দাস হইয়া পড়িয়াছে। কেহ বা ভক্তিগ্রন্থ আলোচনার দ্বারা জীবিকা-অর্জ্জনের চেষ্টা করিয়াছে এবং করিতেছে। কেহ বা ভক্তি-গ্রন্থ চর্চ্চাকে সংসারতপ্ত জীবনের উপভোগ্য শান্তি বা সাময়িক সম্ভোগপ্রদ বস্তুরূপে বরণ করিয়া শ্রীভক্তিদেবীর চরণে চির-অপরাধী হইয়াছে। যাহারা মহতের পরিচর্য্যা না করিয়া, আত্মসমর্পণরূপ গুরুদক্ষিণা প্রদান না করিয়া, কেবল কৌতূহল-পরিতৃপ্তি, গবেষণা পাণ্ডিত্য-অর্জ্জন বা অল্পায়াসে বৈকুণ্ঠরাজ্য জয় করিবার অভিলাষ করিয়াছে, তাহাদের সকলেরই ন্যূনাধিক দুরন্ত সংসার-লাভ হইয়াছে। তাহারা বাস্তব সত্যস্বরূপ আনন্দনিধির ভজনা না করিয়া বিরাটের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের আত্ম-পাত বা সংসাররূপ পুরস্কারই লাভ হইয়াছে।

ভক্তিপথের পথিকগণ শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে কায়িক, বাচিক ও মানসিক নিত্য আনুগত্য-স্বীকারকারী। তাঁহাদের ব্যক্তিগত কোনও স্বতন্ত্রতা নাই। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহাদের অকপট সেবোন্মুখতা-দর্শনে যখন যে যোগ্যতা অর্পণ করেন, সেই যোগ্যতা-অনুসারেই তাঁহারা তদনুরূপ ভক্তির অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হ'ন। গ্রন্থপাঠ বা স্বাধ্যায় ভক্ত্যনুশীলনবিশেষ। সুতরাং নিজেই নিজের যোগ্যতা স্থির করিতে গেলে আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিরূপ

কামের প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধি থাকিতে পারে, তদ্দ্বারা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ইন্দ্রিয়তর্পণ হয় না। যাহা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর নহে, যাহা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কার্য্য নহে, ব্যক্তিবিশেষের কার্য্য, তাহাতে ভক্তির আকার থাকিলেও তাহা ভক্তি নহে, ভক্তির আবরণ।

শ্রীগ্রন্থ ও শ্রীবিগ্রহ অভিন্নবস্তু। শ্রীগুরুদেব যেইরূপ শ্রীগিরিধারী, শ্রীশালগ্রাম বা শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন প্রদান করেন, সেইরূপ তাঁহারই নিত্যারাধ্য, প্রাণকোটিসর্ব্বস্ব ও তাঁহারই শ্রীমুখপদ্ম হইতে অবতীর্ণ শ্রৌতবাণী-বিগ্রহকে আরাধনা করিবার জন্য অধিকার-বিচারে সেইরূপ গ্রন্থরূপী শ্রীভগবদ্ বিগ্রহকে প্রদান করিয়া থাকেন। যাহারা সেই শ্রীবিগ্রহকে আজীবন সমগ্রসত্তা দিয়া আরাধনা না করেন, তাহারা অর্চ্চা-পরিত্যাগকারীর ন্যায় পাষণ্ডী হইয়া যায়। কোন নূতন গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল বা কোন গ্রন্থপাঠের হিড়িক পড়িল, অমনি সেই গ্রন্থপাঠের আদর হইল। কিন্তু কিছুদিন পরেই সাময়িক কৌতূহল-নিবৃত্তি হইলে ঐ গ্রন্থের সঙ্গে আর সম্বন্ধ থাকিল না, অথবা রাস্তায়, ঘাটে অযত্নে সেই গ্রন্থ ফেলিয়া রাখা হইল। এইরূপ ব্যবহার অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক। যাহাদের অন্তরে শ্রীভক্তিগ্রন্থের প্রতি শ্রীবিগ্রহ বা ভগবদ্বুদ্ধি নাই, তাহাদের আচরণে এই সকল পাষণ্ডিতা দৃষ্ট হয়।

প্রত্যেক মহাজন ও আচার্য্য ভক্তিগ্রন্থ-সমূহকে কিরূপ প্রাণসর্ব্বস্ব বিচার করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের আচরণের ইতিহাস অনুধাবন করিলে উপলব্ধি হয়। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীজীবপ্রভু যখন

তাঁহার শিক্ষাশিষ্য শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর-মহাশয় ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর হস্তে গৌড়দেশে প্রচারের জন্য সমস্ত গোস্বামি-গ্রন্থ-সম্পুটপূর্ণ করিয়া প্রদান করিয়াছিলেন, তখন শ্রীশ্রীজীবপ্রভু সেই গ্রন্থরূপী শ্রীবিগ্রহের অনুব্রজ্যা করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীমথুরা পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন। বন-বিষ্ণুপুরে সেই-সকল গ্রন্থ অপহৃত হইলে প্রভুত্রয় প্রাণ-বিসর্জ্জনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য যখন যে-স্থানে দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইতেন, তখন অগ্রে কয়েকটি গো-শকটে গ্রন্থরূপী শ্রী ভগবদ্বিগ্রহকে স্থাপন করিয়া স্বয়ং তৎপশ্চাৎ অনুব্রজ্যা করিতে করিতে চলিতেন। তবে চিদ্বিলাসানুভবযুক্ত ভাগবতগণ বেদবিরোধী বিভিন্ন সম্প্রদায়েব ন্যায় গ্রন্থেব বপুমাত্রের পূজার বাহ্যাড়ম্বর প্রদর্শন করিয়া শ্রীভগবদ্বাণীর অর্চ্চন-বিমুখ হ'ন না। এইজন্যই 'গ্রন্থসাহেবে'র পূজা ও ভক্তভাগবতগণের দ্বারা 'শ্রীমদ্ভাগ-বতে'র পূজার মধ্যে পার্থক্য আছে। কোন কোন পাষণ্ডী হিন্দুর মধ্যে এইরূপ বিচার দৃষ্ট হয় যে, গৃহে একখানি 'শ্রীগীতা' বা 'শ্রীমদ্ভাগবত' থাকিলেই হইল। ঐ গৃহে যতই অনাচার হউক্ বা পশুত্বের তাণ্ডব চলুক্, অথবা ভক্ত-ভাগবতগণের প্রতি বিদ্বেষ থাকুক্ তাহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই! গ্রন্থের মলাটের পূজা এবং তদ্দ্বারা গৃহের উপদ্রবাদির শান্তির জন্য শ্রীগীতা-ভাগবতের বাহ্য বপুর প্রতি যে অর্চ্চনাড়ম্বর, তাহা ভগবদ্ভক্তগণের অনুসরণীয় নহে। 'গ্রন্থ-সাহেবের সম্মান যেইরূপ নির্ব্বিশেষ বিচারের প্রতীক, পাষণ্ডী হিন্দুগণের 'শ্রীগীতা', 'শ্রীভাগবত' আদি গৃহে রাখিয়া দৈবউপদ্রব-

শান্তির অভিসন্ধিও সেইরূপ 'শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিবার' নীতিবিশেষ।

—০—

পূজা ও সেবা

বিভু ও নিজ হইতে শ্রেষ্ঠজ্ঞানে সম্ভ্রমের সহিত কোনও বস্তুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নাম "পূজা'। পূজক তাঁহা হইতে উন্নত বস্তুকে 'পূজ্য' জ্ঞান করিয়া কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে যে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহাই পূজা। পূজায় বিধি বা কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রবল। এই কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া জগতের লোক পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, নৃপতি, ব্রাহ্মণ সমাজের শ্রেষ্ঠব্যক্তি ও দেবতাগণকে সম্মান প্রদর্শন করেন। এই সকল কার্যকে 'পূজা' বলা যায়। পূজাতে সংকল্প থাকে, কামনা থাকে ও পূজ্য পূজকের মধ্যে আদান প্রদানের ব্যবস্থা থাকে। জগতে যে দেবতা-পূজাদির প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এইরূপ।

এই ত' গেল প্রাকৃত জগতের কথা। অপ্রাকৃত ধামেও ঐশ্বর্য্য-বুদ্ধিতে, বিভুজ্ঞানে পূজার প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ শ্রীনারায়ণের উপাসকগণ শ্রীনারায়ণের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, তাহা 'পূজা'-শব্দ-বাচ্য। শ্রীলক্ষ্মী

দেবী নারায়ণের যে সেবা করিয়া থাকেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা শ্রীনারায়ণের পূজা; পূজায় ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি প্রবলা, তাহাতে সম্ভ্রমরূপ বৈষম্য নিরন্তর বর্ত্তমান। বৈধ অর্চ্চন-মার্গের যাবতীয় কার্য্যই 'পূজা'। পূজায় পূজ্য বড়, পূজক চিরকাল ছোট। পূজায় পূজ্য প্রভু, পূজক দাস। পূজায় পূজকের কর্ত্তব্য —'পূজা করা', পূজ্যের ধর্ম্ম—পূজা গ্রহণ করা। পূজায় পূজক পূজ্য-সমীপে যাইয়াও পূজ্য হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিয়া সুখী। পূজায় পূজক সর্ব্বদাই পূজ্যের মর্য্যাদা অতিক্রম করাকে বড়ই অপরাধের কার্য্য বলিয়া জ্ঞান করেন।

সাধারণ জীবের এইরূপ মর্য্যাদা-বুদ্ধি প্রবলা ও স্বাভাবিকী। এই মর্য্যাদাবুদ্ধি অতিক্রম করিবার অস্বাভাবিক চেষ্টা দেখাইলে জীব সত্য সত্যই ভগবচ্চরণে অপরাধী হইয়া 'প্রাকৃত-সহজিয়া' হইয়া পড়েন। এইজন্য ভক্তিরাজ্যের কনিষ্ঠাধিকারিগণের জন্য অর্চ্চনমার্গ বা পূজার ব্যবস্থা। প্রকৃতপক্ষে শ্রীরাধাগোবিন্দের পূজা হইতে পারে না। কনিষ্ঠ অধিকারী যে 'শ্রীরাধা-গোবিন্দ শ্রীবিগ্রহের সেবা করিতেছি' বলিয়া তাঁহার অর্চ্চন করিয়া থাকেন, তাহার দ্বারা শ্রীনারায়ণেরই পূজা হয়। অংশীতত্ত্ব-শ্রীগোবিন্দে মর্য্যাদাময় উপাস্য শ্রীনারায়ণ, নৈমিত্তিক অবতারাবলী, পুরুষা-বতারগণ সকলেই বিরাজিত। সুতরাং অর্চ্চনমার্গে যে রাধা-গোবিন্দের সেবা উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহার দ্বারা শ্রীনারায়ণেরই পূজা হয়। কনিষ্ঠাধিকারীর শ্রীরাধাগোবিন্দ উদ্দিষ্টে অর্চ্চন ও মহাভাগবতের ভাবসেবায় আকাশ-পাতাল ভেদ। প্রথমোক্ত

কার্য্যটি পূজা এবং শেষোক্ত কার্য্যটি ভজনসুষ্ঠুতামুখে সেবা, শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর শ্রীমন্মহাপ্রভু দত্ত গোবর্দ্ধনের শিলার "সাত্ত্বিক পূজন" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ) কনিষ্ঠাধিকারীর অর্চ্চন বা পূজার তুল্য নহে। উহা সাক্ষাৎ শ্রীরাধাগোবিন্দের ভাবসেবা। ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিতে ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা হয় না—

"ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে লক্ষ্মী না পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন।"

(—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭ম)

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বা পূজায় প্রকৃত আকৃষ্টি নাই। কেবল বিভুবস্তুর ঐশ্বর্য্যদর্শনে অণুবস্তু কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে বিভুবস্তুর নিকট মস্তক অবনত করিতে প্রণোদিত হন। এই স্থানে পূজ্যের ঐশ্বর্য্য, পূজকের শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করে। কিন্তু সেবায় সাক্ষাৎ সেব্য স্বয়ং সেবকের দ্বারা আকৃষ্ট হন। এই জন্য সেবা 'কৃষ্ণাকর্ষিণী' অর্থাৎ তাহা কৃষ্ণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন। যে পরমতত্ত্বের পদনখ-শোভা লক্ষ্মীকে এমন কি নারায়ণকেও পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া থাকেন, সেই পরমতত্ত্ব আবার তাঁহার অহৈতুক-সেবকগণের সেবাদ্বারা আকৃষ্ট হন্। ইহারই নাম 'সেবা'। সেবায় এতদূর বিশ্রম্ভ ও ঘনিষ্ঠভাব বর্ত্তমান যে, উহা সেবা-সৌষ্ঠব-বিধানকল্পে সেবককে সেব্য হইতে বড় করিয়া তুলে, পাল্যকে পালক করিয়া থাকে, বশ্যকে প্রভু করিয়া থাকে। ঐশ্বর্য্য-বুদ্ধি প্রবলা থাকিতে বা প্রাকৃত জ্ঞান লইয়া এই কথার তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। শ্রীভগবদ্রামানুজাচার্য্যপাদ পর্য্যন্ত এই সেবা-মাধুরীর কথা জগতে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। সুতরাং প্রাকৃতবুদ্ধিসম্পন্ন

জগতের লোকের নিকট এই সেবামাধুরীর কথা বলিবার বস্তু নহে।

প্রাকৃতব্যক্তির, অর্চ্চন মার্গে বা মর্য্যাদামার্গেই অধিকার। শ্রীমঠাদি স্থাপন, মহোৎসবাদি, ধামপরিক্রমা প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ, গ্রন্থাদিপ্রচার বা হরিকথা প্রচার – এই সকল অর্চ্চন মার্গের কার্য্য। কনিষ্ঠাধিকারীর এই সকল কার্য্যে উপযোগিতা আছে, নতুবা তাহাদের কখনও মঙ্গল হইতে পারে না। কারণ সাধারণ জীবের চিত্তবৃত্তি ও দৈহিক বিবিধ চেষ্টা অসদ্বিষয়ের প্রতি ধাবিত। তাহাদিগকে সঙ্কোচিত করিয়া হরিকার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইলে প্রাথমিক অবস্থায় অনাত্মোপলব্ধিকালে অর্চ্চনমার্গ বা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি ব্যতীত শুদ্ধভক্তি বা নির্ম্মলা সেবার যোগ্যতা লাভ হইতে পারে না। যাহারা এই সকল সাধন-ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানকে 'অর্চ্চনমার্গ' মনে করিয়া অলসতার প্রশ্রয় দিবার জন্য এবং নানাবিধ অসচ্চিন্তায় ও মনোধর্ম্মে মন নিযুক্ত করিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-কুটিনাটি প্রভৃতি অসচ্চেষ্টায় ধাবিত হইবার জন্য অর্চ্চকাবস্থায় অবস্থিত হইবার কালেও নির্জন-ভজনের অভিনয় প্রদর্শন করিবার পক্ষপাতী, তাঁহারা "গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি"—এই ন্যায়ানুসারে অকালে হরিভজন হইতে বিচ্যুত হইয়া অবর পথের পথিক হইয়া পড়েন। সদ্‌গুরু জগতের মঙ্গলবিধান করিবার জন্য ক্রমপন্থানুসারে তাহাদিগকে ভজনাদি শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন।

আত্মবৃত্তিদ্বারা শ্রীরাধাগোবিন্দেরই ভজন বা সেবা হইয়া থাকে। সেই সেবা অপ্রতিহতা, অহৈতুকী ও অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, কর্ম্ম, মোক্ষবাঞ্ছা প্রভৃতির দ্বারা অনাবৃতা, এমন কি,

নারায়ণোপাসকগণের সালোক্যাদি মুক্তিবাঞ্ছাও তাহাতে নাই। নারায়ণের চতুর্ভুজত্বরূপ ঐশ্বর্য্যদ্যোতক লীলাময়-শ্রীমূর্ত্তি শুদ্ধ-সেবকগণের বহুমাননের বস্তু হয় না। তদীয়তাপ্রবণভাবময় সেবকের নিকট বিশ্রম্ভভাব এতদূর প্রবল যে, ঐশ্বর্য্যের লেশও সেবককে প্রলুব্ধ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধ-মাধুর্য্যময়। অসুরমারণাদি ঐশ্বর্য্যদ্যোতক কার্য্য অংশী শ্রীকৃষ্ণের অংশ বিষ্ণুর দ্বারা সম্পাদিত হয়। প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন করাই শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য। শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবকগণ নিরন্তর সেই শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের প্রাণবল্লভের মনোঽভীষ্ট পরিপূর্ণ করিয়া তাঁহার সন্তুষ্টি বা সেবা করিতেছেন। সেইখানে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের লেশমাত্র নাই। ঐশ্বর্য্যের দ্বারা শিথিলীকৃত প্রেমে কৃষ্ণের প্রীতি নাই। ঐশ্বর্য্য সেব্য ও সেবককে পরস্পর দূরে রাখিয়া থাকে, কিন্তু মাধুর্য্য সেব্য ও সেবকের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ঘনিষ্ঠতা সম্পাদন করিয়া থাকে—

“ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তাঁ’র প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥
মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে, আমারে সম হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাঁহার অধীন॥

মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীনজ্ঞানে করে লালন-পালন॥
সখা শুদ্ধসখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন বড়লোক তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি' করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥

*　　*　　*　　*

বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব যা'তে মোর চমৎকার॥

—চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ।

*　　*　　*

শুদ্ধ প্রেম ব্রজদেবীর কামগন্ধহীন।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য এই তার চিহ্ন॥
সর্ব্বোত্তম ভজন ইহার সর্ব্বভক্তি জিনি।
অতএব কৃষ্ণ কহে, আমি তাঁর ঋণী॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭ম।

সুতরাং 'পূজা'র অপর নাম যেমন 'অর্চ্চন' সেইরূপ 'সেবা'রও অপর নাম 'ভজন'। এই সেবা বা ভজনই জীবের পরমলোভনীয় শ্রেষ্ঠপদ। অনর্পিতচরপ্রেমপ্রদাতা শ্রীগৌরহরি তাঁহার স্বীয় ভজন-মুদ্রা বা সেবা শিক্ষা দিবার জন্যই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পরদুঃখদুঃখী শ্রীসনাতন প্রভু এই সেবা শিক্ষা দিবার জন্য সম্বন্ধ-জ্ঞানের কথা জগতে প্রচার করিয়াছেন। সেবার মূর্ত্তিমান্

শ্রীবিগ্রহ শ্রীল রূপপাদ এই সেবার কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন। অভিন্ন শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীগুরুদেব জগজ্জীবকে সেই সেবাতে অধিষ্ঠিত করিবার জন্য নিরন্তর ব্যাকুল। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় আমাদিগকে সেবা শিক্ষা দিবার জন্য আমাদের দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন—

"কিরূপে পাইব সেবা মুঞি দুরাচার।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হইল আমার।"

প্রাকৃত অভিমান থাকিতে কখনও সেবা হয় না। সেবা আত্মার অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম, সেবা—শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী, সেবাই—সৌন্দর্য্য, সেবাই—শ্রীরূপ। তাই, ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

"শ্রীরূপমঞ্জরী পদ সেবো নিরবধি।
তাঁর পাদপদ্ম মোর মন্ত্রমহৌষধি॥"

শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু সেই সেবারূপিণী শ্রীরূপমঞ্জরীর কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—

"যদবধি মম কাচিন্মঞ্জরী রূপপূর্ব্বা
ব্রজভূবিবত নেত্রদ্বন্দ্বদীপ্তিং চকার।
তদবধি তব বৃন্দারণ্যরাজ্ঞি প্রকামং
চরণ-কমল-লাক্ষা সংদিদৃক্ষা মমাভূৎ॥
যদা তব সরোবরং সরস-ভৃঙ্গ-সংঘোল্লসৎ
সরোরুহকুলোজ্জ্বলং মধুরবারিসম্পূরিতম্।
স্ফুটৎ সরসিজাক্ষি হে নয়নযুগ্ম সাক্ষাদ্বভৌ
তদৈব মম লালসাজনি তবৈব দাস্যে-রসে॥

পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব
নান্যং কাদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্ ॥"

হে বৃন্দাবনেশ্বরী, যে দিন হইতে এই বৃন্দাবনে 'রূপ' এই কথাটি পূর্ব্বে যুক্ত কোনও একটি অনির্ব্বচনীয়া মঞ্জরী তোমার পরিচর্য্যাদির প্রকার শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য আমার প্রতি নেত্রদ্বয়ের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন, সেই অবধি তোমার শ্রীচরণযুগলের অলক্তক দর্শনে আমার অভিলাষ জন্মিয়াছে। যে অবধি তোমার সরোবর "শ্রীরাধাকুণ্ড" শব্দায়মান ভৃঙ্গকুলকর্ত্তৃক উল্লসিত কমলদলের দ্বারা বিশোভিত এবং সুমধুরবারিপরিপূর্ণ হইয়া আমার নয়নযুগলের সম্মুখে বিকাশমান হইয়াছেন, সেই অবধি তোমার দাস্যরসে আমার লালসা জন্মিয়াছে। হে দেবী, তোমার পদকমলের দাস্য ব্যতীত আমি কোনও কালে অন্য গৌরবময়ী সখীত্বাদি প্রার্থনা করি না। অতএব, তোমার সখীত্বের প্রতি আমার নিত্য নমস্কার থাকুক্, নমস্কার থাকুক্। আর আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার বিশ্রম্ভ-দাস্যের প্রতি আমার অনুরাগ হউক্, অনুরাগ হউক্।

—•—

ভাড়াটিয়া

শ্রীরূপানুগভক্তিসিদ্ধান্ত-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার স্ব-সম্পাদিত শ্রীসজ্জন-তোষণী পত্রিকার বিংশবর্ষের ৭ম ও ৮ম সংখ্যায় **'ভাড়াটিয়া ভক্ত নহে'** শীর্ষক প্রবন্ধে 'ভাড়াটিয়া'র বহুরূপী সূত্রসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ ভাড়াটিয়ার মূলসূত্র-সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। মায়িক জগতের অবলম্বন বা আশ্রয় করিয়া জীব ভোক্তৃ-অভিমানে সেই নিত্যদাস্য একবারে বিস্মৃত হইয়াছেন। **পরের গৃহে বাস করিয়া দেহে আত্মজ্ঞানহেতু আবাস্যস্থানের হরিদাস্যরূপ চিৎপ্রকাশ না বুঝিয়া** ইন্দ্রিয়সুখতৎপরতায় ভোক্তৃবুদ্ধিতে নিত্যধর্ম্মের নামে জড়জগতে ভাড়া দাখিল করিতেছেন। দেহে আত্মজ্ঞান হইলেই জড়ের সুখমূল্য ভাড়া আদায় করিতে হয়; ইহাকেই বলে জড়ে প্রভুত্ব বা ভাড়া আদায়। জড়াভিমানীর পরিচর্যা করিয়া দিয়া মাসিক শুল্ক গ্রহণ বা ঠিকা ফুরণ ভাড়া লাভের জন্য যাবতীয় চেষ্টা। শ্রীগৌরসুন্দর বললেন, সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে কৃষ্ণের অনুশীলন হয় না। **কৃষ্ণানুশীলনের নামে নিজত্বকে জড়ের নিকট ভাড়া দিলে গৌর-সেবা হয় না।** • • • ভাড়াটিয়া ভক্ত নিজ নিজ ভাড়াটিয়া শরীরের ভাড়া আদায় করিয়া লইতেছেন। **আদায়ী ভাড়াগুলি নিজপ্রতিষ্ঠা, নিজ কনকার্জ্জন, নিজ কামিনী-তর্পণ প্রভৃতি কার্য্যে লাগাইয়া দিয়া গৌরভক্তি লাভ করিতেছেন, মনে করেন।**"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই সকল সিদ্ধান্তবাণী অনুসরণ করিলে জানা যায়, হরিবিমুখ জীবের যতক্ষণ অন্যাভিলাষ থাকে, ততক্ষণই তাহার ভাড়া খাটিবার প্রবৃত্তি নৈসর্গিকী। অন্যাভিলাষীমাত্রই ভাড়াটিয়া। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, ব্রতী, পঞ্চোপাসকী, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষকামী, মিছাভক্ত বা আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখিভেকী, স্মার্ত্ত, জাতিগোসাঞি, অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী, প্রাকৃত-সহজিয়া—সকলেই ভাড়াটিয়া; একমাত্র শ্রীরূপের পাদপদ্মের কিঙ্করগণ ব্যতীত আর সকলেই ভাড়াটিয়া।

স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণের ধারণা এই যে, যাঁহারা কোন কার্য্যের বিনিময়ে স্থূল অর্থ বা দ্রবিণ গ্রহণ করেন, তাঁহারাই বুঝি "ভাড়াটিয়া"; কিন্তু শ্রীরূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—বাহ্যে সর্ব্বস্ব ত্যাগের অভিনয় করিয়াও, 'হরিভক্ত' বলিয়া পৃথিবীবিখ্যাত হইয়াও শ্রীরূপানুগ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন না কোনপ্রকার অন্যাভিলাষের ভাড়া খাটিতে হয়। শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"কেহ বা ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাসীগিরি ভাড়া দিয়া ভক্ত হন, কেহ বা জড়লাম্পট্যে উৎসাহ ভাড়া দেন। তর্ক-বিতর্ক ভাড়া দেওয়া যায়। অন্যাভিলাষযুক্ত হইলে গৌরের অনুকূল অনুশীলন হয় না। ভাড়া দিয়ে শ্রীধামে যাওয়া যায় না, ভাড়া আদায় করিলেও শ্রীধামবাসী হওয়া যায় না'।

শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের গত বিরহোৎসবের সময় বঙ্গের এক প্রথিতনামা ব্যক্তি কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—

'পৃথিবীতে এমন হৃদয়বান্ ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা পরের হিতের জন্য কোটি-কোটি অর্থের আশা, আকাঙ্খা পরিত্যাগ করিয়াছেন, কারণ তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, সামান্য টাকা-পয়সার ভাড়া-খাটা অতি ক্ষুদ্রবুদ্ধির কার্য্য, কিন্তু সকল বদ্ধজীবই প্রতিষ্ঠা ভাড়ার ন্যূনাধিক ভাড়াটিয়া। প্রতিষ্ঠাকাঙ্খার ভাড়া না খাটেন, এইরূপ জীব জগতে নাই।'

একান্ত নির্লোভ রাজচক্রবর্ত্তীকে হয়ত' টাকা বা অন্য কোন দ্রবিণের দ্বারা সহজে ভাড়া খাটাইতে না পারা যাইতে পারে, কিন্তু অতি সহজেই তাঁহাকে প্রতিষ্ঠাকাঙ্খার ভাড়াটিয়া করা যায়। কনক-কামিনীর ভাড়াটিয়াকে অতি সহজে চেনা যায়, কিন্তু প্রতিষ্ঠাশার ভাড়াটিয়াকে সাধারণলোক চিনিতে পারে না। মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণ, অষ্টাঙ্গযোগী, ব্রতী, তপস্বিগণ অনেক সময়েই কনক-কামিনীর ভাড়াটিয়াগিরিকে ঘৃণা ও নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা প্রতিষ্ঠাকাঙ্খার ভাড়াটিয়াগিরিতে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে আবদ্ধ।

ভক্তি যাজনের ছল করিয়াও, এমন কি শুদ্ধভক্তের সজ্জা ও সংজ্ঞা লইয়াও আমরা এক একটি মস্ত ভাড়াটিয়া হইতে পারি। কেবল ভাগবত ব্যবসায়ী, মন্ত্র ব্যবসায়ী, ভেট ব্যবসায়ী, রস-কীর্ত্তন ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণ ভাড়াটিয়া নহেন, শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের, বিশেষতঃ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রচারের কৃপায় ঐ সকল ভাড়াটিয়াকে ন্যূনাধিক সকলেই চিনিতে পারিয়াছেন ও পারিতেছেন; কিন্তু শ্রীরূপানুগবিচার-আচার বিরোধী যে প্রচ্ছন্ন ভাড়াটিয়ার দল পৃথিবীতে আছে, তাহা ধরিবার মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি

সাধারণের ত' নাই-ই, অসাধারণগণেরও অনেকেরই নাই। নিঃস্বার্থপরতার অভিনয় করিয়া, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-ত্যাগের অভিনয় করিয়া, অনুক্ষণ হরিসেবা ও হরিকথা প্রচার করিবার অভিনয় করিয়া, সর্ব্বক্ষণ গুরুসেবার অভিনয় করিয়াও আমরা ভাড়াটিয়া হইয়া যাইতে পারি। আমরা 'ভাড়াটিয়া' কিনা, ইহা তখনই প্রমাণিত হয়, যখনই গুরু বা বৈষ্ণবগণ প্রতিষ্ঠার বেতন হ্রাস করেন। প্রতিষ্ঠাভাড়া কিছু কম হইলেই যদি আমাদের গুরুসেবায় উৎসাহ কমিয়া যায় ও তাহাতে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তবে জানিতে হইবে যে, আমরা যে এতদিন হরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবার অভিনয় করিয়াছি, উহা কেবল ভাড়াটিয়াগিরি মাত্র। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার আনুকূল্য করিবার নামে যে বিষয়ী ও যোষিতের খিদ্‌মদ্‌গারী করিয়াছি বা করি, উহাও কেবল আমার ভাড়াটিয়াগিরি। সেবার রঙ্গমঞ্চের মূল অধিকারী হইতে প্রতিষ্ঠা বা কনক-কামিনী-ভাড়া আদায় করিবার পিপাসাই আমাকে সেবার অভিনেতা ও তৎকার্য্যে উৎসাহী করিয়াছে; ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় "**জড়লাম্পট্যে উৎসাহ ভাড়া দেওয়া।**"

জড়লাম্পট্য অনেক প্রকার—চক্ষুর লাম্পট্য, কর্ণের লাম্পট্য, নাসা, জিহ্বা ও ত্বকের লাম্পট্য। সাধারণতঃ লোকে ত্বকের লাম্পট্যকেই 'লাম্পট্য' মনে করে, কিন্তু এইগুলি অতিস্থূল, সকল ইন্দ্রিয়ের রাজা মনের লাম্পট্যের আর তৃপ্তি নাই। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বিনষ্ট, অকর্ম্মণ্য ও শিথিল হইলেও রাজা মনের লাম্পট্য-পিপাসার নিবৃত্তি হয় না।

গৃহব্রত বা ঘরপাগলা ব্যক্তিগণ অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাড়া খাটিয়া থাকে, কবি তুলসীদাসজীর ভাষায় তাহাদের ভাড়া বা ফুরণ 'তিন পাওকে সের'। তিন পোয়া বা এক সের চাউল বা আটার ব্যবস্থা হইলেই গৃহব্রত ও ঘরপাগলা ব্যক্তিগণ সন্তুষ্ট হন, কিন্তু—

'মন্‌কি ভুখ্‌ অনেক হ্যায় নিগল্‌ত্‌ মেরু সুমের্‌'

যাহারা মনোধর্ম্মের খিদ্‌মদ্‌গার, তাহাদিগের ভাড়া অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষীর ভাড়া সামান্য ফুরণে পরিতৃপ্ত হয় না। সুমেরু পর্ব্বত পরিমাণ প্রতিষ্ঠারাশির স্তূপ তাহাদের পুরোভাগে আনয়ন করিলেও তাহাদের ভাড়া খাটার প্রবৃত্তিতে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয় না। গৃহব্রত বা ঘরপাগলা ভাগবত ব্যবসায়ী ঘণ্টায় ১০্ টাকা ফুরণ করিয়া ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠের ভাড়াটিয়া বক্তা হন, আর ঘর-বিরাগী বাহির-পাগলা তপস্বীগিরি ভাড়া দিয়া, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রহ্লাদচরিতের "যস্ত আশিষ এব আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্"—এই শুদ্ধভক্তির কথা উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়াও পাঠ ও ব্যাখ্যার পর "কিহে বাপু আজ পাঠ কেমন হ'ল ? সব শ্রোতা একেবারে নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ, দেখিলে ত'!" ইত্যাদি কথা মুখে বা অন্তরে বলিয়া অতৃপ্ত প্রতিষ্ঠার ভাড়াটিয়া হইয়া পড়েন!

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর সঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, -ধন-শিষ্যাদি-দ্বারা ভক্তি হয় না, কিন্তু আমি হয়ত' ধনী শিষ্যাদির তোষামোদ করিয়া তাহাদিগকে হাতে রাখিতে পারিলেই আমার আত্মরক্ষা হইবে, এই মনে করিয়া ধন ও শিষ্যাদির নিকট আমাকে

ভাড়া দিয়া থাকি। এইখানেই শ্রীল প্রভুপাদের বাণী সমূহ আমার চরিত্রের খাপে খাপে মিলিয়া যায়,—

'ভাড়াটিয়া ভক্ত (?) নিজ নিজ ভাড়াটিয়া শরীরের ভাড়া আদায় করিয়া লইতেছেন। আদায়ী ভাড়াগুলি নিজ প্রতিষ্ঠা, নিজ কনকার্জ্জন, নিজ কামিনী তর্পণ প্রভৃতি কার্য্যে লাগাইয়া দিয়া গৌরভক্তি লাভ করিতেছেন, মনে করেন।'

শ্রীগুরুদেব বা বৈষ্ণববৃন্দের সেবার অভিনয় করিয়া যদি নিজ নিজ ভাড়াটিয়া শরীরের ভাড়া আদায় করিবার জন্য শ্রীগুরু ও বৈষ্ণবগণের নিকট প্রতিষ্ঠামাশুল আকাঙ্খা করি, তবে নিশ্চয়ই আমি নিছক ভাড়াটিয়া। শ্রীগুরুদেব কতটা অধিক কনক-কামিনী -প্রতিষ্ঠা দান করিয়া আমাকে কতটা অধিক ভাড়া খাটাইয়াছেন, আমার বেতন অন্যান্য সকলের অপেক্ষা কত বেশী, এইরূপ বিচার ভাড়াটিয়ার বিচার। কর্ম্মজগতে কর্ম্মবীরগণ মনে করিয়া থাকেন - কেরাণীর মাসহারা পঁচিশ-ত্রিশ টাকা, কিন্তু উচ্চতম কর্ম্ম-চারীর মাহিনা হয়ত' মাসে ১০ হাজার টাকা বা স্বাধীন ব্যবসায়ী মনে করিতে পারেন যে, আমি নিজের শরীর ভাড়া দিয়া মাসে লক্ষ টাকা রোজগার করিতে পারি, সুতরাং সামান্য কেরাণী অপেক্ষা আমাদের পদ অতুলনীয়রূপে উচ্চ। কর্ম্মরাজ্যে এইরূপ উচ্চতার বড়াই শোভনীয় ; কিন্তু শ্রীরূপ ও শ্রীরূপের ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী বলেন,—কর্ম্মরাজ্যের 'ছোট ভাড়াটিয়া' অপেক্ষা 'বড় ভাড়াটিয়া'র বাহাদুরী থাকিলেও ভক্তিরাজ্যে ঠিক বিপরীত। **যে ভাড়াটিয়ার মাশুল বা বেতন যত বেশী, সে ভাড়াটিয়া**

তত অধিক ভক্তিপথ হইতে ভ্রষ্ট। গুরু-বৈষ্ণবের নিকট হইতে যিনি যতটা অধিক কনক-কামিনী বা প্রতিষ্ঠাশা ভাড়া আদায় করিয়াছেন, করেন বা করিবেন, তিনি তত অধিক বঞ্চিত হইয়াছেন, হইতেছেন বা হইতে চাহেন। কাজেই শ্রীগুরু-বৈষ্ণববৃন্দ কাহাকেও বা কাহাদিগকেও অধিক প্রতিষ্ঠা বা দ্রবিণাদি বেতন দিয়াছেন বলিয়াই যে তাঁহার বা তাঁহাদের অধিক গৌরব করিবার আছে, তাহা নহে; বরং গুরু-বৈষ্ণবের নিকট হইতে তিনি বা তাঁহারা অধিক ভাড়া খাটিয়াছেন - ইহাই প্রমাণিত হয়।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদ-বরণে সেবা বৃত্তির হ্রাস হয় না, তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইতে থাকে, অকপট দৈন্যই অধিকতর প্রকাশিত হইতে থাকে। প্রতিষ্ঠাশার দুর্ভিক্ষে ক্রোধ বা সেবায় বিরক্তি হয় না। গুরু-বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদকে প্রাপ্য-ভাড়া মনে হইলেই **'আমার বা আমাদের বেতনের পরিমাণ অনেক 'বেশী',** লোকের নিকট ইহা বলিয়া বা অপর ভাড়াটিয়ার দ্বারা বলাইয়া ভাড়া খাটার বাহাদুরীকেই বহুমানন করিবার প্রবৃত্তি হয়।

অনেক সময় আমরা গৃহব্রতগিরিতে ভাড়ার পরিমাণ খুবই কম অর্থাৎ পঁচিশ-ত্রিশ টাকার কেরাণীগিরি এবং স্ত্রী-পুত্র-পালন-জনিত নানাপ্রকার চিন্তা-ভাবনা-ক্লেশ কণ্টকাদিপূর্ণ সুখ-স্বপ্নের অকিঞ্চিৎকর ভাড়া প্রাপ্তির আলেয়া দেখিতে পাইয়া উহাকে পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক "বড় ভাড়াটিয়া" হইবার জন্য ত্যাগীর বহুরূপী পোষাক পরিয়া থাকি এবং বহুরূপ ভাড়া দিয়া মাশুলরূপে কনক-কামিনী,

কখনও বা এই দুইটি অতি স্থূল ভাড়াকে দূর ছাই করিয়া প্রতিষ্ঠাশা পিশাচীর পশ্চাতে ধাবিত হই। তখন ক্ষুদ্র গৃহী-বাউলগিরি ছাড়িয়া ত্যাগী-বাউল হই। ঘর-পাগলামী ছাড়িয়া বাহির-পাগলামিতে দিগ্বিদিগ্‌শূন্য হইয়া পড়ি। ঘরের পাগলকে কোনরূপে বাঁধিয়া আটকাইয়া রাখা যায়, কিন্তু বাহির পাগল সমগ্র মানব-সমাজে জঞ্জাল উপস্থিত করে।

ঘরপাগ্‌লা রাবণ গৃহব্রতের বেষে সীতা হরণ করিবার জন্য যাইতে পারে না, কিন্তু ত্রিদণ্ডীর বেষে বা ত্যাগী বাউল সাজিয়া স্বয়ং ভগবানের স্বরূপশক্তিকে পর্য্যন্ত ভোগ করিবার স্পর্দ্ধা করে। এইজন্য বহুরূপী অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-.যাগ প্রভৃতির আবরণ এবং সকল অনর্থের মূল কৃষ্ণবিস্মৃতিজনিত দেহাত্মাভিমান হইতে উৎপন্ন ভাড়া খাটিবার প্রবৃত্তির হস্ত হইতে মুক্ত হইতে হইলে শ্রীরূপানুগ-গণের অকপট আনুগত্য ও পূর্ণ নিয়ামকত্ব বরণ করা উচিত। অনর্থযুক্ত জীব স্বাধীন বা স্বতন্ত্র হইয়া বিচরণ করিবার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইলে নানা আকারে দেহ ও মনকে প্রকৃতির নিকট ভাড়া দিতে হইবে। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের বিভিন্ন রূপ আমাদের বহির্ম্মুখতার মাশুলরূপে আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া আমাদের নিত্যসিদ্ধ অশুল্ক সেবা-প্রবৃত্তিকে নিত্যকাল আবৃত্ত করিয়া রাখিবে।

আমাদের ভীষণাদপিভীষণ দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইলে শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণব আমাদিগের নিকট নানাপ্রকার ভাড়ার প্রলোভন বা commercial interest উপস্থিত করেন, কখনও বা আমাদের অহৈতুকী সেবা-প্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্যও আমাদের সম্মুখে নানা

প্রকার ভাড়ার প্রলোভন আনয়ন করিয়া থাকেন। যখন ধ্রুব পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির তপস্যা করিয়া তাঁহার দর্শন পাইলেন, তখন নারায়ণ ধ্রুবকে রাজ্যৈশ্বর্য্য প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু ধ্রুব বুঝিয়াছিলেন, শ্রীহরির তপস্যার ভাড়ারূপে রাজৈশ্বর্য্য গ্রহণ করা ভাড়াটিয়া হওয়া মাত্র। প্রহ্লাদ মহারাজকে যখন শ্রীনৃসিংহদেব দর্শন দান করিলেন, তখনও শ্রীনৃসিংহদেব প্রহ্লাদকে বর প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু প্রহ্লাদ জানাইলেন যে, বিষ্ণুর নিকট হইতে বিষ্ণুর সেবা ব্যতীত অন্য কিছু বর প্রার্থনা করা ভাড়াটিয়াগিরি মাত্র। ঐরূপ বেণেগিরি বা ভাড়াটিয়াগিরি ভগদ্ভক্তের ধর্ম্ম নহে।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের গত বিরহসভায় কোন অধিবেশনে সভাপতিরূপে শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরিত্রবর্ণন-প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়াছিলেন,— শ্রীল প্রভুপাদ যখন কোন স্থানে ভ্রমণাদিতে যাইতেন, তখন সেই স্থান হইতে বিদায়গ্রহণকালে ‘মেথর’ কে তাহার সমস্ত প্রাপ্য বিশেষভাবে চুকাইয়া দিতেন, এমন কি, অনেক সময়ই নিজের নিকট হইতে মেথরকে তাহার প্রাপ্য মাশুল ও পারিতোষিক প্রদান করিতেন। এ বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদের যেন একটা বিশেষ লক্ষ্য ছিল। শ্রীল প্রভুপাদের শারীরিক বিভিন্ন পরিচর্য্যাও যাঁহারা করিয়াছেন, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগকে অনেক সময়ই পাঁচ-দশ টাকা ও নানাপ্রকার দ্রব্য প্রদান করিতেন। আবার অধিকতর চতুর কেহ কেহ এইরূপ সামান্য পারিতোষিক নিতেন না দেখিয়া তাঁহাদিগকে একসঙ্গে বিভিন্ন আকারে নানাভাবে মাশুল প্রদান

করিতেন ও করিয়াছেন। এইরূপভাবে শ্রীল প্রভুপাদ কাহারও কাহারও নামে ব্যাঙ্কে টাকাও রাখিয়া গিয়াছিলেন। যাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের এই সকল মায়ায় ন্যূনাধিক মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা হরিসেবার পরিবর্ত্তে ভাড়াই খাটিয়াছেন। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্তকীর্ত্তনের মধ্যে এইরূপ ভাড়া-খাটার বিন্দুমাত্রও পোষকতা পাওয়া যায় না।

ভাড়াখাটা বৃত্তি বদ্ধজীবের স্বাভাবিক এবং তাহা বহুরূপিণী মায়াময়ী। কাজেই এইরূপ বিপদে শুদ্ধরূপানুগবৈষ্ণববৃন্দের অনুক্ষণ অকপট আনুগত্যময়ী করুণা প্রার্থনা, শরণাগতি, আত্মদৈন্য তাঁহাদের শাসন ও নিয়মন সর্ব্বতোভাবে অঙ্গীকার পূর্ব্বক আত্ম-সংশোধনের জন্য সুদৃঢ় সঙ্কল্প, শ্রীনাম প্রভুর নিকট বৈষ্ণবানুগত্যে সর্ব্বদা আত্মমঙ্গল প্রার্থনা ব্যতীত আমাদের দেহাত্মাভিমানের ভাড়া খাটিবার বহুরূপিণী প্রবৃত্তি হইতে উদ্ধারের আর উপায় নাই।

—ঃঃ—

সিদ্ধান্ত-বিরোধ

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার অন্তরঙ্গ শ্রীস্বরূপ রামানন্দ-রূপ-রঘুনাথ-শ্রীজীবাদি গোস্বামিবৃন্দ, শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীশ্রীল ঠাকুর নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-জগন্নাথ ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত

সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কোনও দিনই ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধ সহ্য করিতে পারেন নাই বা পারেন না।

"'রসাভাস' হয় যদি 'সিদ্ধান্ত-বিরোধ'।
সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ॥
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস"॥

(চৈ চঃ অঃ ৫।৯৭, ১০২)

যাহার দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত হইয়া সিদ্ধপক্ষ স্থাপিত হয়, তাহাই "সিদ্ধান্ত"। ভক্তিসিদ্ধান্তই গৌরসুন্দর ও তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের প্রাণ। এইজন্য শ্রীরূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রারম্ভে বলিয়াছেন,—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ২।১১৭)

সিদ্ধান্ত হইতেই চিত্ত কৃষ্ণে সুদৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হয়। যাহার সিদ্ধান্তজ্ঞান নাই, তাহার কৃষ্ণে নিষ্ঠাও নাই। তাহার ভাবুকতা বা ভক্তির অভিনয় শিথিলতারই প্রচ্ছন্নমূর্ত্তি। কাহারও সিদ্ধান্ত-জ্ঞান নাই অথচ "ভক্তি" আছে, যাহারা এইরূপ বলিয়া থাকে, তাহারা মায়াচ্ছন্ন প্রাকৃত-সহজিয়া বা কৃষ্ণভোগী। সিদ্ধান্ত-বিরোধ করিয়াও মহাপ্রভুর সেবা হয়, গুরু ও কৃষ্ণের সেবা হয়, যাহারা মনে করে, তাহারা ভক্তিরাজ্যের চতুঃসীমানা হইতে বহুদূরে পতিত। 'আবোল-তাবোল' সিদ্ধান্ত বা মনোধর্ম্ম লইয়া যাহারা ভক্তের কাচ কাচিয়া থাকে, তাহারা ভক্তি হইতে বহুদূরে বিক্ষিপ্ত।

কোন কোন অতত্ত্বজ্ঞের ধারণা, জাগতিক পাণ্ডিত্য বা বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন থাকিলেই সিদ্ধান্তে পারদর্শিতা লাভ হয়; প্রাকৃত পাণ্ডিত্য-হীন বা নিরক্ষর ব্যক্তি সিদ্ধান্ত-বিষয়ে দক্ষতা লাভ করিতে পারে না। আবার কেহ কেহ মনে করেন, সিদ্ধান্ত-ব্যাপারটি intellectualism বা বুদ্ধিবৃত্তির কসরত ; কেহ মনে করেন—সিদ্ধান্ত ন্যায়ের ফাঁকি, উকিলের ওকালতি বা তার্কিকের তর্কের ন্যায় ব্যাপার-বিশেষ! কিন্তু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলেন,—একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা হইলেই সিদ্ধান্ত-বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ হয়—

"শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ।
সংগৃহ্ণাত্যাকরব্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্তসন্মণীন্॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ৩।১)

যাঁহার পাদাশ্রয়-শক্তি-বলে **অজ্ঞব্যক্তিও** আকরস্থান-সমূহ হইতে সিদ্ধান্তসদ্‌রত্নসমূহ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়, সেই শ্রীচৈতন্য-দেবকে আমি বন্দনা করি।

জাগতিক অজ্ঞতা ও বিজ্ঞতা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিষয়ে পারদর্শি-তার হেতু নহে। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আত্মজ শ্রীঅচ্যুতানন্দ পঞ্চম-বর্ষের বালক হইয়াও সিদ্ধান্তসার কীর্ত্তন করিয়াছিলেন—

"চৌদ্দ ভুবনের গুরু—চৈতন্য-গোসাঞি।
তাঁ'র গুরু—অন্য, এই কোন শাস্ত্রে নাই॥
পঞ্চমবর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার।
শুনিয়া পাইলা আচার্য্য সন্তোষ অপার॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ১২।১৬, ১৭)

গুরু, আচার্য্য, শাস্ত্র, বৈষ্ণব—ইঁহারাই সিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিতে পারেন। মনোধর্ম্মী প্রাকৃত পণ্ডিত বা জড়ীয় তীক্ষ্মধী ব্যক্তিগণ ভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞ নহেন।

"সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায়।"

(চৈঃ চঃ আঃ ৩।২১)

"সকলেই বুদ্ধিবৃত্তি বা পাণ্ডিত্য-প্রভাবে সিদ্ধান্তবিৎ হইতে পারেন, অথবা শাস্ত্রের কথা কিছু আওড়াইতে পারিলেই, দুই চারিটি শ্লোক বা সমগ্র পৃথিবীর দর্শনশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা থাকিলেই ভক্তিসিদ্ধান্তে অধিকার লাভ হয়", —এইরূপ নহে। "সন্ন্যাসী হইলেই সিদ্ধান্তে অধিকার লাভ হয়, ব্রহ্মচারীর হয় না; ব্রহ্মচারীরই সিদ্ধান্তে অধিকার, গৃহস্থের অধিকার লাভ হয় না; গৃহস্থেরই সিদ্ধান্তে অধিকার, বানপ্রস্থের নহে; বালকেরই সিদ্ধান্তে অধিকার, বৃদ্ধের নহে; পুরুষেরই সিদ্ধান্তে অধিকার, স্ত্রীলোকের নহে; স্ত্রীলোকেরই সিদ্ধান্তে অধিকার, পুরুষের নহে,"— এই সমস্ত বিচারই সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ মনোধর্ম্ম। সিদ্ধান্তবিৎ জগতে কোটির মধ্যে একটি পাওয়া যায়, যেমন—

"কোটিমুক্ত-মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।'
'সিদ্ধান্তবিৎ' অর্থই—উত্তম অধিকারী ভক্তশ্রেষ্ঠ—
"শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর।
'উত্তম অধিকারী' সেই তারয়ে সংসার॥"

(চৈঃ চঃ ম ২২।৬৫)

সিদ্ধান্তবিৎ' অর্থই জগদ্‌গুরু— আচার্য্য।

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসি, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়।।"

(চৈঃ চঃ ম ৮।১২৭)

শুদ্ধভক্তিরস-সিদ্ধান্ত একমাত্র শ্রীস্বরূপগোস্বামিপ্রভুই জানেন। আর যাঁহারা জানেন বা জানিয়াছেন, তাঁহারা তাহা শ্রীস্বরূপগোস্বামীর নিকট হইতেই জানিতে পারিয়াছেন এবং সিদ্ধান্ত জানার দরুণই শ্রীল স্বরূপগোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর "অত্যন্ত মর্ম্মী" অর্থাৎ অতি অন্তরঙ্গভক্ত হইয়াছেন।

"অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপগোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত॥
যেবা কেহ অন্য জানে, সেহো তাঁহা হৈতে।
চৈতন্যগোসাঞির তেঁহ অত্যন্ত মর্ম্ম যাতে॥"

(চৈঃ চঃ আ ৪।১৬০, ১৬১)

শ্রীস্বরূপ গোস্বামিপ্রভু এই রসসিদ্ধান্তজ্ঞতার দরুণই সমগ্র গৌড়ীয়ের মালিক বা মূল পুরুষ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর "অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভু যোগপট্ট গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হন নাই, 'স্বরূপ' এই ব্রহ্মচারী উপাধি রক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সমসাময়িক বহু সন্ন্যাসী থাকা সত্ত্বেও সন্ন্যাসের লিঙ্গহীন ও ব্রহ্মচারী উপাধি-বিশিষ্ট শ্রীস্বরূপপ্রভু কিরূপে সমগ্র গৌড়ীয় সমাজের আচার্য্য হইলেন? 'একমাত্র শ্রীস্বরূপই একান্তভাবে ভক্তিরসসিদ্ধান্তবিৎ, অন্যান্য সকলে তাঁহার

নিকট হইতেই সিদ্ধান্ত শিক্ষা করিয়াছেন" ; ইহা বলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্যান্য ভক্তগণের, এমন কি, ষড়্‌গোস্বামীর অমর্য্যাদা হইয়াছে কি ? শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত এই যে, যিনি ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ তিনিই কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ, যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ তিনিই জগদ্‌গুরু, তিনিই গৌড়ীয়ের সম্রাট্। তাই শ্রীস্বরূপ গোস্বামিপ্রভু সমগ্র গৌড়ীয়-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্।

শ্রীস্বরূপ গোস্বামী অপেক্ষা শ্রীগোবিন্দ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের সেবা সাধারণ চক্ষে হয়ত অনেক বেশী করিয়াছেন, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য হয়ত অনেক বেশী বার পাক করিয়া মহাপ্রভুকে খাওয়াইয়াছেন, মহাপ্রভুকে বহু তীর্থে লইয়া গিয়াছেন, কৃষ্ণদাস বিপ্র হয়ত অধিকবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর দণ্ডকমণ্ডলু বহন করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি শ্রীস্বরূপ গোস্বামি প্রভু একমাত্র ভক্তিরসসিদ্ধান্তবিৎ বলিয়া শ্রীচৈতন্য গোস্বাঞি "অত্যন্ত মর্ম্মী" হইয়াছেন এবং তাঁহারই উপর শ্রীমন্মহাপ্রভু "গৌড়ীয়ার শাসনের ভার'প্রদান করিয়াছেন।

অপ্রাকৃত স্বরূপরূপানুগসিদ্ধান্ত এইরূপ জিনিস, যাহা সিদ্ধান্তবিদ্ কৃপা করিয়া কীর্ত্তন করিলেও সিদ্ধান্তবিরোধী ও রসবিরোধী ব্যক্তিগণ কিছুতেই ধরিতে পারে না, তাহাতে তাহাদের উল্লাস হয় না। একমাত্র শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ যাঁহাদের হৃদয়ের ধন, তাঁহারাই শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত উপলব্ধি করিতে পারেন,—

"হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
এসব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ"।

এসব সিদ্ধান্ত হয় আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ-কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ ॥
অভক্ত-উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ-বিশেষ ॥

(চৈঃ চঃ আ৪।২৩৩-২৩৫)

শ্রীরূপ প্রভুর গুরুপাদপদ্ম শ্রীসনাতন প্রভু—ভক্তি-সিদ্ধান্তাচার্য্য। অতএব ভক্তিসিদ্ধান্তে অধিকারের তাৎপর্য্য সম্বন্ধজ্ঞান ও অভিধেয়ে যুগপৎ অধিকার। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

"সনাতন কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপের কৃপায় পাইনু ভক্তিরসপ্রান্ত ॥"

(চৈঃ চঃ আ ৫।২০৩)

ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্যই জগদ্‌গুরু এবং ষড়্‌গোস্বামীর অগ্রণী। শ্রীহরিদাস ঠাকুর সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন,—

"ভক্তি সিদ্ধান্ত, শাস্ত্র-আচার-নির্ণয়।
তোমা-দ্বারে করাইবেন, বুঝি আশয় ॥"

(চৈঃ চঃ অ ৪।৯৭)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন—

"সনাতন গ্রন্থ কৈলা 'ভাগবতামৃতে'।
ভক্ত-ভক্তি-কৃষ্ণ-তত্ত্ব জানি যাহা হৈতে ॥
সিদ্ধান্ত সার গ্রন্থ কৈলা 'দশম টিপ্পনী'।
কৃষ্ণলীলারস-প্রেম যাহা হৈতে জানি ॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ৪।২১৯-২২০)

অতএব, একমাত্র শ্রীশ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপ-রঘুনাথ-শ্রীজীবের নিজজনগণেরই ভক্তিসিদ্ধান্তে স্বাভাবিক ব্যুৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহাকে শ্রীশ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপ-রঘুনাথ আত্মসাৎ করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তে সহজ অধিকার প্রদান করেন, একমাত্র তিনিই রূপ-রঘুনাথের বাণী প্রচার করিতে পারেন। শ্রীরূপরঘুনাথের বাণী-প্রচার গায়ের জোরের কথা নহে।

ভক্তিসিদ্ধান্তস্থাপন ও অভক্তিসিদ্ধান্ত-খণ্ডনই আচার্য্যের কার্য্য। এই সিদ্ধান্তস্থাপনই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-মনোহভীষ্ট-পরিপূরণ। ক্রিয়া-দাক্ষ্য বা অন্য কোন প্রকার জাগতিক বীরত্ব প্রদর্শন আচার্য্যের কার্য্য নহে। ক্রিয়া-দাক্ষ্যাদি কিংবা লোকমোহিনী শক্তি যে কোন অসুরে বা মায়াবদ্ধ কর্ম্মবীরেও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার আচার্য্যলীলায়,—

"সর্ব্বত্র স্থাপয় প্রভু বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে।
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে॥"

(চৈঃ ভঃ মঃ ৯।২৪)

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবনের গ্রন্থরাজকে রূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপ্রভু ও সমস্ত শুদ্ধভক্তসমাজ "কৃষ্ণ-ভক্তি-সিদ্ধান্তের খনি" বলিয়াই আদর করিয়াছেন। ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্বকে শুদ্ধভক্ত-সমাজ বড় মনে করেন না। গোবিন্দদাসের কড়চা, অদ্বৈতপ্রকাশ, লাল চাঁদের বাংলা ভক্তমাল প্রভৃতি গ্রন্থকে প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় বা প্রাকৃত সাহিত্যিকগণ ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া আদর বা অনাদর করিতে পারেন, কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থে

ভক্তি-সিদ্ধান্ত বিরোধ ও রসাভাসদোষ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া স্বরূপরূপানুগ শুদ্ধভক্ত-সমাজ ঐসকল গ্রন্থের প্রামাণিকতা স্বীকার করেন না। আধুনিক যুগেও হয়ত অনেক সুললিত সহজ বোধগম্য ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে এবং বহুলোকে উহাদের প্রশংসা করিতেছে, কিন্তু এক-মাত্র শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামী প্রভুপাদের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্মত গ্রন্থ-ব্যতীত শুদ্ধ-ভক্ত-সমাজ অন্য কোন গ্রন্থপাঠেই আনন্দ লাভ করিতে পারেন না, কেননা তাহাতে সিদ্ধান্তবিরোধরূপ হলাহল সিদ্ধান্তদুগ্ধসিন্ধুকে লোকের নিকট গুপ্ত রাখিয়া জীবের প্রাণ হরণ করিতেছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবত সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

"চৈতন্য-নিতাইর যা'তে জানিয়ে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তের সীমা॥
ভাগবতে যত ভক্তিসিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন ইঁহা জানি' করিয়া উদ্ধার॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ৮।৩৬, ৩৭)

অতএব গ্রন্থভাগবত ও ভক্তভাগবত উভয়েই ভক্তি সিদ্ধান্ত-কীর্ত্তনকারী। ভক্তিসিদ্ধান্তে স্বাভাবিক পারঙ্গতি ব্যতীত বৈষ্ণবতা নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু বেঙ্কট ভট্টকে বলিয়াছেন,—

"শাস্ত্র সিদ্ধান্ত শুন, যা'তে বৈষ্ণব-বিশ্বাস।"

(চৈঃ চঃ মঃ ৯।১৫২)

শ্রীমন্মহাপ্রভু সিদ্ধান্তকে যে কত আদর করিতেন, তাহা তাঁহার চরিত্রের অসংখ্য ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয়। প্রচলিত বিচারানুসারে অসুর রাবণ অপ্রাকৃত মহালক্ষী সীতাদেবীকে (?) হরণ করিয়াছে, এইরূপ কথা ধর্ম্ম-ইতিহাসে ও আখ্যায়িকায় শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর" ইহাই ভক্তিসিদ্ধান্ত। যখন মাদুরায় এক রামভক্ত বিপ্রকে মহাপ্রভু ঐ ভক্তিসিদ্ধান্ত বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন ও তৎপরেই যখন সেতুবন্ধে মহাপ্রভু কুর্ম্মপুরাণে ঐ সিদ্ধান্তের সমর্থন পাইয়াছিলেন অর্থাৎ "সীতা যখন 'রাবণকে দেখিয়া অগ্নির শরণাপন্ন হইলেন, তখন অগ্নিদেব রাবণকে মায়াসীতা প্রদান করিয়া তাহাকে **বঞ্চনা** করিলেন ও রঘুনাথ যখন রাবণকে বিনাশ করিয়া সীতাকে অগ্নিপরীক্ষার জন্য আনয়ন করিলেন, তখন মায়াসীতা অগ্নিতে অন্তর্হিত হইলেন ও অগ্নিদেব সত্যসীতাকে রামচন্দ্রের নিকট আনিয়া দিলেন" এইরূপসিদ্ধান্ত পুরাণে শুনিতে পাইলেন—

"এ-সব সিদ্ধান্ত শুনি' প্রভুর আনন্দ হইল।
ব্রাহ্মণের স্থানে মাগি' সেই পত্র নিল॥
নূতন পত্র লেখাঞা পুস্তকে দেওয়াইল।
প্রতীতি লাগি' পুরাতন পত্র মাগি' নিল॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ৯।২০৮, ২০৯)

ভক্তগণের কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণময়ী চিত্তবৃত্তির খাপে খাপে ভক্তি-সিদ্ধান্ত মিলিয়া যায়। আচার্য্য শঙ্কর সাক্ষাৎ শঙ্করের অবতার বলিয়া সমগ্র হিন্দুসমাজে পূজা লাভ করিয়াছেন। শঙ্কর কৃষ্ণপ্রিয়তম

জগদ্‌গুরু মহাদেবের অবতার, আচার্য্য, ধর্ম্মবক্তা, বেদবিরুদ্ধ মতবাদনিরাসক, শ্রেষ্ঠ-বেদান্ত-ভাষ্যকার প্রভৃতিরূপে সর্ব্বসাধারণের ধারণায় ধর্ম্মজগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা সমগ্র জগৎকে বিস্ময়ে আপ্লুত করিয়াছে। সেইরূপ শঙ্করের প্রচারিত মতবাদ কিরূপে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতবাদ বা বৌদ্ধমতবাদ হইতেও অধিকতর নাস্তিকতাগর্ভ বলিয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সিদ্ধান্ত করিলেন, স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেবই বা সেই মতের কেন নিন্দা করিলেন? এই সমস্যা ভঞ্জন করিতে পারিয়াছে—একমাত্র শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের বিচারে কৃষ্ণের প্রিয়তম শঙ্কর ও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠত্বধর্ম্ম সংগোপন করিয়া অসুর মোহন ও বিমুখ বঞ্চনা করিবার জন্য কৃষ্ণেচ্ছায় অবতীর্ণ হন। শঙ্করকে "অসুরমোহনাবতার" বলিয়া ঘোষণা একমাত্র শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তশাস্ত্রব্যতীত আর কেহই করিতে সাহস পান না। এই সিদ্ধান্ত সমস্ত সমগ্র মানব সমাজের চিন্তাস্রোতে এক বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে। ভক্তিসিদ্ধান্ত এত বড় জিনিষ!

পঞ্চোপাসনা বা সগুণব্রহ্মোপাসনার নামে বিভিন্ন দেবতার উপাসনা সমগ্র হিন্দুনামধারী ব্যক্তিগণের মধ্যে বহুল প্রচারিত। সেই বিপুল গণমতের বিরুদ্ধে ভক্তিসিদ্ধান্ত ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ে যুক্তি ও বিশ্লেষণের সহিত বিবৃত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই সিদ্ধান্তশাস্ত্রটী উদ্ধার ও জগতে দান করিয়াছেন। ভক্তি-সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র আবিষ্কারে মহাপ্রভুর কি বিপুল আনন্দ ও উল্লাস হইয়াছিল, তাহা আমরা শ্রীচরিতামৃতের বর্ণনায় দেখিতে পাই,—

"পুঁথি পাঞা প্রভুর হৈল আনন্দ অপার।
কম্পাশ্রু, স্বেদ, স্তম্ভ, পুলক বিকার।।
সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র নাহি 'ব্রহ্মসংহিতা'র সম।
গোবিন্দমহিমা জ্ঞানের পরম কারণ॥
অল্পাক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।
সকল-বৈষ্ণবশাস্ত্র-মধ্যে অতি সার।"

(চৈঃ চঃ মঃ ৯।২৩৮-২৪০)

একমাত্র সিদ্ধান্তে সহজ পারদর্শিতা দেখিয়াই মহাপ্রভুর নিজজন বা রূপ-রঘুনাথের নিজজনের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীরামানন্দাদি ভক্তগণ শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুকে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ নিজজন বলিয়া বিচার করিয়াছিলেন, একমাত্র শ্রীরূপের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া—

"রায়, ভট্টাচার্য্য বলে,—তোমার প্রসাদ বিনে।
তোমার হৃদয় এই জানিল কেমনে॥
আমাতে সঞ্চারি পূর্ব্বে কহিলা সিদ্ধান্ত।
যে-সব সিদ্ধান্তে ব্রহ্মা নাহি পায় অন্ত।।
তা'তে জানি—পূর্ব্বে তোমার পাঞাছে প্রসাদ।
তাহা বিনা নহে তোমার হৃদয়ানুবাদ॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ১।১১৫-১১৭)

"কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
নাটক-লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার।।"

(চৈঃ চঃ অঃ ১।১৯৩)

"রায় কহে.—কোন্ গ্রন্থ কর হেন জানি ?
যাহার ভিতরে এই সিদ্ধান্তের খনি ॥"
(চৈঃ চঃ অঃ ১।১২৩)

শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু প্রভৃতি গৌর-জনগণ ভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রকাশক ও পরিপালক বলিয়া গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আচার্য্যরূপে পূজিত। শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীল জীব গোস্বামীর কথা শ্রীচরিতামৃত-কার বলিয়াছেন,—

"ভাগবত-সন্দর্ভ-নাম কৈল গ্রন্থ-সার।
ভাগবত-সিদ্ধান্তের তাহাঁ পাইয়ে পার ॥"
(চৈঃ চ: অ: ৪।২২৯)

বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ; শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, ইঁহাদের অন্য কোন লোকরঞ্জনের বিভূতি ছিল না। ইঁহারা ব্যবসায়ী পাঠক, বক্তা বা গায়ক প্রভৃতির ন্যায় লোকরঞ্জন করিতে পারিতেন বলিয়া কিংবা জটাজুট বা তপস্যার বিভূতি দেখাইতে পারিতেন বলিয়া অথবা খুব ক্রিয়াদাক্ষ্য বা কর্ম্মবীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া "জগদ্‌গুরু বৈষ্ণবাচার্য্য" বলিয়া পূজিত হন নাই। একমাত্র তাঁহাদের ভক্তিসিদ্ধান্তই তাঁহাদের আচার্য্যত্ব প্রকাশ করিয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শতাধিকগ্রন্থ, শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকার প্রবন্ধনিবন্ধাবলী শ্রীরূপরঘুনাথের সিদ্ধান্তের সার। শ্রীল গৌরকিশোর জড়পাণ্ডিত্যে

পারদর্শিতা প্রকাশ না করিয়াও অনুক্ষণ যে সকল সিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিতেন, তাহা সিদ্ধান্তসাগরের এক একটি মহানিধি। আর তাঁহারই শ্রেষ্ঠশিষ্য জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্তের সাক্ষাৎ সরস্বতী। এইখানেই ইঁহাদের আচার্য্যত্ব।

যেইখানে সিদ্ধান্ত-বিরোধ, সেইখানে মহাপ্রভুর প্রীতি বা শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের সেবা নাই। আর যেখানে ভক্তি-সিদ্ধান্তের নবনবায়মান স্ফূর্ত্তি, তথায়ই মহাপ্রভু ও স্বরূপ-সনাতন-রূপ-রঘুনাথের প্রীতি ও কৈঙ্কর্য্য। সিদ্ধান্ত জিনিষটি কখনই স্তম্ভভাববিশিষ্ট বস্তু নহে। যিনি যতটা ভজনে অগ্রসর হইতেছেন, যাঁহার যতটা নিরপরাধে কৃষ্ণানুশীলন হইতেছে, তাঁহার হৃদয়ে সিদ্ধান্তের ততটা নবনবায়মান স্ফূর্ত্তি হয়। নিরপরাধ-অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন-কারিগণের যেরূপ সিদ্ধান্তে সহজস্ফূর্ত্তি স্বাভাবিক, হরি-গুরু-বৈষ্ণবাপরাধিগণেরও তদ্রূপ প্রতি পদে পদে সিদ্ধান্ত বিরোধ অনিবার্য্য।

—ঃঃ—

মঠ মন্দিরাদির প্রয়াস

বৈধী ভক্তির অনুশাসনের মধ্যে মঠ মন্দির অট্টালিকা প্রভৃতির জন্য প্রয়াস নিষিদ্ধ হইয়াছে। আবার শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি স্মৃতিনিবন্ধ শাস্ত্রে শ্রীমঠমন্দিরাদি নির্ম্মাণের অশেষ প্রশংসা, তাহা স্থাপনের ব্যবস্থা ও প্রয়োগ-পদ্ধতিও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। একমাত্র

ঐকান্তিক শ্রীনামপরায়ণ নিষ্কিঞ্চনগণের অপ্রাকৃত ভজন-চেষ্টার অনুকরণ করিয়া এবং তাঁহাদের ভজনের অন্তরতম তাৎপর্য্য উপলব্ধি ও ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া একশ্রেণীর ব্যক্তি স্বস্ব-অক্ষমতা ও বহির্ম্মুখ অলসতাকে নিষ্কিঞ্চনগণের ভজনের সহিত সমান মূল্যে প্রচলিত করিবার দুরাশা পোষণ করিতেছেন ও সেই দুরাশামূলে যে-স্থানে হরিসেবানুশীলনের জন্য কোন ভুবনমঙ্গল মঠ-মন্দির বা ভক্তিসঙ্ঘারাম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের আয়োজন হইতেছে, সে-স্থানে মৎসরতাজনিত দুরভিসন্ধি ও কুযুক্তি উত্থাপন করিয়া শুদ্ধ-ভগবদ্ভক্তি-প্রচার-চেষ্টাকে পঙ্গু করিবার জন্য চেষ্টান্বিত হইতেছেন।

বস্তুতঃ অনর্থযুক্ত নিত্যবদ্ধ সাধকজীবের জন্য যাহা অনুশাসন, অনর্থ-পরিমুক্ত নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যকুলের লোক শিক্ষাময় চরিত্রে সেই লগুড়-তাড়িত পশুপালনবিধির স্বীকার সকল ক্ষেত্রে ভুবনমঙ্গলার্থ বিহিত হয় না। সমর্থব্যক্তি আপাত দৃষ্টিতে বিধি লঙ্ঘন করিয়াও বিধির মর্য্যাদা স্থাপন করিতে পারেন, ইহাই তাঁহাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। শ্রীরামানুজাচার্য্য তদীয় গুরুদেব শ্রীগোষ্ঠীপূর্ণের বাক্য লঙ্ঘন করিয়াও তৎপ্রদত্ত সুগোপ্য মন্ত্ররাজ বহুব্যক্তিকে শ্রবণ করাইয়া তাঁহাদের মঙ্গল বিধান ও তদ্দ্বারা গুরুসেবাই করিয়াছিলেন। অনর্থযুক্ত জীব ইহার অনুকরণ করিলে অমঙ্গলের রাজ্যে পতিত হইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ২২শ পরিচ্ছেদে "**বহুগ্রন্থ কলাভ্যাস-ব্যাখ্যান বর্জ্জিব**"—সনাতন-শিক্ষার এই উপদেশটী জানিয়াও শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুপাদ ও স্বয়ং শ্রীল কবিরাজ

গোস্বামী প্রভু বিবিধ অবৈষ্ণবমতবাদ নিরাসের জন্য বহুগ্রন্থ-কলাভ্যাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ঐরূপ বহুগ্রন্থাভ্যাস অনর্থযুক্ত জীবের ন্যায় অমঙ্গলের হেতু না হইয়া ভুবনমঙ্গলের সেতু হইয়াছে। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীল রসিকানন্দ প্রভু সনাতন-শিক্ষার 'বহুশিষ্য না করিব"—এই উপদেশ পাঠ করিয়াও বহুশিষ্য স্বীকার পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট সেবাই করিয়াছিলেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর যাঁহার পাদপদ্মে আত্মবিক্রয় করিয়াছেন, সেই শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু আদৌ কোন শিষ্য করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। ঠাকুর নরোত্তমের ন্যায় মহাপুরুষ কতপ্রকার সেবা যত্ন করিয়া সেই নিষ্কিঞ্চন লোকনাথ প্রভুর একমাত্র শিষ্য হইতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু ঠাকুর নরোত্তম যে একাধিক বা বহুশিষ্য করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পারমার্থিক ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে খচিত রহিয়াছে। স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ হয়ত এখানে বলিবেন, ঠাকুর নরোত্তম শ্রীগুরুদেবের আদর্শের বিরুদ্ধ আচরণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ঠাকুর নরোত্তম ভারবাহিগণের নিকট প্রতিভাত ঐরূপ বিরুদ্ধ আচরণ করিয়াও শ্রীলোকনাথ প্রভুরই আদর্শের অনুসরণ ও মনোঽভীষ্ট সেবা করিয়াছেন। শ্যামানন্দ প্রভু ও রসিকানন্দ প্রভুর সহস্র সহস্র শিষ্যের নামতালিকা পারমার্থিক ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। রাজা মহারাজা হইতে কুটীরবাসী দরিদ্র, মনুষ্য হইতে মদমত্ত পশু (গোপাল দাস হস্তী) প্রভৃতি ইঁহাদের শিষ্যত্বে অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন। শৌক্রবিচারপর ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত

ম্লেচ্ছ-যবনাদিকেও ইঁহারা অহৈতুকভাবে অমায়ায় কৃপা করিয়াছিলেন। তাই আচার্য্যের বাণীতে শুনিতে পাই যে, বৈষ্ণব-সদ্‌গুরু শিষ্য করেন না, গুরু করিয়া থাকেন—তিনি সকল জীবকে তাঁহার প্রভুর দাস্যে নিযুক্ত করিয়া নিজে তাঁহাদের সহযোগে সঙ্কীর্ত্তন করেন, তাঁহার প্রভুর বাণী কীর্ত্তন করেন। অনর্থযুক্ত বদ্ধ-জীব প্রভু-অভিমানে শিষ্য করিতে ধাবিত হয় বলিয়া তাহার প্রতি ঐরূপ বহুশিষ্য না করিবার অনুশাসন রহিয়াছে।

শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী রচিত 'প্রেমবিবর্ত্ত' গ্রন্থে অনর্থযুক্ত সাধক জীবের প্রতি এইরূপ উপদেশ দৃষ্ট হয়—

"মঠ, মন্দির, দালান বাড়ীর না কর প্রয়াস।
অর্থ থাকে কর ভাই যেমন অভিলাষ॥
অর্থ নাই, তবে মাত্র সাত্ত্বিক সেবা কর।
জল-তুলসী দিয়া গিরিধারীকে বক্ষে ধর॥
বৈষ্ণবে আদর কর প্রসাদাদি দিয়া।
অর্থ নাই দৈন্যবাক্যে তোষ' মিনতি করিয়া॥"

এই সকল উক্তির কদর্থ করিয়া এক শ্রেণীর অক্ষম ও মৎসর ব্যক্তি ভুবনমঙ্গল শ্রীনাম-প্রচারের প্রতিষ্ঠান মঠ-মন্দিরাদি-স্থাপনকে ভক্তিবিরুদ্ধ চেষ্টা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহে। ইহা-দের হৃদয়ের কপটতা ও মৎসরতা যতই অসূর্য্যম্পশ্যা কামিনীর ন্যায় আত্মগোপনের চেষ্টা করুক্ না কেন, ইহাদের আচার ও প্রচারের মধ্যে উহা সময় সময় আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলে। প্রথমতঃ ইহারা যখন হিমালয়ের সহিত লোষ্ট্রখণ্ডের প্রতিযোগিতা

অথবা ঢঙ্গবিপ্রের ঠাকুর হরিদাসের অকৈতব সেবা-চেষ্টা অনুকরণ করিয়া অকৃতকার্য্য ও অপ্রস্তুত হইবার ন্যায় অবস্থায় পতিত হয়, তখনই "আঙ্গুর ফল অতি অম্ল" এই শার্গালী নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। নিরাশার নিশ্বাস যখন তাহাদের অন্তরের আগ্নেয়গিরির চাপা আগুনকে আরও উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে, তখনই তাহারা উন্মত্তবৎ অপ্রাসঙ্গিক ও অসংবদ্ধ নানা প্রকার কথা বলিয়া সিদ্ধান্তশাস্ত্রের দোহাই দিতে দিতে কুসিদ্ধান্তের ভস্মস্তূপ উদ্গীরণ করিয়া থাকে।

প্রেমবিবর্ত্তের ঐ বাক্যে মঠ-মন্দির, দালানবাড়ীর প্রয়াস নিষিদ্ধ হইয়াছে; এখানে 'প্রয়াস' শব্দটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই 'প্রয়াস' শব্দটি শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর "অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ" শ্লোকের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলে অনেকটা সন্দেহ ভঞ্জন হইবে। যে ব্যক্তি অর্থাদি আহরণ তৎপর হইয়া কেবল লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্য অট্টালিকা-প্রাসাদাদি-স্থাপনের প্রয়াস করিয়া বেড়ায়, তাহার সেই চেষ্টা সেবাবিমুখিনী বলিয়া উহার প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। "অর্থ থাকে কর ভাই যেমন অভিলাষ" এই পরবর্ত্তী চরণের উক্তি-মধ্যে দৃষ্ট হয় যে, বিষয়িগণ যদি তাহাদের অর্থের দ্বারা ভগবদ্ভক্তি-প্রচারের প্রতিষ্ঠান-সমূহের সাহায্য না করে, তবে তাহাদিগকে বিত্তশাঠ্যের অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধের "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ" এই প্রসিদ্ধ শ্লোকের 'অর্চ্চন' শব্দের ব্যাখ্যায় "ক্রমসন্দর্ভ" কার শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদ প্রদর্শন

করিয়াছেন। ইহারই সংক্ষেপ আমরা আচার্য্যের এই বাণীতে শ্রবণ করিতে পারি,—

"তোমার কনক, ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব॥"

পতিতপাবন ভুবনমঙ্গল আচার্য্যগণের আনুগত্যে যদি বিষয়িগণ তাঁহাদের অর্থ-সম্পত্তি হরিসেবায় নিযুক্ত করিতে না পারিতেন, অট্টালিকা-প্রাসাদাদি-নির্ম্মাণের যে প্রয়াস-প্রবৃত্তি তাঁহাদের হৃদয়ে জন্মজন্মান্তর ধরিয়া পুঞ্জীভূত বীজাকারে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, যদি সেই প্রবৃত্তিকে কোন অতিমর্ত্ত্য শিল্পী ও নিয়ামকের আনুগত্যে নিয়মিত ও হরিসেবার অভিমুখে পরিচালিত করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ঐ বিষয়প্রবৃত্তি কেবল্ যে আত্ম অমঙ্গলের কারণ হইত শুধু তাহা নহে; পরন্তু সমাজকে নাস্তিকতা, অনাচার ও ভোগবিষে জর্জ্জরিত করিয়া নরকেরপথ সমৃদ্ধ করিয়া তুলিত। আর আধুনিক জগতে তাহাই হইতেছে; যাহাদের অর্থ আছে তাহারা কেবল "আমি খাব' দা'ব ও আমার আত্মীয় স্বজনকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া তাহাদিগকেই ভোগ করিব"—এই বুদ্ধিতে পরিচালিত হইতেছে। আবার ঐরূপ ভোগীসমাজের মধ্য হইতে কেহ কেহ ভারবাহী উদারতার হস্ত প্রসারণ করিয়া altruist বা পরার্থশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িতেছে এবং নাস্তিকতাময় ভোগ ও "গরু মারিয়া জুতা-দানের" নীতি প্রসারিত করিতে

করিতে ভোগের উত্তরফল ভোগ তাহার উত্তরফল মৃত্যু - এই ভোগ ও মৃত্যুর নাগর-দোলায় আরোহণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সনাতনধর্ম্মের প্রচারের প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বকালে বিষয় ধুরন্ধরগণ কোন না কোন মহাপুরুষ ও লোকোত্তর আচার্য্যগণের আনুগত্যে হরিভক্তি প্রচারের এক এক বিপুল প্রতিষ্ঠান মঠ-মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। আজও শ্রীজগন্নাথদেবের সুবিশাল মন্দির, শ্রীভুবনেশ্বরের মন্দিররাজি, দাক্ষিণাত্য প্রদেশের শত শত অভ্রভেদী মন্দির এই সত্যের সাক্ষ্য দিতেছে। বিত্ত-শাঠ্যঅপরাধে অপরাধী বিষয়ীগণের মঙ্গলের জন্য তিরুমঙ্গই আলোয়ার দস্যুবৃত্তি করিয়াও সপ্তপ্রাকার বিশিষ্ট শ্রীরঙ্গনাথ-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য বিভিন্ন স্থানে কত কত বৈষ্ণবমঠের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমধ্বমুনি উড়ুপী গ্রামে অষ্টমঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মূল মহাজন শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীজীব, শ্রী গোপালভট্ট প্রভৃতি প্রভুপাদগণ বিষয়িগণের দ্বারা মাথুরমণ্ডলে শ্রীগোবিন্দদেব, শ্রীমদনমোহন, শ্রীরাধা-দামোদর, শ্রীরাধারমণ প্রভৃতি অভীষ্ট বিগ্রহগণের অভ্রভেদী শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। একান্ত নিষ্কিঞ্চনবর শ্রীল রঘুনাথ ভট্টগোস্বামী প্রভুর সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন—

> "নিজ শিষ্যে কহি" গোবিন্দের মন্দির করাইলা।
> বংশী, মকর, কুণ্ডলাদি 'ভূষণ' করি' দিলা॥"
>
> (চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩।১৩১)

শ্রীরূপের শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমন্দিরের উন্নত চূড়া দেখিয়া বিধর্ম্মীর মৎসরতার উদয় হওয়া অস্বাভাবিক নহে, কিন্তু কলির এমনই প্রভাব যে, ইহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন তথাকথিত স্বধর্ম্মাবলম্বীর বৈষ্ণব মন্দির-মঠাদির প্রাসাদ দর্শনে হৃদয়ে মৎসরতার আগ্নেয়গিরি প্রস্তুত হইতেছে এবং উহা সময় সময় কুযুক্তি ও কুসিদ্ধান্ত ভস্ম উদ্গীরণ করিতেছে।

অর্থহীন বা অর্থবান্ ব্যক্তি স্বতন্ত্র হইয়া মঠ-মন্দির-দালান-বাড়ী প্রভৃতি বিস্তারের জন্য "প্রয়াস" করিতে গেলে অসুবিধায় পতিত হইবে—নানা প্রকার অভক্তিপর অহমিকা ও অসুবিধায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে, ইহাই ভক্তি-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য সুদক্ষ ওঝার আনুগত্য স্বীকার করিয়া কেবল অনুকরণ-প্রবৃত্তিবশে সাপ লইয়া খেলিতে গেলে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। বস্তুতঃ যিনি বা যাঁহারা সাপের ঔষধ জানেন, তাঁহাদের অনুগত হইয়া যদি কেহ ঐ কার্য্য করেন, তবেই তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের মঠ-মন্দির-দালানবাড়ী প্রভৃতি নির্ম্মাণ ও প্রসারের চেষ্টা বিষয়ীর ঠাকুরবাড়ী বা ইট্‌পাটকেলের স্তূপ প্রসারের ন্যায় প্রাণহীন চেষ্টা নহে। হরিভক্তিপ্রচার ও হরিকীর্ত্তন-কারিগণের সঙ্ঘ বা সৎসঙ্গের সুলভার্থ ও হরিভজন-সমৃদ্ধির স্থান প্রসারের উদ্দেশ্যেই ঐ সকল মঠ-মন্দির। শ্রীচৈতন্যবাণী ঐ সকল মঠ-মন্দিরের অধিদেবতা বা প্রাণস্বরূপ। যেইস্থান যখন এই উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হয়, সেইস্থানে তখন শ্রীচৈতন্যমঠ বা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অস্তিত্ব নাই।

আধুনিক কালে কোন কোন স্থানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অবৈধ অনুকরণে মঠমন্দিরাদি স্থাপন করিবার ক্ষুদ্র ও ব্যর্থ চেষ্টা হইতেছে। ঐরূপ চেষ্টা অতি নগণ্য বুঝিয়া প্রয়াস-কারিগণ নিজেদের অভক্তিপর আনুকরণিক অবৈধ প্রয়াসে দোষ না দেখিয়া অহৈতুক ভুবনমঙ্গল সং প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের প্রতি দোষারোপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন! ইহার অন্তর অনুসন্ধান করিলে নিছক মৎসরতার গুপ্ত মূর্ত্তিটি প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে এই ক'এক বৎসরের মধ্যেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের অনুকরণে তাহার সহিত অবৈধ প্রতিযোগিতা করিবার জন্য মঠ-মন্দিরাদির অবগুণ্ঠনে কতকগুলি বিশ্রান্তিভবন ও উপহার গৃহ প্রভৃতি সৃষ্টি হইয়া গেল, অথচ ইহাদের পুরঞ্জনেরাই শার্গালী নীতি অবলম্বন করিয়া বলিয়া থাকেন, মঠ-মন্দিরাদি স্থাপন ভক্তি বিরুদ্ধ কার্য্য! ইহা "আঙ্গুরফল অতি অম্ল" এই নীতিই বটে !!

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদে দেখিতে পাই শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের ন্যায় প্রতিষ্ঠাশানির্ম্মুক্ত নিষ্কিঞ্চনকুল-শিরোমণিকে শ্রীগোপালদেব আজ্ঞা দিয়াছিলেন,—

"এক মঠ করি' তাঁহা করহ স্থাপন।"

শ্রীচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে দেখিতে পাই যে, যিনি এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুও শ্রীমন্‌-মহাপ্রভুর সেবার জন্য একটি মঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন—

"দ্বাদশ আদিত্য টিলায় এক 'মঠ' পাইলা॥
সেইস্থান রাখিলা গোঁসাঞি সংস্কার করিয়া।
মঠের আগে রাখিলা এক চালি বান্ধিয়া॥"

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবার জন্য, শ্রীহরিনাম প্রচারের জন্য যে মঠাদি স্থাপনের প্রয়াস, তাহাই ভক্তিবৃদ্ধির অনুকূল; নতুবা হরিসেবা পরিত্যাগ করিয়া দেহারামতা বা ভূসম্পত্তি প্রভৃতির অধিকারিত্ব-স্থাপনের প্রাকৃত প্রয়াসই অভক্তিমার্গ। যিনি বা যাঁহারা অতীত, বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎকালে ঐ মূল উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, হইতেছেন বা হইবেন, তজ্জন্য তিনি বা তাঁহারাই সম্পূর্ণ দায়ী। স্বতন্ত্র জীব স্বেচ্ছায় যে আত্ম-অমঙ্গল বরণ করে, তজ্জন্য পরদুঃখ-দুঃখী ভুবনপাবন লোকোত্তর মহাপুরুষগণের অমন্দোদয়দয়া দায়ী নহেন, ইহা যাঁহারা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারাই দুর্দ্দৈবগ্রস্ত জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারের দৃষ্টান্তের ভার বহন করিয়া এই সংসারে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করেন। ভুবনমঙ্গল আচার্য্যের কৃপা তাঁহাদিগকে সুবুদ্ধি প্রদান করুন।

—৻—

শ্রীধাম-বাস ও শ্রীহরিভজন

শ্রীধামে বাস বা শ্রীভগবানের জন্ম-লীলাদি-স্থান শ্রীদ্বারকা, শ্রীমথুরা, শ্রীনবদ্বীপাদি শ্রীকৃষ্ণতীর্থে বাস বা গঙ্গাদি-সমীপে বাস

সাধনভক্তির অঙ্গ-বিশেষ। কি বৈধী ভক্তির যাজনকারী, কি রাগানুগা ভক্তির যাজনকারী, উভয়ের পক্ষেই শ্রীকৃষ্ণতীর্থে বাসের কথা শ্রীরূপাদি গোস্বামিবৃন্দ আচরণমুখে প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমথুরাদি শ্রীকৃষ্ণতীর্থে বাস শ্রেষ্ঠ-সাধন পঞ্চকের অন্যতম। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পার্ষদবৃন্দের মধ্যে কি বিরক্ত, কি গৃহস্থ-লীল সকল-ভক্তই কৃষ্ণতীর্থাদিতে বাস করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেও শ্রীজগন্নাথ মিশ্র, শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীমুরারিগুপ্ত-প্রমুখ শ্রীগৌর-নিজ জনগণ তাঁহাদের আবির্ভাবস্থান শ্রীহট্ট-প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগঙ্গা-তীরে বাস করিবার জন্য শ্রীধামমায়াপুর-নবদ্বীপে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীল বাসুদেব দত্তঠাকুর, শ্রীমুকুন্দ দত্তঠাকুর, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতি চট্টগ্রামবাসী শ্রীগৌর-ভক্তগণ শ্রীনবদ্বীপবাসী হইয়াছিলেন। ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে প্রত্যেক সনাতনধর্ম্মাবলম্বী শ্রীভগবল্লীলা-স্থলীতে বাস ও অনেকে শেষ-বয়সে কোন ভগবত্তীর্থে দেহপাত করিবার অভিলাষে তথায় বাস, অন্ততঃ গঙ্গা প্রভৃতি বিষ্ণুসম্বন্ধিনী নদীর তটে বাস অভিলাষ করিয়া থাকেন। শ্রীনবদ্বীপবাসী (বিদ্যানগর) শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কেবলাদ্বৈতবাদ-বিচারপরায়ণ ও গৃহস্থ হইয়াও শ্রীক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক ক্ষেত্রসন্ন্যাস করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সহধর্ম্মিণীর সহিত কোন তীর্থক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক জীবনান্ত-কাল-পর্য্যন্ত অবস্থান, কেহ বা সংসারাদি পরিত্যাগ করিয়া একাকী কোন ভগবল্লীলা-স্থানে গমনপূর্ব্বক তথায় দেহপাত

করিয়া থাকেন। পূর্ব্ববঙ্গবাসী শ্রীতপন মিশ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শ্রীহরিনাম লাভ করিবার পর শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় সহধর্ম্মিণী ও পুত্র শ্রীরঘুনাথের সহিত কাশীবাসী হইয়াছিলেন। কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসী সশিষ্য শ্রীপ্রকাশানন্দের দৃষ্টান্ত এবং বর্ত্তমান-কালেও মায়াবাদী ও পঞ্চোপাসক ব্যক্তিগণের দ্বারা আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের তীর্থসমূহ কিরূপ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা সকলেই বিদিত আছেন। যাঁহারা শ্রীভগবানের নাম, ধাম, রূপ, গুণ ও লীলাকে অনিত্য মনে করেন, তাঁহারাও শ্রীধামের বা শ্রীলীলাস্থানের প্রভাব স্বীকার করেন। প্রত্যেক তীর্থস্থানে, বিশেষতঃ গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, কাবেরী, সরযূ প্রভৃতি পুণ্য-নদী-তটে জমায়েৎ-সম্প্রদায়, নাগা-সম্প্রদায় ও নানাপ্রকায় নির্ব্বিশেষ-বাদি-সম্প্রদায়ের সাধুর সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। শাক্ত ও শৈবগণ যেইরূপ কাশী, বৈদ্যনাথ, হরিদ্বার, হৃষীকেশ প্রভৃতি তীর্থ-স্থানে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবনামধারীগণও তদ্রূপ শ্রীনবদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীকোলদ্বীপ, শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীরাধাকুণ্ড প্রভৃতি লীলাস্থানে বাস করিবার জন্য সমবেত হন। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের মধ্যেও ব্রজরজঃ-প্রাপ্তি, শ্রীযমুনা-প্রাপ্তি ও শ্রীগঙ্গা-প্রাপ্তির আশা দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ পূর্ব্ব-জীবন বা বর্ত্তমান-জীবনের নীতি-বিগর্হিত কার্য্যকে স্বদেশ ও সমাজের চক্ষুর অন্তরালে রাখিবার জন্য তীর্থাদি স্থানে বাসের অভিনয় করিয়া থাকে। যেইরূপ প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ে হেলায় (ইচ্ছাপূর্ব্বিকা অপরাধ) নাম (?) গ্রহণ করিলেও নামের (?) প্রভাবেই মঙ্গল হয়, এইরূপ ধারণা আছে, সেইরূপ যে-কোনরূপে

শ্রীধাম-বাসের অভিনয় করিলেই পর-জন্মে মুক্তি লাভ করা যায়, এইরূপ সংস্কার অনেকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের অনেকেই নাম-বলে পাপ-প্রবৃত্তিরূপ নামাপরাধ-বিষয়ে যেইরূপ অজ্ঞ বা তাহা জানিয়াও সেই সকল শাস্ত্রোপদেশ-শ্রবণে অনিচ্ছুক, তদ্রূপ অনেকেই ধামাপরাধের বিষয় অজ্ঞ বা তদ্বিষয়-শ্রবণে অনিচ্ছুক।

শাস্ত্রে সপ্তমোক্ষদা পুরী ও তীর্থাদিতে বাসের অসংখ্য ফলশ্রুতি পাওয়া যায়। যাঁহারা ফলশ্রুতি অপেক্ষা ভগবদ্-বসতিস্থলের প্রতি শরণাপত্তি-লক্ষণা শ্রদ্ধা ও প্রীতিযুক্ত হইয়া বাসকে অধিক আদরের সহিত বরণ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত শ্রীভগবল্লীলা-স্থানে বাসের যোগ্যপাত্র। পৃথিবীর অন্যান্য স্থান হইতে শ্রীভগবৎসম্বন্ধি-স্থানের বিশেষ প্রভাবের কথা স্বয়ং শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

"বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্॥"

(শ্রীভাঃ ১১।২৫।২৫)

বন—সাত্ত্বিক বাসস্থান, গ্রাম—রাজস বাসস্থান, দ্যূত স্থান—তামস-বাসস্থান ও মদীয় অধিষ্ঠানক্ষেত্র—নির্গুণ-বাসস্থান।

শ্রীশ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রীশ্রীল স্বামি-চরণ ও শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুপাদের টীকার মর্ম্ম অবলম্বন করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"ভগবন্নিকেতনন্তু সাক্ষাত্তদাবির্ভাবান্নির্গুণং স্থানমিতি স্বামি-চরণাঃ। ভগবৎসম্বন্ধমাহাত্ম্যেন নিকেতনস্য নৈর্গুণ্যং স্পর্শমণিন্যা-য়েনেতি সন্দর্ভঃ।"

শ্রীভগবানের লীলা-নিকেতন সাক্ষাৎ তাঁহার আবির্ভাবহেতু নির্গুণ স্থান,—ইহাই শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যা। শ্রীভগবৎসম্বন্ধ-মাহাত্ম্যের দ্বারা শ্রীভগবদধিষ্ঠান-ক্ষেত্রের স্পর্শমণি-ন্যায়ে নির্গুণত্ব, ইহা শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু সন্দর্ভে বিচার করিয়াছেন।

শ্রীল রূপগোস্বামী-প্রভু "শ্রীশ্রীমথুরামাহাত্ম্যে" শ্রীশ্রীহর-গৌরী-সংলাপ-প্রসঙ্গ উদ্ধার করিয়া শ্রীভগবল্লীলা-নিকেতন শ্রীমথুরার মাহাত্ম্যের কারণ এইরূপভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

শ্রীপাদ্মোত্তরখণ্ডে, পাতালখণ্ডে পার্ব্বতী প্রশ্ন :—

"উক্তোঽদ্ভুতশ্চ মহিমা মথুরায়া জটাধর।
মুনের্ভুবো বা সরিতঃ প্রভাবঃ কেন বা বিভো॥
কৃষ্ণস্য বা প্রভাবোঽয়ং সংযোগস্য প্রতাপবান্॥',

তত্রৈব শ্রীমহাদেবোত্তরং—

"ন ভূমিকা-প্রভাবশ্চ সরিতো বা বরাননে!
ঋষীণাং ন প্রভাবশ্চ প্রভাবো বিষ্ণুতারকে॥
তথা পারকচিচ্ছক্তেরুভে তৎপদ-কারকে।
তদেব শৃণু ভো দেবি! প্রভাবো যেন বর্ত্ততে॥
শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা সর্ব্বশ্চিচ্ছক্তের্যঃ প্রবর্ত্ততে।
তারকং পারকং তস্য প্রভাবোঽয়মনাহতঃ।
তারকাজ্জায়তে মুক্তিঃ প্রেমভক্তিশ্চ পারকাৎ॥"

(শ্রীমথুরা-মাহাত্ম্যম্, ১০৮-১১১ অনুচ্ছেদ)

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হে জটাধর! আপনি শ্রীমথুরার অদ্ভুত মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্য উহা

কি তত্রত্য মুনিগণের, ভূমিভাগের ও নদীর মহিমাই হইবে? অথবা উহাতে শ্রীকৃষ্ণের সংযোগ আছে বলিয়া উহার এত প্রতাপান্বিত প্রভাব হইল?"

শ্রীমহাদেব উত্তরে বলিয়াছেন,—'হে বরাননে! ইহা ভূমির মাহাত্ম্য নহে, নদীর বা মুনিদিগেরও মাহাত্ম্য নহে; তবে বিষ্ণুর তারক-মন্ত্রেরই প্রভাব এবং বিষ্ণুর যে পারক-চিচ্ছক্তি আছেন—তাঁহারও মহিমা বটে। এই তারক ও পারক উভয় শক্তিই সেই বিষ্ণুপদ দান করিয়া থাকেন। তাহাতেই যে প্রভাব আছে, তাহাই তুমি শ্রবণ কর। চিচ্ছক্তি হইতে শ্রীকৃষ্ণের যে-সকল মহিমারই অভিব্যক্তি হয়, তাহা তাঁহার 'তারক ও পারক' এই দুয়েরই অব্যাহত প্রভাব বলিয়া কথিত হয়। তারক-শক্তি হইতে মুক্তি লাভ এবং পারক-শক্তি হইতে প্রেমভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

"পারকং যস্য জিহ্বাগ্রে তস্য সন্তোষ-বর্ত্তিতা।
পরিপূর্ণো ভবেৎ কামঃ সত্যসংকল্পতা তথা॥
দ্বিবিধা প্রেমভক্তিস্তু শ্রুতা দৃষ্টা তথৈব চ।
অখণ্ড-পরমানন্দস্তদ্গতো জ্ঞেয়-লক্ষণঃ॥
অশ্রুপাতং ক্বচিন্নৃত্যং ক্বচিৎ প্রেমাতিবিহ্বলঃ।
ক্বচিত্তস্য মহামূর্চ্ছা মদ্গুণো গীয়তে ক্বচিৎ॥"
(শ্রীমথুরামাহাত্ম্যম্, ১১৮-১২০ অনুচ্ছেদ)

যাঁহার জিহ্বাগ্রে পারকমন্ত্র বিরাজ করে, তাঁহার সর্ব্বদাই সন্তোষ, সর্ব্ব-অভিলাষ-পূর্ত্তি ও সংকল্প সত্য হইয়া থাকে। প্রেমভক্তি

দ্বিবিধ শ্রুতা (শ্রবণাদি ভক্তির দ্বারা উদিতা) ও দৃষ্টা (দর্শনাদি দ্বারা উদিতা)। অখণ্ড পরমানন্দই তাঁহার লক্ষণ বলিয়া জানিবে। প্রেমিক-জন কখনও অশ্রুপাত করেন, কখনও নৃত্য করেন, কখনও বা প্রেমে বিবশ হইয়া থাকেন, কখনও বা মহা মূর্চ্ছা-প্রাপ্ত হন, আবার কখনও আমার গুণগান করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণতীর্থ বা শ্রীগঙ্গাদি-সমীপে বাসের বিশেষ ফল এই যে, তত্তৎস্থানে নিগ্রন্থ মহাভাগবতগণ স্বেচ্ছায় বিচরণ করেন। যদি দৈবযোগে সেইসকল মহাভাগবতের দর্শন, শ্রীচরণারবিন্দ বন্দন, তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট-সেবন কিংবা তাঁহাদিগের বাণী শ্রবণ করিবার বা কৃপা-কটাক্ষে পতিত হইবার দুর্ল্লভতম সৌভাগ্য লাভ হয়, তবে ক্ষণকালের মধ্যেই জড়াসক্তির গ্রন্থি ছিন্ন হইতে পারে। কোলদ্বীপে একদিকে ধামাপরাধিগণের তাণ্ডব-নৃত্য, আর একদিকে মহাভাগবতবর পরমহংসকুলচূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ বা তৎপূর্ব্বে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী ঠাকুর, ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী ঠাকুর ; শ্রীগোদ্রুম-দ্বীপে কখনও শ্রীশ্রীগৌর-জন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, কখনও শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী ঠাকুর ; শ্রীধাম মায়াপুরে কখনও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, কখনও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, কখনও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী ঠাকুর, বা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী ঠাকুর দর্শন লাভ ও তাঁহাদের

বাণী শ্রবণ করিয়া অনেকের জীবন চিরতরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অজ্ঞতাক্রমে অন্য উদ্দেশ্যে বা স্থান-দর্শন-মাত্র-প্রয়াসী হইয়াও তীর্থাদিতে ভ্রমণ করিবার কালে অনেকের মহতের শ্রীচরণদর্শন ও সঙ্গ-প্রভাবে মঙ্গল হইয়াছে। শ্রীল শ্রীজীব-প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—

"শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবনাৎ॥"

(শ্রীভাঃ ১।২।১৬)

"ভুবি পুরুপুণ্যতীর্থসদনান্যৃষয়ো বিমদাঃ" (শ্রীভাঃ ১০।৮৭।৩৫) ইত্যাদ্যনুসারেণ প্রায়স্তত্র মহৎসঙ্গো ভবতি" ইতি তদীয় টীকানুমত্যা চ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ হেতোর্লব্ধা যদৃচ্ছয়া যা মহৎসেবা তয়া বাসুদেবকথারুচিঃ স্যাৎ। কার্য্যান্তরেণাপি তীর্থে ভ্রমতো মহতাং প্রায়স্তত্র ভ্রমতাং তিষ্ঠতাং বা দর্শন স্পর্শনসম্ভাষণাদিলক্ষণা সেবা স্বত এব সম্পদ্যতে। তৎপ্রভাবেণ তদীয়াচরণে শ্রদ্ধা ভবতি। তদীয়-স্বাভাবিক পরস্পর-ভগবৎকথায়াং কিমেতে সংকথয়ন্তি তৎ শৃণোমীতি তদিচ্ছা জায়তে। তচ্ছ্রবণেন চ তস্যাং রুচির্জায়ত ইতি তথা চ মহদ্ভ্য এব শ্রুতা ঝটিতি কার্য্যকরীতি ভাবঃ।"

হে বিপ্রগণ, পুণ্যতীর্থের সেবা-ফলে দৈবাৎ সুকৃতিক্রমে মহতের সেবা লাভ হয়। সেই মহতের সেবাফলে জাতশ্রদ্ধ পুরুষ মহতের শ্রীচরণ আশ্রয় করিতে সমর্থ হন। সদ্‌গুরুর নিকট শ্রবণ ফলে শ্রীবাসুদেবের কথায় রুচি উৎপন্ন হয়।

"নিরহঙ্কার মুনিগণ গুরূপদেশক্রমে তত্ত্ব ও সারাসারবিবেক

অবগত হইয়া সকল বিষয় পরিহার-পূর্ব্বক মহৎসঙ্গে সেই সকল কথা দৃঢ়রূপে জানিবার উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে অবস্থান-কালে পুণ্য-তীর্থক্ষেত্র-সমূহ পর্য্যটন করেন।”—এই শ্রুতি স্তবানুসারে তথায় মহৎ-সঙ্গই হইয়া থাকে। শ্রীস্বামিপাদের এই টীকানুসারে পুণ্যতীর্থ-নিষেবন-মূলে যদৃচ্ছা-প্রাপ্ত যে মহৎ-সেবা, তদ্দ্বারা শ্রীবাসুদেবের কথায় রুচি হয়। কেহ অন্য কার্য্যে তীর্থে ভ্রমন করিলেও তাঁহার তীর্থভ্রমণকারী বা তীর্থবাসকারী সাধুগণের দর্শন, স্পর্শন, সম্ভাষণাদি লক্ষণযুক্ত সেবা স্বভাবতঃই ঘটিয়া থাকে। তৎপ্রভাব-ফলে মহতের আচরণে শ্রদ্ধা হয়। শ্রীহরিজনগণের স্বাভাবিক শ্রীহরিকথাসংলাপ-শ্রবণকারিজনের ই'হারা কি বিষয়ক কথোপকথন করিতেছেন, তাহা আমি শ্রবণ করিব'—এইরূপ ইচ্ছা হয়। সাধুগণের সংলাপ কর্ণে প্রবেশ করিলে শ্রীহরিকথায় রুচি জন্মে এবং মহতের নিকট হইতে শ্রবণ করিলে অত্যল্প-কালের মধ্যেই উহা কার্য্যকরী হয়।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার ‘কল্যাণকল্পতরু’তে গাহিয়াছেন,—

“মন ! তুমি তীর্থে সদা রত।
অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চি, অবন্তিয়া,
দ্বারাবতী, আর আছে যত॥
তুমি চাহ ভ্রমিবারে, এ সকল বারে বারে,
মুক্তিলাভ করিবার তরে।
সে কেবল তব ভ্রম, নিরর্থক পরিশ্রম,
চিত্ত স্থির তীর্থে নাহি করে॥

তীর্থফল—সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ,
শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর।
যথা সাধু, তথা তীর্থ, স্থির করি' নিজ চিত্ত,
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর ॥
যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে তীর্থেতে নাহি যাই,
কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।
যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ ॥
কৃষ্ণভক্তি যেইস্থানে, মুক্তি দাসী সেইখানে,
সলিল তথায় মন্দাকিনী।
গিরি তথা গোবর্দ্ধন, ভূমি তথা বৃন্দাবন,
আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী ॥
বিনোদ কহিছে ভাই, ভ্রমিয়া কি ফল পাই,
বৈষ্ণব-সেবন মোর ব্রত ॥"

আবারশ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'শরণাগতি'তে গাহিয়াছেন,—

"কৃষ্ণ-বসতি, 'বসতি' বলি',
পরম আদরে বরি ॥
গৌর আমার, যে-সব স্থানে,
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান, হেরিব আমি,
প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে।"

ব্যক্তিগত মুক্তি-পিপাসা বা ভ্রমণ-কাম চরিতার্থ করিবার জন্য তীর্থ-বাস বা তীর্থ-ভ্রমণকে বৃথা পরিশ্রম বলিয়াই শ্রীগুরু-বর্গ অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু শরণাপত্তিমূলা শ্রদ্ধার সহিত ভজনানুকূল কৃষ্ণ-বসতিকেই একমাত্র "বসতি" বলিয়া পরম যত্নের সহিত বরণ এবং শ্রীগৌর-প্রেমিক ভক্তের সহিত শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত তীর্থসমূহ-বিচরণরূপ পাদসেবনাখ্য ভক্তিযাজনই জীবের একমাত্র কাম্য বলিয়া জানাইয়াছেন।

শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় গাহিয়াছেন,—

"তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দ চরণ।
দৃঢ়-বিশ্বাস হৃদে ধরি', মদ-মাৎসর্য্য পরিহরি',
সদা কর অনন্য-ভজন॥
কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ করি', কৃষ্ণভক্ত অঙ্গ হেরি',
শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণ কীর্ত্তন।
অর্চ্চন, বন্দন, ধ্যান, নবভক্তি মহা-জ্ঞান,
এই ভক্তি পরম কারণ॥"

ইহা হইতেও জানা যায় যে, কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বা মহতের সঙ্গই তীর্থ-বাসের প্রকৃষ্ট ফল। কারণ, তাঁহারা নিজ অন্তঃস্থিত শ্রীভগবানের পবিত্রতা-বলে পাপিগণের পাপ-মলিন তীর্থ-সমূহকেও পবিত্র করেন। বিষ্ণুপাদোদ্ভবা শ্রীগঙ্গাও শ্রীহরিদাসের মজ্জন আকাঙ্খা করেন। পতিতপাবন মহাভাগবতের দর্শন-মাত্র পতিত

জীব পবিত্র হইতে পারেন, কিন্তু গঙ্গার স্পর্শ লাভের পর পবিত্রতা ঘটে। তীর্থাদি দীর্ঘকালে জীবকে পবিত্র করিতে পারে, কিন্তু মহতের দর্শন-মাত্রেই জীবের মঙ্গল হয়।

শ্রীশ্রীল জীব গোস্বামি-প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীপাদ-সেবনাখ্য ভক্তির প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"পাদসেবায়াং শ্রীমূর্ত্তিদর্শনস্পর্শপরিক্রমানুব্রজনভগবন্মন্দিরগঙ্গা-পুরুষোত্তম-দ্বারকা-মথুরাদি-তদীয়-তীর্থ-স্নান-গমনাদয়ো-হপ্যন্তর্ভাব্যা স্তৎপরিকর প্রায়ত্বাৎ। যাবজ্জীবং তন্মন্দিরাদি-নিবাসস্তু শরণা-পত্তাবন্তর্ভবতি। গঙ্গাদীনাং তৎস্থপ্রাণি বৃন্দানাঞ্চ পরমভাগবত-ত্বমেবেতি পক্ষে তু তৎসেবাদিকং মহৎসেবাদাবেব পর্য্যবস্যতি; ততো গঙ্গাদিষ্বপি ভক্তিনিদানত্বং ভবেৎ।"

"শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবনাৎ॥"

(শ্রীভাঃ ১।২।১৬)

ব্রাহ্মে পুরুষোত্তমমুদ্দিশ্য—

"অহো ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং সমন্তাদ্দশযোজনম্।
দিবিষ্ঠা যত্র পশ্যন্তি সর্ব্বানেব চতুর্ভুজান্॥"

স্কান্দে—

"সংবৎসরং বা ষন্মাসান্মাসং মাসার্দ্ধমেব বা।
দ্বারকাবাসিনঃ সর্ব্বে নরনার্য্যশ্চতুর্ভুজাঃ॥"

পাদ্ম-পাতালখণ্ডে—

"অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী।
দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে॥"

আদিবারাহে তামুদ্দিশ্য,—"জন্মভূমিঃ প্রিয়া মম" ইতি। এষু চ স্বোপাসনাস্থানমধিকং সেব্যম্। শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ণ-ভগবত্ত্বাৎ তৎস্থানন্তু সর্ব্বেষামেব পূর্ণপুরুষার্থদং ভবেৎ। অতএবাদিবারাহে—

"মথুরাঞ্চ পরিত্যজ্য যোঽন্যত্র কুরুতে রতিম্।
মূঢ়ো ভ্রমতি সংসারে মোহিতো মম মায়য়া॥ ইতি।"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৮৩ অনুচ্ছেদ)

শ্রীমূর্ত্তি দর্শন, তৎস্পর্শ, তৎপরিক্রম, তদনুগমন, শ্রীভগবন্মন্দির' শ্রীগঙ্গা, শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীদ্বারকা, শ্রীমথুরা প্রভৃতি তদীয় তীর্থে গমন, স্নান প্রভৃতি প্রায়শঃ তৎপরিকরস্বরূপ বলিয়া এই পাদ-সেবারই অন্তর্গত জানিতে হইবে। যাবজ্জীবন তদীয় মন্দিরাদিতে বাস শরণাপত্তিরই অন্তর্গত। গঙ্গা প্রভৃতি ও তত্রত্য প্রাণি-সমূহ পরম-ভাগবত বলিয়া পক্ষান্তরে তাঁহাদের সেবা প্রভৃতি মহৎসেবা-দিতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। অতএব গঙ্গাদির তীরে বাসও ভক্তির কারণ হইয়া থাকে। এইজন্যই—"হে বিপ্রগণ! শ্রবণা-ভিলাষী শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির মহৎ-সেবা ও পুণ্য-তীর্থ-সেবাহেতু ভগবান্ শ্রীহরির কথা-বিষয়ে রুচি জন্মিয়া থাকে।"

শ্রীব্রহ্মপুরাণে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—"এই পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে দশযোজন-পর্য্যন্ত অদ্ভুত মাহাত্ম্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। দেবতাগণ তন্মধ্যস্থিত প্রাণিমাত্রকেই চতুর্ভুজ-রূপে দর্শন করিয়া থাকেন।" শ্রীস্কন্দপুরাণে—"সংবৎসর, ষন্মাস, একমাস বা একপক্ষও দ্বারকা বাস করিলে নরনারী সকলেই চতুর্ভুজ হইয়া থাকেন।" শ্রীপদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডে—"অহো এই মথুরা অতি ধন্যা এবং বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠস্বরূপা, যেহেতু এস্থানে

একদিন মাত্র বাস করিলেই শ্রীহরিভক্তি-লাভ হইয়া থাকে।” শ্রীআদিবারাহেও শ্রীমথুরা-সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—“জন্মভূমি (অর্থাৎ মথুরা) আমার প্রিয়া হইয়া থাকে।” ইহাদের মধ্যেও নিজের উপাসনা-ক্ষেত্র অধিক সেব্য হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবৎস্বরূপ বলিয়া তদীয় ক্ষেত্র সকলেরই পূর্ণপুরুষার্থপ্রদ হয়।

অতএব শ্রীআদিবারাহে,—“যে ব্যক্তি শ্রীমথুরা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র আসক্তি করে, উক্ত মূঢ় আমার মায়ায় মোহিত হইয়া সংসার-ভ্রমণশীল হয়।”

শ্রীকৃষ্ণতীর্থাদিতে মহতের দর্শন-সঙ্ঘটনই যে প্রকৃষ্ট তীর্থফল, তাহার পরিচয় আমরা শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ‘আত্মচরিতে’র বিবরণেও পাই। তিনি তাঁহার সদোপাস্য বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী ঠাকুরের প্রথম দর্শন (১২৮৮ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ মাসে) শ্রীবৃন্দাবনে লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তমেও তিনি কিরূপভাবে শ্রীকৃষ্ণানুশীলন ও মহতের সঙ্গ করিতেন, তাহাও তাঁহার আত্মচরিতের নিম্নলিখিত অংশ হইতে পাঠকগণ অবগত হইতে পারিবেন।

“টোটা-গোপীনাথের মন্দির হইতে হরিদাস ঠাকুরের সমাধিবাটী যাইতে পথে সাতাসন-ভজনকুটী। সেইখানে নিরপেক্ষ বাবাজীগণ অনুক্ষণ ভজন করিতেন। স্বরূপদাস বাবাজী সেইখানে ভজন করিতেন। মহাত্মা স্বরূপদাস বাবাজী একজন অপূর্ব্ব বৈষ্ণব। তিনি সমস্ত দিবসই কুটীরের ভিতর ভজন করিতেন। সন্ধ্যাকালে

প্রাঙ্গণে আসিয়া তুলসী প্রণাম দণ্ডবৎ করিয়া নামগান করিতে করিতে নাচিতেন ও কাঁদিতেন। ঐ সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বৈষ্ণবগণ যাইতেন। কেহ কেহ এক মুষ্টি মহাপ্রসাদ তাঁহাকে সেই সময় দিতেন। তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি পর্য্যন্ত তিনি তাহা স্বীকার করিতেন, অধিক লইতেন না। কেহ কেহ সেই সময় শ্রীচৈতন্যভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন। বাবাজী মহাশয় আবার ১০টা রাত্রে নিজের কুটীরে যাইয়া ভজন করিতেন। অন্ধকার থাকিতে থাকিতে সমুদ্রতীরে গিয়া হাত মুখ ধোয়া ও স্নান করা সমাপ্ত করিতেন। কোন বৈষ্ণব পাছে তাঁহার কোন কার্য্য করেন, সেই আশঙ্কায় একক সব কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু অন্ধ; কেমন করিয়া রাত্রি থাকিতে সমুদ্রে দৈহিক স্নানাদি করিতেন, তাহা মহাপ্রভুই জানেন। তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার বিষয়-চিন্তা মাত্রই ছিল না। আমি সন্ধ্যার পর কোন কোন দিন তাঁহার চরণ দর্শন করিতে যাইতাম। বড় মিষ্টবাক্যে তিনি আগন্তুক লোকের সহিত কথোপকথন করিতেন। আমাকে এই উপদেশ করিয়াছিলেন,—'তুমি কৃষ্ণনাম ভুলিবে না'।

পুরীতে * * * আমরা প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় শ্রীমন্দিরে দর্শন, নাম-কীর্ত্তন, শ্রবণ ও সাধুসঙ্গের জন্য যাইতাম।"

শ্রীধাম-ভ্রমণ শ্রীধাম-দর্শন, শ্রীধামে-বাস, শ্রীধামোৎপন্ন-দ্রব্য-সেবন, শ্রীধামবাসি-জনে প্রীতি—এই সকলই শুদ্ধভক্তির অনুকূল ও প্রেমলতিকার মূল-স্বরূপ। বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ,

শ্রীশ্রীল জগন্নাথ হইতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পুরীগোস্বামী মহারাজ পর্য্যন্ত সকলেই শ্রীধামে নিত্য-বসতি স্থাপন করিয়াছেন। সকলেরই শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্যে, শ্রীধাম-বাসিজনে ও শ্রীধাম-সেবায় অতুলনীয়া প্রীতি। তাঁহারা সর্ব্ব-জীবকে শ্রীধাম-প্রীতিতে আকর্ষণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী মহারাজের শ্রীগৌরধাম-নির্দ্দেশ, শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সর্ব্বতোভাবে শ্রীগৌরধাম-প্রকাশ ও প্রচার, শ্রীধামে শ্রীনামহট্টের কেন্দ্র-স্থাপন, শ্রীধাম-পরিক্রমা-প্রবর্ত্তন, শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্য ও শ্রীধামরজের পাত্র-ব্যবহার-লীলা, শ্রীধামবাসিজনে শ্বপচাদিবুদ্ধি না করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে শ্রীভগবৎ-প্রসাদ-যাচ্ঞা-লীলা, শ্রীধামের রজঃ লাভ করিবার জন্য—অতিমর্ত্ত্য-দৈন্য-ভরে শ্রীধামে নীচযোনি-লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা-লীলা, শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীধামাশ্রয়-পূর্ব্বক শত-কোটি-নামযজ্ঞের অনুশীলন-লীলা, পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীধামের মহিমা-প্রচার ও সর্ব্বতোভাবে শ্রীধামের ঔজ্জ্বল্য-বিধান, ধামাপরাধ-বিষয়ে জীবকুলকে সতর্কীকরণ এবং শ্রীশ্রীল পুরীগোস্বামী ঠাকুরের সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে শ্রীধামাশ্রয়-পূর্ব্বক নিরন্তর ভজনের সর্ব্বোত্তমাদর্শ আমাদের শ্রীগুরুবর্গ যে একান্ত নিত্যসিদ্ধ শ্রীধামসেবা-শিক্ষক, তাহাই উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিতেছে।

শ্রীশ্রীলঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'স্বনিয়মদ্বাদশকে' লিখিয়াছেন,—

"কুটীরেঽপি ক্ষুদ্রে ব্রজভজনযোগ্যে তরুতলে
শচীসূনোস্তীর্থে ভবতু নিতরাং মে নিবসতিঃ।
ন চান্যত্র ক্ষেত্রে বিবুধগণসেব্যে পুলকিতো
বসামি প্রাসাদে বিপুলধনরাজ্যান্বিত ইহ ॥"

শ্রীগৌরতীর্থে (শ্রীনবদ্বীপাদি ধামে) বৃক্ষতলে শ্রীব্রজভজনের উপযোগী ক্ষুদ্র কুটীরেও আমার একান্ত বসতি হউক্। কিন্তু এই পৃথিবীতে মুনিগণের বা দেবগণেরও সেবনীয় (বাসযোগ্য) বিপুল ধন-রাজ্য-সমন্বিত অন্য দেশে, দেব-মন্দির বা রাজপুরীতেও (আমি) বাস করিব না।

শ্রীধাম-বাস প্রত্যেক ভজনোন্নতিকামী ব্যক্তিরই যত্নের সহিত বরণ করা কর্ত্তব্য ; কিন্তু শ্রীহরিকথা-প্রচার বা শ্রীনামহট্টের সেবার জন্য যদি কাহাকেও শ্রীকৃষ্ণতীর্থ ব্যতীত অন্য স্থানে অস্থায়িভাবে বাস কিংবা শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আজ্ঞানুসারে কোনরূপ সেবা-কার্য্যে রত থাকিতে হয়, তাহা হইলে কি পাণ্ডব-বর্জ্জিত-স্থানে বা শ্রীধাম ব্যতীত অন্য স্থানে অবস্থান-হেতু তাহা ভক্তি-প্রতিকূল-কার্য্য হইবে বা তদ্দ্বারা ভক্তির উন্নতির পক্ষে বিঘ্নকর হইবে ? কেহ কেহ মনে করেন, "ডুর্জ্জয়লিঙ্গ, মুম্বাই, লাহোর, রাজপুতনা, পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল, অথবা রেঙ্গুন, কিংবা লণ্ডন প্রভৃতি স্থানে যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু গমন করেন নাই, সেই সকল স্থানে শ্রীগৌরহরি তাঁহার নিজ-জনগণের দ্বারা শ্রীনাম ও শ্রীঅর্চ্চারূপে অবতীর্ণ হইলেও সেই সকল স্থানে কেহ সেবার্থ অবস্থানে করিলে তাঁহার কোনই ভজনোন্নতি হইবে না! যদিও

শ্রীগুরুবর্গ তত্তৎস্থানে সেবার্থ অবস্থান বা হরিকথা-কীর্ত্তনাদি করিবার জন্য প্রেরণ করেন, তথাপি শ্রীগুরুবর্গের ঐরূপ কার্য্যকে **'বঞ্চনা'** বলিয়াই জানিতে হইবে! শ্রীগুরুবর্গ তাঁহাদের একান্ত প্রিয়জন ও যে যে শিষ্যের প্রকৃত মঙ্গল আকাঙ্খা করেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা শ্রীভগবানের লীলা-স্থানেই রাখেন ও সেই সকল স্থানেই প্রেরণ করেন। কিন্তু যাঁহাদিগকে 'দণ্ড' প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকেই ত্বর্জ্জয়লিঙ্গ, রেঙ্গুন, মেদিনীপুর, চিরুলিয়া, অমর্ষি, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি পাণ্ডব-বর্জ্জিত স্থানে প্রেরণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কোন-না-কোনরূপে নিশ্চয়ই শ্রীগুরুবর্গের চরণে অপরাধী!" বোম্বাই ম্লেচ্ছদেশ, লণ্ডনের দ্বিতীয় সংস্করণ এবং নাস্তিক অগ্নি-উপাসকগণের দ্বারা অধ্যুষিত, তদপেক্ষা ত্বর্জ্জয়লিঙ্গ, যে-স্থানে শ্রীতুলসীদেবী পর্য্যন্ত প্রকট থাকেন না, সেই স্থান অধিক নিন্দনীয়। রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থান বৌদ্ধ, ম্লেচ্ছ প্রভৃতির দ্বারা অধ্যুষিত অপবিত্র স্থান।

যাঁহারা শ্রীধাম-বাসের প্রতি অনুরাগী হইয়া ঐসকল স্থানে শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গের সেবার্থও যাইতে অনিচ্ছুক, শ্রীগুরুবর্গ যদি তাঁহাদিগকে শ্রীশ্রীগৌর ও শ্রীশ্রীগৌর-জনের লীলা-ভূমি শ্রীনবদ্বীপান্তর্গত শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ বা শ্রীঋতুদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীচম্পহট্টে গিয়া বাস করিতে বলেন, কিংবা শ্রীমধ্যদ্বীপের অন্তর্গত রাউতারা যাইবার আদেশ করেন, তখন তাঁহাদের শ্রীধাম বাসের প্রকৃত ইচ্ছার অগ্নিপরীক্ষা হয়।

বিবিক্ত-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীধাম-বাস আর শ্রীনামহট্টের

সহিত সংযুক্ত বা সঙ্ঘের অন্তর্গতরূপে আপনাকে স্থাপন করিয়া শ্রীধাম-বাসের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। যে-সকল পূর্ব্ব মহাজনের শ্রীধাম-বাসের উদাহরণ দৃষ্ট হয়, তাঁহারা ন্যূনাধিক সকলেই বিবিক্ত বিচারের সহিত শ্রীধাম-বাস করিয়াছেন ; কেহ বা বৈষ্ণব-গৃহস্থরূপে শ্রীধাম-বাস করিয়াছেন। পরম করুণাময় শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ কলির দুর্ব্বলতম দুর্গত জীবের জন্য যে সঙ্ঘের প্রণালী শ্রীনামহট্টের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই তাঁহার এক-অপূর্ব্ব-সৃষ্টি এবং ইহা বর্ত্তমান স্থান, কাল ও পাত্রোপ-যোগী। শ্রীব্রজমণ্ডলবাসী শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীরঘুনাথদ্বয়, শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীজীবপ্রভু, শ্রীলোকনাথাদি গোস্বামিবর্গ, কিংবা শ্রীগৌড়মণ্ডলবাসী শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীদ্বিজ-বাণীনাথ, শ্রীমহেশ পণ্ডিত, শ্রীভাগবতাচার্য্য-প্রভু, অথবা শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীস্বরূপ-দামোদর, শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত, শ্রীপরমানন্দ পুরী, ব্রহ্মচারী শ্রীকাশীশ্বর প্রভৃতি যে-ভাবে শ্রীধাম-বাস করিতেন, সেইভাবে শ্রীধাম-বাসের অনুকরণ করিলে সম্পূর্ণ দেহাত্মবোধ-বিবর্জ্জিত হওয়া আবশ্যক। স্বা—র মত সকল সময় বিবিক্তানন্দী শ্রীধামবাসী (?) থাকিব, আর প্রসাদ-সেবা ও প্রাসাদ-বাসের সুযোগ গ্রহণ করিবার কালে কিংবা পরিচর্য্যাদি গ্রহণের সময় 'গোষ্ঠ্যানন্দী' সাজিব বা অপেক্ষাযুক্ত হইব, ইহা বিবিক্তানন্দীর চিত্তবৃত্তি নহে। বিবিক্তানন্দী অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বতোভাবে নিরপেক্ষ। শ্রীব্রজমণ্ডলের বনে নির্জ্জনবাসের অভিনয়কারী, 'ঝঞ্ঝাটে'র ভয়ে সঙ্ঘ-পরিত্যাগকারী ভ—, নি—

প্রভৃতি পরস্পর বনে বসিয়া গলা-কাটাকাটি করিতে উদ্যত হইয়াছে! যখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তোমরা সঙ্ঘ হইতে দূরে আছ কেন? তখন তাহারা উত্তরে বলিয়াছিল, সম্প্রদায়ে বা সংঙ্ঘে থাকিলে নানাপ্রকার বিষয়-কার্য্যের হাঙ্গামা আছে, এইজন্য আমরা শ্রীকৃষ্ণতীর্থে বাস করিয়া নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণানুশীলন করিবার চেষ্টা করিতেছি। এখন দেখা যাইতেছে, বনের মধ্যে কাহারও কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা বিষয়-বৈভব না থাকিলেও এমন কি, চূলা-চৌকার বালাই, অর্চ্চনাদির বালাই, প্রচারাদির বালাই—কিছুই না থাকিলেও পরস্পরের মধ্যে গলা-কাটাকাটি করিবার উদ্যোগ চলিতেছে! ইহারই নাম কি ধাম-বাস? ইহারই নাম কি ময়মনসিংহ ও ঢাকারূপ পাণ্ডব-বর্জ্জিত স্থান ও সঙ্ঘের বৈষয়িক সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া এক লম্ফে শ্রীধাম-শিরোমণি শ্রীমথুরামণ্ডলে আসিয়া তথায় বাস ও নিরন্তর ভজন-চেষ্টা?

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীনবদ্বীপস্থ কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তিপীঠ শ্রীগোদ্রুমকে কেন্দ্র করিয়া স্থান-নির্ব্বিশেষে অন্ততঃ বৈষ্ণববৃন্দের বসতি-স্থলে শ্রীনামহট্টের বিভিন্ন কেন্দ্র, 'শ্রদ্ধা-কুটীর,' 'বৈষ্ণব-চতুষ্পাঠী.' 'প্রপন্নাশ্রম' প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার 'শ্রীশ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী'র ৪র্থ ক্রমে লিখিয়াছেন,—"আমাদের নাম-প্রচারকগণ নিঃস্বার্থে প্রভুর নিশান ধরিয়া গ্রামে-গ্রামে শ্রীমদ্‌গোদ্রুমচন্দ্রের আজ্ঞা প্রচার করিতেছেন। এই প্রকার ধর্ম্ম-প্রচার দ্বারা অতি স্বল্প দিনের মধ্যেই কেবল ভারতভূমিতে নয়,

পরন্তু সমস্ত ভূমণ্ডলে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের খোল বাজিয়া উঠিবে এবং শুদ্ধা হরিভক্তি কি ব্রাহ্মণ, কি ম্লেচ্ছ, সকলেই লাভ করিবে।”

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ কৃপা-পূর্ব্বক বহু পাণ্ডব-বর্জ্জিত-স্থানে স্বয়ং বিচরণ করিয়া ও ব্রাজক-বিপণি-মহোদয়গণের দ্বারা শ্রীহরি-কথা প্রচার করিয়াছেন। ত্রিপুরা-রাজ্য, দার্জ্জিলিং, ময়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি স্থানেও লোকোদ্ধারের জন্য শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ বিভিন্ন সভা-সমিতিতে স্বয়ং শ্রীহরিকীর্ত্তন করিয়াছেন, ইহা শ্রীশ্রীল ঠাকুরের আত্মচরিতে ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রদত্ত ‘শ্রীসরস্বতীজয়শ্রী’র ‘শ্রী’-পর্ব্বের বিবরণে আমরা দেখিতে পাই। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং তুর্জ্জয়লিঙ্গে, সিম্‌লাশৈলে, শিলংশৈলে, উতকামণ্ডে ও বহু পাণ্ডব-বর্জ্জিত প্রদেশে একাধিকবার গমন করিয়া স্বয়ং শ্রীহরিভজন ও শ্রীহরিকীর্ত্তন প্রচার করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল আচার্যদেব শ্রীগুরুপাদপদ্মের দ্বারা প্রেরিত হইয়া অসংখ্য পাণ্ডব-বর্জ্জিত স্থানে গমন-পূর্ব্বক শ্রীহরিভজন ও শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বাণী প্রচার, এমন কি, রেঙ্গুনে শ্রীবিগ্রহ প্রকট করিয়াছেন।

তবে যে শ্রীশ্রীগুরুবর্গ শ্রীভগবৎসম্বন্ধবিহীন স্থানে বসতিকে এত নির্ম্মমভাবে গর্হণ করেন, তাহার কারণ কি?

শ্রীশ্রীগুরুবর্গের সেবার্থ যাঁহারা সাময়িকভাবে শ্রীলীলা-স্থান ব্যতীত অন্যত্র বাস করেন, তাঁহাদের বাসের সহিত তৎস্থানের অধিবাসিরূপে যাঁহারা জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত নোঙ্গর পুঁতিয়া রাখিয়া ‘জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী’ বা ‘এই দেশে জন্ম, যেন এই দেশেতে মরি’ বিচারে, কিংবা জড়সম্পর্কিত বস্তুর সঙ্গ-

লালসায়, বহির্ম্মুখ সংসার বা কুটুম্ব-ভরণ-পোষণাদির জন্য সেই সকল স্থানে বাস করেন, তাঁহাদের নোঙ্গর উঠাইবার জন্যই পরদুঃখদুঃখী অহৈতুক করুণাসিন্ধু গুরুবর্গ ইতরস্থানের ঐরূপ নিন্দা করেন। যাঁহারা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রাণধন শ্রীঅর্চ্চাবতার শ্রীশালগ্রাম, শ্রীতুলসী যুক্ত শ্রীভক্ত-সঙ্ঘারামে বাস করেন, তাঁহারা ত' ভগবন্নিকেতনে, নির্গুণ স্থানেই, শ্রীহরির নিত্য-সন্নিহিত-স্থানেই বাস করিতেছেন। তাঁহারা বিক্রীত পশুবৎ শরণাগত। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ তাঁহাদিগকে যে-স্থানেই প্রেরণ করুন না কেন, তাঁহারা সেই স্থানেই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী কীর্ত্তনমুখে তাঁহাদের নিত্যলীলার স্থান, কাল ও পাত্রের সঙ্গ লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণতীর্থে বাস করিয়া "অভীষ্ট স্থান" না হয় পাওয়া গেল, কিন্তু তথায় যদি "**সঙ্গ**" না পাওয়া যায়, তবে ভক্ত্যাভাস ব্যতীত আর কি অধিক হইবে? শ্রীব্রজমণ্ডলবাসী মর্কট, শ্রীযমুনাতটবাসী কমঠ, শ্রীমথুরাবাসী পাষণ্ডি-হিন্দুগণ লীলা-স্থানে বাস করিবার অভিনয় করিতেছে। অজ্ঞ হইলে ইঁহাদের ভক্তির আভাস হইবে। 'ছায়া আভাসে'র দ্বারা মহতের সঙ্গক্রমে মঙ্গল হইতে পারে, কিন্তু 'প্রতিবিম্ব আভাস' হইলে সেই মঙ্গলটিও হইবে না। এইজন্য আমাদের শ্রীগুরুবর্গ বলিয়াছেন—"কৃষ্ণ ও তদীয় নিজ-জন-নির্ব্বাচিত প্রেষ্ঠজনকে সর্ব্বদা স্মরণ-পূর্ব্বক সেই সেই **কথায় রত হইয়া সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবেন; শরীরে ব্রজবাস করিতে অক্ষম হইলে মনে মনেও ব্রজবাস করিবেন।**" (শ্রীঅমৃতপ্রবাহভাষ্য—শ্রীচৈঃ চঃ ম ২২।১৫৬)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবার চিন্তায় আবিষ্টতাই "মনে মনে শ্রীধাম-বাস"। সেবার চিন্তায় অভিনিবিষ্ট না থাকিলে শ্রীধাম-বাসের ছলনা করিয়া ধামাপরাধ ও ধামভোগ হইয়া যায়। ক'এক টাকার টিকেট কাটিয়া, বাষ্পীয় যানে আরোহণ করিয়া সশরীরে উপস্থিত হইতে পারিলেই যদি শ্রীনবদ্বীপধাম, শ্রীপুরুষোত্তম ধাম বা শ্রীব্রজধামে বাস ও পাদসেবনাখ্য ভক্তিযাজন করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে ভক্তি প্রাকৃত-বস্তু-সাধ্য হইয়া পড়িত। বস্তুতঃ চর্ম্মচক্ষে শ্রীধাম-দর্শন ও সমল-চিত্তে শ্রীধাম-বাস হয় না।

"সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল—ব্রজলোকধাম।
শ্রীগোলোক, শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন-নাম॥
সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু, কৃষ্ণতনুসম।
উপর্য্যধো ব্যাপিয়াছে, নাহিক নিয়ম॥
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তাঁর কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তাঁর, নাহি দুই কায়॥
চিন্তামণি-ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তাঁরে প্রপঞ্চের সম॥
প্রেমনেত্রে দেখে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ।
গোপ-গোপীসঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৫।১৭-২১)

শ্রীশ্রীল ঠাকুর মহাশয় 'প্রার্থনা'য় গাহিয়াছেন,—

"আর কবে নিতাই চাঁদের করুণা হইবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥

বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥"

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রকৃত শ্রীধাম-বাস ও শ্রীধাম-বাসের অভিনয়ের মধ্যে পার্থক্য সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-সহকারে এইরূপ জ্ঞাপন করিয়াছেন,—

"শুন জীব, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ ধাম।
অজস্র আনন্দময় জীবের বিশ্রাম ॥
শুদ্ধ জীবগণ জড়া' প্রকৃতির পার।
সদা বাস করে হেথা কৃষ্ণ-পরিবার ॥
এই ধাম নিত্যধাম বিশুদ্ধ চিন্ময়।
জড়দেশ-কাল হেথা পায় পরাজয় ॥
এ ধামের দেশ-কাল চিদানন্দময়।
জড়ধর্ম্ম-বিপর্য্যয় সদা লক্ষ্য হয় ॥

* * *

সেইত আনন্দধাম প্রকৃতির পার।
অচিন্ত্য কৃষ্ণের শক্তি পরম উদার ॥
সেই শক্তিক্রমে ধাম হেথা অবতার।
জীবের নিস্তার জন্য কৃষ্ণ-ইচ্ছা সার ॥
ধাম-মধ্যে কভু নহে জড় অবস্থিতি।
জড়বদ্ধ-জীব নাহি পায় হেথা গতি ॥
ধামের উপরে জড় মায়া পাতি' জাল।
আচ্ছাদিয়া রাখে এই ধাম চিরকাল ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যার নাহিক সম্বন্ধ।
জালের উপরে বাস করে সেই অন্ধ ॥
মনে ভাবে, 'আমি আছি নবদ্বীপে-পুরে'
প্রৌঢ় মায়া মুগ্ধ করি' রাখে তারে দূরে ॥
যদি কোন ভাগ্যোদয়ে সাধুসঙ্গ পায়।
তবে কৃষ্ণচৈতন্য-সম্বন্ধ আসে তায় ॥
মুখে বলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু মোর।
হৃদয়-সম্বন্ধহীন সদা মায়া-ভোর ॥
সেই সব লোক বৈসে মায়াজালোপরি।
কভু শুদ্ধভক্তি নাহি পায় হরি হরি ॥
ধর্ম্মধ্বজী, সুকপটী, সদা দৈন্যহীন।
দম্ভগুণে আপনাকে ভাবে সমীচীন ॥
সেই দম্ভ ছাড়ে সাধুচরণ-প্রসাদে।
তৃণ হৈতে আপনাকে 'দীন' করি সাধে ॥
বৃক্ষাপেক্ষা হয় তার সহিষ্ণুতা গুণ।
অমানী আপনি, অন্যে সম্মানে নিপুণ ॥
এই চারি গুণে গুণী কৃষ্ণ-গুণ গায়।
চৈতন্য-সম্বন্ধ তাঁ'র বসেন হিয়ায় ॥"

কোলদ্বীপ-বাসের অভিনয়কারী অনেক পাষণ্ডি-হিন্দুকে গঙ্গা-স্নানে গমনকালে শ্রীকোলদ্বীপের গঙ্গাতট-নিবাসী পরমহংসকুল-মুকুটমৌলী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের প্রতি অনেক মৎসরতা-ব্যঞ্জক উক্তি করিতে শুনা যায়। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-

প্রভু, শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীমুরারি গুপ্ত প্রভৃতি যখন শ্রীনবদ্বীপে বাস করিতেন, সেই সময় বহু নবদ্বীপবাসী, এমন কি, কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং শ্রীগৌরহরি অবতার-লীলা প্রকট করিয়া শ্রীনবদ্বীপে ভুবনমঙ্গল শ্রীনামকীর্ত্তন প্রচার আরম্ভ করিলে নবদ্বীপ-বাসী পাষণ্ডী-হিন্দুগণ কিরূপভাবে ভক্ত ও ভগবানের নিন্দা করিত, তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠকগণের অবিদিত নাই। ইহারা বাহ্য-দৃষ্টিতে শ্রীগঙ্গার তীরে বা শ্রীধামে বাসের অভিনয় করিলেও কি শ্রীধামবাসী? শ্রীধামবাসীর মুখে কি বৈষ্ণব নিন্দা, হৃদয়ে গুর্ব্বপরাধ, দাম্ভিকতা, কাপট্য, ধর্ম্মধ্বজিত্ব প্রভৃতি থাকে? দুর্জ্জয়লিঙ্গে শীতাধিক্যে শ্রীতুলসীদেবী প্রকট থাকেন না, আবার শ্রীব্রজমণ্ডলে মর্কটকুলের অত্যাচারে নানাভাবে সুরক্ষিত করিবার চেষ্টা করিলেও অধিকাংশ-স্থলেই শ্রীতুলসীদেবীকে রক্ষা করা যায় না। গৃহস্থ আহার্য্য না দিলে বানরগণ তুলসীপত্র ছিঁড়িয়া তাহা ভক্ষণ করে, কখনও বা অমনি তাহা নষ্ট করে! মর্কটের অত্যাচারে শ্রীবিগ্রহ-সেবার উপকরণ পুষ্পাদি রক্ষা করাও শ্রীব্রজমণ্ডলে খুবই কষ্টকর।

লোকশিক্ষক-শ্রীল শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে লক্ষ্য করিয়া সাধারণ সাধকগণকে এইরূপ সতর্ক করিয়াছেন,—

“মথুরা গেলে সনাতন-সঙ্গেই রহিবা।
মথুরার স্বামী সবের চরণ বন্দিবা॥
দূরে রহি' ভক্তি করিহ সঙ্গে না রহিবা।
তাঁ-সবার আচার-চেষ্টা লইতে নারিবা॥

সনাতন-সঙ্গে করিহ বন দরশন।
সনাতনের সঙ্গ না ছাড়িবা এক ক্ষণ ॥
শীঘ্র আসিহ, তাহাঁ না রহিহ চিরকাল।
গোবর্দ্ধনে না চড়িহ দেখিতে 'গোপাল' ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৩।৩৬-৩৯)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইহার অমৃত প্রবাহ-ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ বাৎসল্যভাবে মথুরাবাসী চৌবেগণ যে-সকল আচার করিয়া থাকেন, তাহা—স্মার্ত্তমতের বিরুদ্ধ; ইহা দেখিয়া (ঐশ্বর্য্যভাবরত) তোমার মনে অশ্রদ্ধা হইতে পারে। কিন্তু ব্রজমণ্ডলবাসীর প্রতি এইরূপ অশ্রদ্ধা না হওয়াই আবশ্যক; কেন-না, তাঁহাদের ভক্তি রাগাত্মিকা। অতএব (তোমার ন্যায় ঐশ্বর্য্যভাবপ্রিয় ভক্ত রাগমার্গীয় তাঁহাদের সঙ্গে না থাকিয়া) দূরে থাকিয়াই তাঁহাদের প্রতি ভক্তি করিবে।

অধিক দিন ব্রজে রহিলে ব্রজবাসিগণের দোষাদি দর্শন করিয়া শ্রদ্ধা লঘু হয়। অতএব যাঁহারা রাগমার্গ প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদের ব্রজে বাস করা উচিত নয়, ব্রজদর্শন-পূর্ব্বক শীঘ্র চলিয়া আসাই ভাল। শ্রীগোপাল-দর্শনের জন্য গোবর্দ্ধনে চড়িবে না; যেহেতু গোবর্দ্ধন – সাক্ষাদ্‌-ভগবন্মূর্ত্তি; তাঁহার উপর চড়া ভাল নয়। গোপাল যখন অন্যাশ্রমে যান, সে-সময় দর্শন করাই ভাল।"

অতএব শ্রীমথুরাবাস বা শ্রীকৃষ্ণতীর্থে গমন ভক্তির অঙ্গ হইলেও তথায় সম্বন্ধতত্ত্বাচার্য্য শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর সঙ্গে অর্থাৎ মহাভাগবতবর শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গে বা

একান্ত আনুগত্যে বাস বা ভ্রমণই প্রকৃত শ্রীধাম-বাস বা শ্রীধাম-সেবা। এইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ—"সনাতনের সঙ্গ না ছাড়িবা এক ক্ষণ।" সম্বন্ধতত্ত্বজ্ঞানাচার্য্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গ ক্ষণমাত্র ত্যাগ করিলে স্বতন্ত্রতাবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া জীব মায়ার দাস হইয়া পড়ে। তখন মায়ামুগ্ধ জীব "শ্রীধাম-বাস করিতেছি" মনে করিলেও শ্রীধাম হইতে বহু দূরে অবস্থান করে।

বদ্ধজীবের পক্ষে অধিক-কাল সিদ্ধগণের স্থান শ্রীমথুরায় বাস কর্ত্তব্য নহে। এইজন্য ঔদার্য্যময় শ্রীগৌরধাম অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীগৌরধামেও সাধুসঙ্গে ধামাপরাধ সযত্নে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বাস করাই কর্ত্তব্য।

যেরূপ শ্রীমথুরাদি ক্ষেত্র শ্রীভগবানের মহাধিষ্ঠান, শ্রীশালগ্রামাদিও সেইরূপ শ্রীভগবানের স্বতঃসিদ্ধ নিত্যঅধিষ্ঠান বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন। শ্রীমথুরা, শ্রীদ্বারকা, শ্রীরঙ্গনাথ এই তিন স্থানে যেরূপ ভগবান্ শ্রীহরি নিত্য সন্নিহিত আছেন, যে-স্থানে শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীতুলসী, তথায়ও সেইরূপ শ্রীহরি সন্নিহিত থাকেন। শাস্ত্রে যেরূপ—'মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ'—এইরূপ উক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ 'শালগ্রাম-শিলা যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ', 'তুলসীকাননং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ'—এই-রূপ শাস্ত্রোক্তি আছে। তুলসীসেবাকারীর সহস্র অপরাধ শ্রীপুরুষোত্তম শ্রীহরি ক্ষমা করেন। অতএব শ্রীশালগ্রাম, শ্রীতুলসী ও শ্রীধামে জড়-ভেদবুদ্ধি পরিহার করিয়া যাঁহারা শ্রীশ্রীগুরু-পাদ-পদ্মের আনুগত্যে শ্রীশ্রীহরিসেবা করেন, তাঁহারা যে-স্থানে

যে-অবস্থায়ই থাকুন, তাঁহারাই প্রকৃত শ্রীধাম-বাস করিতেছেন। "গৃহে বা বনেতে থাকে, 'হা গৌরাঙ্গ' ব'লে ডাকে, নরোত্তম মাগে তা'র সঙ্গ। যে-দিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়।" শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে লৌকিক-চক্ষে যাহা নরক, তথায় থাকিয়াও শ্রীধাম-বাস হইতে পারে আর অপ্রাকৃত ধামের মধ্যে সর্ব্বোত্তম শ্রীরাধাকুণ্ডে সশরীরে অবস্থানের অভিনয় করিয়াও নরকবাস বা ধাম-ভোগ চেষ্টা হইতে পারে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে শ্রীরাধাকুণ্ডবাসের অভিনয়কারী স্বা—, ব—, র—প্রভৃতির চিত্তবৃত্তি ও আচরণে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা তাঁহারা শ্রীধাম-বাস করিয়াছেন, অথবা বিশ্রী দেবীধামে বাস করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক সুধী ব্যক্তিই বুঝিতে পারিবেন। প্রতিষ্ঠাদি-বিষয়বিষ্ঠা সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া যাহারা শ্রীধাম-বাস বা শ্রীরাধাকুণ্ড বাসের অভিনয় করে, তাহাদিগের ঐরূপ ধাম-বাসের অভিনয় যে বিষ্ঠাকুণ্ডে বা নরককুণ্ডে বাস, তাহা সাধক-জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীশ্রীরাধা-দয়িতজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু অতি দৈন্যভরে সাধারণের পুরীষ-ত্যাগের স্থানে প্রবেশের লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা অঙ্গে লেপন ও দম্ভদৈত্যকে হৃদয়ে পোষণ করিয়া শ্রীধাম-বাস হয় না। মহতের শ্রীচরণ-রেণুতে যাঁহার মস্তক ও সর্ব্বাঙ্গ নিত্য-অভিষিক্ত, তিনিই যথার্থ শ্রীরাধাকুণ্ডে নিত্য স্নান করেন। দাম্ভিক শ্রীরাধাকুণ্ডকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক,

দর্শনই করিতে পারে না। শ্রীলীলা-শক্তিকে রাবণের চিত্তবৃত্তি কখনও দর্শন করিতে পারে না। এই জন্যই শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ বলিয়াছেন,—

"মনে ভাবে, 'আমি আছি নবদ্বীপ-পুরে'।
প্রৌঢ় মায়া মূঢ় করি' রাখে তারে দূরে ॥
ধামের উপরে জড় মায়া পাতি' জাল।
আচ্ছাদিয়া রাখে এই ধাম চিরকাল ॥"

অতএব শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত সেবকগণ শ্রীহরিসেবার্থে যে-স্থানেই থাকুন, যে-কার্য্যই করুন. একমাত্র তদ্দারাই তাঁহার ও বিশ্ববাসী জীবের প্রকৃত মঙ্গল হইবে। স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়া স্বা—র ন্যায় কি ধাম-বাসের অভিনয়, কি সর্ব্বক্ষণ নাম-ভজনের অভিনয়, কিছুতেই মঙ্গল হইবে না। শ্রীভগবানের নাম, ধাম ও কাম আনুগত্যহীন ব্যক্তির নিকট সর্ব্বদাই জড় মায়ার জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আনুগত্য লাভের জন্য কোটি কোটি জন্ম নরকবাস করিতেও শ্রীগুরুদেবতাত্মা সেবক কুণ্ঠিত হন না। শ্রীগুরুদেবতাত্মার বিচার এই,—হে প্রভো, তুমি আমাকে অনন্ত-কাল নরকেই রাখ, বা শ্রীগোলোকের সর্বোচ্চ প্রকোষ্ঠেই রাখ, তোমার সেবাই আমার একমাত্র জীবন-সর্বস্ব। আমি সম্ভোগ-বাদী হইয়া নিজের তহবিলে কিছু চাহিব না। আমার যে নবধা ভক্তি-যাজন, তাহা তোমার প্রীতিরই কার্য্য,—আমার কার্য্য

নহে। "শ্রীবিষ্ণোরেবার্পিতা তদর্থমেবেদমিতি ভাবিতা, ন তু ধর্ম্মার্থাদিষ্বর্পিতা।"

'দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো নরকে বা নরকান্তক প্রকামম্।
অবধীরিত শারদারবিন্দৌ চরণৌ তে মরণেঽপি চিন্তয়ামি॥"

(শ্রীমুকুন্দমালা স্তোত্রম, ৬)

হে নরক-নাশন! স্বর্গে, মর্ত্ত্যে অথবা নরকে আমার চিরকাল বাস হউক্, কিন্তু আমি মৃত্যুকালেও শারদীয় সরোজ-বিনিন্দি তোমার শ্রীচরণযুগল চিন্তা করিব।

—::—

দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান

শ্রীসজ্জনতোষণী ও শ্রীগৌড়ীয় পত্রে "দীক্ষা," "দীক্ষা-বিধান," "দীক্ষিত" প্রভৃতি প্রবন্ধে 'দীক্ষা'-বিষয়ক বহুবিধ আলোচনা হইয়াছে। দীক্ষাবিধান বা দীক্ষার প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। দীক্ষা-সম্বন্ধে অদীক্ষিত, ছল-দীক্ষিত, অপ-দীক্ষিত বা দীক্ষাবাধকসম্প্রদায়ে যে সকল সাধারণ ভ্রম প্রচলিত ও বহুমানিত হইয়াছে ও হইতেছে, সেই সকল ভ্রম বা বিপ্রলিপ্সা শাস্ত্রযুক্তি এবং আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত ও আচার দ্বারা নিরপেক্ষভাবে বিশ্লিষ্ট ও বিচারিত হইলে উহারা কতদূর সমীচীনতা রক্ষা করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা এবং ঐরূপ দীক্ষাবাধ-দৌরাত্ম্য অমৃতের অধিকারী জীবনিচয়কে যে কিরূপ অন্ধকারময়

মৃত্যুর পথে গড্ডালিকা-প্রবাহের ন্যায় ধাবিত করিতেছে, তাহা সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শন করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

জগতের প্রত্যেক বিষয় বা প্রত্যেক বস্তুর বিচারক দুই প্রকার। পারদর্শী, প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি কোন বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে যে বিচার করেন, তাহা হইতে অজ্ঞ, নবীন ও অনভিজ্ঞের বিচারপ্রণালী বা সিদ্ধান্ত অবশ্য স্বতন্ত্র। একজন বিচারাসনে বসিবার অধিকার প্রাপ্ত সুযোগ্য ব্যক্তি, আর একজন অনধিকারী ও অযোগ্য হইয়াও বলপূর্ব্বক বিচারকের আসন গ্রহণ করিবার প্রয়াসী। সুযোগ্য বিচারকের সিদ্ধান্ত সাধারণ-সম্প্রদায়ে 'অসাধারণ' মনে হইলেও উহাই বস্তুসম্বন্ধে বাস্তব বিচার ও সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত। আর অনুকরণকারী ব্যক্তির মত সাধারণ সম্প্রদায়ের ধারণার সহিত বেশ সামঞ্জস্য রক্ষা করিলেও উহা বস্তুবিজ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র। এই দুই প্রকার ব্যক্তির দুই প্রকার ধারণা পারিভাষিক শব্দে 'পরমার্থ' ও 'ব্যবহার,' 'দিব্য' ও 'মর্ত্ত্য', 'অপ্রাকৃত' ও 'প্রাকৃত', 'অধোক্ষজ' ও 'অক্ষজ', 'বিজ্ঞান' ও 'অজ্ঞান', 'বাস্তব সত্য' ও 'প্রাতীতিক সত্য' প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়।

'দীক্ষা' সম্বন্ধেও জগতে দুই প্রকার বিচারক দৃষ্ট হয়। 'দীক্ষা' সম্বন্ধে 'দেশিক' ও 'তত্ত্ব-কোবিদ'গণের বিচার একপ্রকার এবং তদ্বিপরীত ব্যক্তিগণের বিচার অন্য প্রকার। সাত্বতশাস্ত্রে 'দেশিক' ও 'কোবিদ'গণের বিচার লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আবার তামস ও রাজস শাস্ত্রাদিতে সাধারণ ব্যবহারিকগণের বিচার লিপিবদ্ধ আছে।

'দেশ' শব্দ গত্যর্থে ষ্ণিক্ প্রত্যয় করিয়া 'দেশিক শব্দ নিষ্পন্ন। 'দেশিক' শব্দের অর্থ পথিক (বা পথপ্রদর্শক)। মনে করুন, দুইজন ব্যক্তির মধ্যে যিনি বদরিকাশ্রমে গমন করিয়াছেন, তিনি বদরিকার পথের সংবাদ রাখেন, কোথায় কিভাবে চলিতে হয়, পথে চলিতে চলিতে যে সকল বিপথ ও বিপদাশঙ্কা আছে তদ্বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ, বদরিকার পথ কিরূপ—তাহা তিনি নিজে সেই পথে বিচরণ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। আর যে ব্যক্তি কখনও বদরিকায় যান নাই বা বদরিকার পথের পথিক হন নাই সেই ব্যক্তি কেবল অবিশ্বস্ত ব্যক্তির প্রমুখাৎ দূর হইতে বদরিকার গল্প শুনিয়াছেন মাত্র। সেইরূপ ব্যক্তি যদি বদরিকার পথের সম্বন্ধে তাঁহার সাধারণ পথের ধারণার অনুমিতি কিম্বা কল্পনা-প্রসূত ভ্রম-ধারণাকেই বদরিকাপথের প্রকৃতজ্ঞান বলিয়া প্রচার করিতে বসেন- তবে ঐরূপ অনভিজ্ঞ ব্যক্তির মত অনভিজ্ঞ সম্প্রদায়ে বিকাইলেও তদ্দ্বারা বদরিকা পথের প্রকৃত তথ্য বা অভিজ্ঞান লাভ হয় না। দেশিক ব্যক্তি অর্থাৎ পরমার্থ পথের পথিক বা পথ প্রদর্শক গুরু 'দীক্ষা' সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত প্রচার করেন, তাহাই পরমার্থ-পথে গমনেচ্ছু অপর ব্যক্তিগণের একমাত্র গ্রহণীয়; উহা ব্যবহারিক সাধারণ ব্যক্তিগণের ধারণার সহিত পৃথক্ হইলেও ঐ উপদেশ গ্রহণেই প্রকৃত পথের সন্ধান পাওয়া যায়।

'কোবিদ' শব্দের ধাত্বর্থ বিচার করিলে জানা যায় যে, 'কু'—শব্দ করা, যিনি কীর্ত্তনকারী-উপদেষ্টা, তিনি কোবিদ। অথবা 'কো' অর্থে বেদ, বিদ্ ধাতুর অর্থ জানা, যিনি শ্রোত্রিয় অর্থাৎ

শ্রৌতপন্থায় উপদেষ্টা, তিনি কোবিদ। মনের অভিরুচি অর্থাৎ মনোধর্ম্মের বশীভূত হইয়া যাহারা উপদেষ্টার অভিনয় করেন, তাহাদিগকে 'শ্রোত্রিয়' বা 'কোবিদ' বলা যাইতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—'তত্ত্ববস্তু'—'কৃষ্ণ'; যিনি নিরন্তর কৃষ্ণ-কীর্ত্তনকারী অথবা যিনি কৃষ্ণতত্ত্ব-বিষয়ে পারদর্শী, যিনি মনোধর্ম্মের দ্বারা অধোক্ষজ কৃষ্ণকে বিচার করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন না করিয়া শ্রৌতপন্থায় কৃষ্ণবিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং তাহাই অটুটভাবে জীবকুলের সেবোন্মুখ কর্ণের সমীপে কীর্ত্তন করেন, তিনি 'তত্ত্ব-কোবিদ'। সেই 'দেশিক' ও 'তত্ত্বকোবিদ'গণ 'দীক্ষা শব্দের অর্থ এইরূপ করেন—

'দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।'

অর্থাৎ যাহা হইতে দিব্য জ্ঞানের উদয় হয় এবং পাপের সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়, তাহাই দীক্ষা'।

'দিব্য' শব্দের প্রতিযোগী শব্দ মর্ত্ত্য। 'দিব্' ধাতুর অর্থ দীপ্তি পাওয়া, 'দীপ্তি' শব্দের দ্বারা 'সচেতনতা' লক্ষ্য করে। যাহা চেতন, যাহা সুন্দর, যাহা আনন্দময়, যাহা নিত্য সত্ত্বাবান্, তাহাই—দিব্য। স্বর্গাদি স্থানকে যে 'দিব্য' শব্দে উদ্দিষ্ট করা হয়, সেইরূপ উদ্দেশ গুণীভূত বা অপ্রধানীভূত অর্থাৎ স্বর্গাদি লোক মর্ত্ত্যলোকের তুলনায় 'দিব্য', কিন্তু বৈকুণ্ঠের তুলনায় নহে। মর্ত্ত্য জগতের ধারণার গতি ও পরিভাষার যতদূর দৌড়, তদনুসারে তাহা স্বর্গকেই 'দিব্য' বলিয়া অভিধান করা ব্যতীত তদপেক্ষা অন্য উৎকৃষ্ট বস্তুর প্রতি সেই আখ্যা নিযুক্ত করিতে পারে না।

তাই সাধারণ ভাষা 'দিব্য' শব্দে সাধারণ মর্ত্ত্য জগতের ধারণায় সর্ব্বোচ্চ কাম্য বস্তু ভোগনিকেতন ইন্দ্রপুরী প্রভৃতি স্থানকেই 'দিব্য' বলিয়া অভিধান করে। প্রকৃত পক্ষে সচ্চিদানন্দ বা অপ্রাকৃত বস্তুতেই 'দিব্য' শব্দের অভিধা বৃত্তির ব্যাপ্তি। অপ্রাকৃত বা দিব্যজ্ঞানের অপর নামই 'দীক্ষা'। ইহাই দেশিক ও তত্ত্ব-কোবিদগণের 'দীক্ষা' সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত।

'দিব্য' বা 'অপ্রাকৃত জ্ঞান'—এই বাক্যদ্বারা কোন্ বিষয় লক্ষ্য করে, তাহা বিচার করিলে আমরা দীক্ষার স্বরূপবিষয়ে অভিজ্ঞান লাভ করিতে পারিব।

'অপ্রাকৃত' শব্দটী সাম্বন্ধিক শব্দ (Relative term)। অপ্রাকৃত—এই শব্দ উচ্চারণ মাত্রই 'প্রাকৃত' শব্দটী সঙ্গে সঙ্গেই বিচার্য্য বিষয় হয়। কারণ যাহা 'প্রাকৃত' নহে, তাহাই 'অপ্রাকৃত' শব্দ দ্বারা উদ্দিষ্ট।

প্রাকৃত-বস্তু-সত্ত্বার মূল শক্তি প্রকৃতি। প্রকৃতি—'অব্যক্ত' শব্দ বাচ্য অর্থাৎ যাহা প্রকাশমান না হইয়া কারণ-কারণরূপে নিজ অস্মিতার অস্তিত্ব সম্পাদন করে, তাহাই 'অব্যক্ত' শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয় হয়। প্রকাশমান কোন কার্য্যের কারণ প্রকাশিত হইলে সেই প্রকাশিত কারণের কারণ জানিতে জ্ঞানবৃত্তির স্বাভাবিক কৌতূহল হয়। সসীম মানবজ্ঞান যে কালে কারণানুসন্ধান বা কারণ-নির্দ্দেশ করিতে গিয়া কারণকে প্রকাশমান দেখিতে না পান, তখন তাদৃশ কারণকে অপ্রকাশিত বা 'অব্যক্ত' প্রকৃতি সংজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকেন। প্রকৃতি হইতে জাত প্রকাশমান

দ্রব্য বা দ্রব্যসম্বন্ধীয় ভাব সমস্তই প্রাকৃত। প্রকৃতির অধীনে তিনটী গুণ প্রকাশমান আছে, উহাদিগকে রজঃ, সত্ত্ব ও তম আখ্যা দেওয়া হয়। রজোগুণের ধর্ম্ম এই যে, উহা অপ্রকাশিত বস্তুকে প্রকাশিত করে; সত্ত্ব গুণের ধর্ম্ম প্রকাশসত্ত্বা রক্ষা করে আর তমোগুণের ধর্ম্ম প্রকাশিত বস্তুসত্ত্বার বিলোপ সাধন করিয়া থাকে। সত্ত্ব-প্রারম্ভে রজো গুণ এবং অপর প্রান্তে তমোগুণ, সুতরাং ঐ অসদ্‌গুণদ্বয়ের সত্ত্বা প্রাকৃত সত্ত্বে আবদ্ধ। এই তিনটী গুণের গুণী তিনটীকে 'গুণাবতার' বলা হয়। সত্ত্বাধিষ্ঠাতৃ পুরুষ হইয়াও বিষ্ণু স্বয়ং গুণাতীত। ইনি গুণমায়াতীত অধোক্ষজতত্ত্ব। ইনিই—অনিরুদ্ধ; শুদ্ধসত্ত্বাত্মক তুরীয় তত্ত্ব। ইনি শব্দযোনি ও সাত্ত্বতগণের কামদোহনকারী; ইনি নিখিলজীবের অন্তরে অন্তর্যামিপুরুষরূপে বিরাজিত। এই মায়াধীশ বিষ্ণুর উপাসনায় জীবের মায়াতীত অপ্রাকৃত উপলব্ধি হয়। রজোগুণাধিষ্ঠাতৃ ব্রহ্মা গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতারের নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হইয়া যখন নিজের রজোগুণাধিষ্ঠাতৃত্ব অভিমানের পরিবর্ত্তে হরিজনাভিমানে প্রপন্ন ও ভগবৎপ্রোক্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমন্বিত পরমগুহ্য অধোক্ষজ জ্ঞানের শ্রৌতপন্থী বক্তা হন, তখন তাঁহার আনুগত্যে জীবের দিব্য জ্ঞানের উদয় হয়, নতুবা রজোগুণ জীবের চিচ্চক্ষু আবরণ করিয়া তাহাকে প্রাকৃত রাজ্যের ভোক্তাভিমানে প্রমত্ত করায়। আর রুদ্র যখন স্বীয় গুণসংবৃতত্ব বা তমোগুণাধিষ্ঠাতৃত্ব অভিমানের পরিবর্ত্তে হরিজনাভিমানে সঙ্কর্ষণসেবকরূপে বৈকুণ্ঠ প্রতীতির প্রচারক হন, তখন রুদ্রানুগত্যে প্রচেতাগণের ন্যায়

জীবের দিব্য জ্ঞান লাভ হয়, নতুবা তমোগুণ জীবের দিব্যচক্ষুর প্রতিবন্ধক হইয়া জীবকে হয় পাষণ্ডমার্গে নিক্ষেপ করে, নয় অতি-জ্ঞানের প্রলোভন দেখাইয়া নির্ব্বিশেষ তমোরাজ্যে পাতিত করিয়া তাহার আত্মবিনাশ সাধন করিয়া থাকে।

বদ্ধজীব মহত্তত্ত্ব হইতে নিঃসৃত অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাকৃত জগতের সহিত পঞ্চতন্মাত্রযোগে অনিত্য সম্বন্ধে ধাবিত হয়। সেই সময়ে অণুসম্বিতের কেবলা বৃত্তি যে অহৈতুকী অধোক্ষজ-সেবা, তাহা সুপ্ত থাকায় তদভাব-বৃত্তিতে স্থূল-সূক্ষ্ম প্রাকৃত ভূমি-কায় বিচরণ করিয়া ভোগ বা ত্যাগে লিপ্ত বা উদাসীন হইয়া পড়ে। অচিদ্‌ভোগ বা অচিৎত্যাগ—এই বৃত্তিদ্বয়কে কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ অভক্তিবৃত্তি বা দেহ ও মনোধর্ম্মরূপে বর্ণনা করা হয়। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহৎ হইতে অহঙ্কার এবং সেই প্রাকৃত সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন এবং সেই সকল প্রাকৃত-তত্ত্বসমূহ ক্রমশঃ স্থূলতর হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়াদিরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুতরাং যেমন পঞ্চহস্তপরিমিত রজ্জুতে আবদ্ধ গাভী বিংশহস্ত ব্যবধানে অবস্থিত নবতৃণাঙ্কুর স্পর্শ করিতে পারে না, তদ্রূপ মন ও দেহ-ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া জীব প্রকৃতির অতীত অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। দেহ-ধর্ম্ম-কর্ম্ম বা মনোধর্ম্ম-জ্ঞান—উভয়ই প্রাকৃত বস্তু বা প্রাকৃত ভাবনিচয়ের বৃত্তি বলিয়া প্রাকৃত। প্রাকৃত কর্ম্ম বদ্ধ-জীবের দেহমনের প্রাপ্য, প্রাকৃত নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান জীবের দেহ-মনের ধ্বংসবিষয়ক। ভগবানের একপাদ বিভূতি হইতে প্রাকৃত জগৎ এবং ত্রিপাদ বিভূতি হইতে অপ্রাকৃত জগৎ; সুতরাং একপাদ

দ্বারা ত্রিপাদবৈভব আয়ত্ত করা যায় না। যাহারা একপাদ বৈভবেরও সামান্য প্রাকৃত খণ্ড জ্ঞান লইয়া অপ্রাকৃতজ্ঞানের বিচার করিতে ধাবিত হয়, তাহারা মক্ষিকার ন্যায় কাঁচভাণ্ডে সুরক্ষিত মধু গ্রহণ করিবার বৃথা চেষ্টার ন্যায় প্রাকৃত রাজ্যেই অবস্থান করে। ঐ সকল আরোহবাদীর চেষ্টা প্রাকৃত। ভোগময় ব্যাধি বা ত্যাগময় শান্তির ছলনা—উভয়ই প্রাকৃতভোগের প্রকার ভেদ, 'অপ্রাকৃত' তাহা হইতে স্বতন্ত্র। অণুসম্বিতের প্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থিতিকালে প্রাকৃত সহজধর্ম্ম তাহার অপ্রাকৃত বুদ্ধিকে আবরণ করে, সুতরাং অণুসম্বিৎ সেই অবস্থায় থাকিয়া অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগপথের পথিক সূত্রে যে 'দীক্ষা' বা 'দিব্যজ্ঞান' প্রাপ্তির অভিনয় করে, তাহা প্রকৃতপক্ষে 'অপ্রাকৃতজ্ঞান' না হইয়া বিমুখ-বিমোহিনী মায়াকল্পিত প্রহেলিকাময় প্রাকৃত-জ্ঞান-বৈচিত্র্য মাত্র। দেশিক ও তত্ত্বকোবিদগণ যাহাকে 'দীক্ষা', 'দিব্যজ্ঞান' বা 'অপ্রাকৃতানুভূতি' বলেন, তাহা অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগপথের পথিক-থাকা-কালে লাভ হইতে পারে না অর্থাৎ তত্ত্বকোবিদগণের সিদ্ধান্তানুসারে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগীর দীক্ষার অভিনয় দীক্ষার অনুকরণ-চেষ্টা হইলেও তাহা 'দীক্ষা' বা দিব্যজ্ঞানের অনুসরণ নহে। ঐরূপ অনুষ্ঠান 'দীক্ষা' নামে অভিহিত না হইয়া 'দীক্ষাভিনয়' বা 'দীক্ষাবাধ' নামে অভিহিত হওয়াই সমীচীন।

এইরূপ সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া চমকিত বা ক্ষুব্ধ হইবার কোন কারণ নাই। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, দীক্ষা-সম্বন্ধে দেশিক ও

তত্ত্বকোবিদগণের বিচার হইতে সাধারণের বিপ্রলিপ্সাময়ী ধারণা স্বতন্ত্র। দীক্ষাভিনয় বা অনুকরণ প্রকৃত দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানের পথ-অনুসরণ হইতে পৃথক্। কর্ম্মপথের পথিকগণ দীক্ষানুষ্ঠান-ব্যাপারকে সামাজিক ও ব্যবহারিক কৃত্যবিশেষ জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দীক্ষাগ্রহণ-প্রণালী আলোচনা করিলেই ইহা বেশ উপলব্ধি হইতে পারে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য যেরূপ দীক্ষাবিধির ব্যবস্থা বিধান করিয়াছেন, তাহা একটু নিরপেক্ষ-ভাবে আলোচনা করিলেই বুঝা যায় যে, ঐরূপ দীক্ষানুষ্ঠান বা দীক্ষানুকরণ জীবের দিব্যজ্ঞান উদয় না করাইয়া জীবকে প্রাকৃত কর্ম্মফলরাজ্যে অর্থাৎ একপাদ বিভূতিরূপ এই প্রাকৃত দেবীধামের অন্তর্গত চতুর্দ্দশভুবনেই আবদ্ধ রাখে। কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের বিচারে দীক্ষাদাতা একটী কর্ম্মফলবাধ্য অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্মফলভোক্তা জীব-বিশেষ অর্থাৎ দীক্ষাদাতা একজন বৈজ-ব্রাহ্মণ ও গৃহী (গৃহব্রত বা গৃহমেধী) অর্থাৎ সাত্বতগণের বিচারের প্রতিকূলে গুরুদেব বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস বা বৈষ্ণব হইবার পরিবর্ত্তে একজন বদ্ধ-জীববিশেষ! গুরু ও শিষ্যের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধে দিব্যজ্ঞানের অভাব ত' দূরের কথা, সম্পূর্ণ প্রাকৃতজ্ঞানের পরাকাষ্ঠাই পরি-লক্ষিত হয়। দীক্ষাগ্রহণানুকরণকারী ব্যক্তি দীক্ষাদাতা গুরুদেবকে একজন কর্ম্ম-ফলবাধ্য জীববিশেষ বিচার করিবেন এবং দীক্ষা-দাতার অভিনয়কারী গুরুদেব দীক্ষাদানের অভিনয় প্রদর্শন করিবার পরেও দীক্ষিতকে অদীক্ষিতের অবস্থা হইতে উত্তোলন করিতে অসমর্থ হইয়া পূর্ব্ববৎ প্রাকৃত চক্ষেই দর্শন করিতে

থাকিবেন। এইরূপে গুরু ও শিষ্য উভয়ের প্রাকৃত বুদ্ধি যোজনা ও অভ্যাস-ফলে প্রাকৃত জ্ঞান আরও পরিবর্দ্ধিত হইয়া উভয়কে প্রাকৃত তমোরাজ্যে প্রবেশ করাইবে। কিন্তু বৈদান্তিক আত্মধর্ম্মের বিচার এই যে, গুরু ও শিষ্যের এই প্রকার প্রাকৃত সম্বন্ধ বা প্রাকৃত-বিচার-প্রাবল্য নিরয়ের সেতু মাত্র। এই জন্যই শ্রীউদ্ধব-গীতায় শ্রীভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন,—'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াং', এইজন্যই শ্রীপদ্মপুরাণ তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—'গুরুষু নরমতির্যস্য বা নারকী সঃ'। কিন্তু কর্ম্মপথের পথিকগণের বিচার তদ্বিপরীত। তাঁহারা বলেন, গুরুদেবকে একজন কর্ম্মফলবাধ্য ব্রাহ্মণাদি পুণ্যময় জীববিশেষ ধারণা করিতে হইবে। পাপ ও পুণ্য—উভয়ই যে প্রাকৃত, ইহা ঐ সকল দীক্ষাদাতার অভিনয়কারী ও দীক্ষাগ্রহণের অনুকরণকারি ব্যক্তিগণের প্রকৃত দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান-লাভের অভাবে অনুভূতির বিষয় হয় না। এইরূপ গুরু ও শিষ্য উভয়েই প্রাকৃত কর্ম্মালানে বদ্ধ। তাঁহাদের উভয়ের অস্মিতা দেবীধামের প্রাকৃত ভূমিকায় আবদ্ধ। তাঁহারা উভয়ে বদ্ধজীব—উভয়ে অন্ধ। এই সকল ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই জীবমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাত্ত্বতশাস্ত্র তারস্বরে বলিয়াছেন,—"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥"

পরমহিতকারিণী শ্রুতি ফলবাধ্য পুণ্যময় জীববিশেষকে 'গুরু'রূপে গ্রহণ করিবার পরামর্শ দেন না। তিনি 'শ্রোত্রিয়' ও 'ব্রহ্মনিষ্ঠ' গুরুতে অভিগমন করিবার উপদেশই দিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতও 'শব্দব্রহ্ম' ও 'পরব্রহ্মোনিষ্ণাত' পরমোপশান্ত

গুরুদেবকেই দীক্ষাদাতৃরূপে বরণ করিবার উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন,—

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা—সেই 'গুরু' হয়॥"

দেশিক ও তত্ত্বকোবিদগণ যাহাকে 'দীক্ষা' বলেন, তাহা দ্বারা অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ এবং পাপের সম্যগ্‌রূপ ক্ষয় অর্থাৎ ফলোন্মুখ প্রারব্ধ, প্রারব্ধত্বের উন্মুখ বীজ, বীজকারণ কূট ও অপ্রারব্ধ ফল—এই পাপচতুষ্টয় সমূলে বিনষ্ট হয়। কর্ম্মদীক্ষায় অপ্রারব্ধ পাপ কিয়ৎপরিমাণে ক্ষয় হইলেও পাপবীজ ও অবিদ্যা বিধ্বংসিত না হওয়ায় পুনরায় পাপে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, জ্ঞান বা যোগ-দীক্ষায় অপ্রারব্ধ পাপ পাপবীজের সহিত বিনষ্ট হইলেও প্রারব্ধ পাপ ও অবিদ্যা ধ্বংস না হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে আত্যন্তিক ক্লেশের নিবৃত্তি হয় না। এই জন্যই জ্ঞানিগণের প্রারব্ধ পাপভোগ ও পুনরাবৃত্তির কথা শাস্ত্রে শ্রুত হয়। কিন্তু ক্লেশঘ্নী বৈষ্ণবী দীক্ষার প্রারম্ভমাত্রেই সমগ্র পাপমূল উৎপাটিত হইয়া থাকে, তবে যে অক্ষজ নেত্রে বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ বা পাপ-প্রবৃত্তি প্রতীয়মান হয়, উহা উৎপাটিত-মূল বৃক্ষের সজীবতা লক্ষণের ন্যায় অর্থাৎ যেমন বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইলেও কিছুকাল পর্য্যন্ত তাহাকে সজীবতার চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ। যদিও অনেক সময় 'কমলপত্রশতবেধ'-ন্যায়ানুসারে পাপরাশি বিনষ্ট হইতে থাকে বলিয়া অক্ষজ জ্ঞানপ্রমত্ত সাধারণ মৎসর জীব দীক্ষিত ও অদীক্ষিত ব্যক্তির তারতম্য উপলব্ধি করিতে পারে না, তথাপি উহা সাধক

ও সিদ্ধ ব্যক্তিগণের অনুভূতির বিষয় হয়। কিন্তু কর্ম্মজড়গণের বিচারে দীক্ষাগ্রহণাভিনয় প্রদর্শন করিবার পরও দীক্ষাদাতা দীক্ষিতন্মন্য ব্যক্তির পাপ দূর করিতে অসমর্থ হইয়া উহাকে 'অপ্রাকৃত' জানিবার পরিবর্ত্তে 'প্রাকৃত' অর্থাৎ পাপনিমগ্ন শোচ্য জীব (শূদ্র) বা প্রারব্ধ পুণ্যকর্মফলভোক্তৃ-(বা শৌক্রব্রাহ্মণ) রূপে জানেন। কিন্তু দেশিকগণ বলেন, দীক্ষিতব্যক্তি কখনও 'প্রাকৃত' থাকিতে পারেন না। দীক্ষাদাতা গুরুদেব অপ্রাকৃত, তিনি স্পর্শমণি। স্পর্শমণির স্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া যদি কোন ধাতু-বিশেষ পূর্ব্ব-ধাতুই সংরক্ষণ করিল, তাহা হইলে হয় পূর্ব্বোক্ত বস্তুটি প্রকৃত স্পর্শমণি নহে, উহা মেকী জিনিষ, অথবা উক্ত ধাতুবিশেষ স্পর্শমণির সান্নিধ্য বা স্পর্শ প্রাপ্ত হয় নাই কিম্বা উভয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান রহিয়াছে, যাহা ধাতুবিশেষের কাঞ্চনত্ব সংঘটনে বাধা প্রদান করিয়াছে। তত্ত্বকোবিদগণ বলেন,—

> "যথা কাঞ্চনতাং যতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
> তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥"

তাঁহারা আরও বলেন,—

> "দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
> সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥
> সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
> অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয় ॥"

শ্রীগুরুদেব—অপ্রাকৃত। তিনি যখন আত্মসমর্পণকারি-ভক্তকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, তখন তাহাকে 'আত্মসম' অর্থাৎ

'অপ্রাকৃত করিতে পারেন না, সেই গুরুব্রুবব্যক্তি নিজেই 'অপ্রাকৃত' নহেন জানিতে হইবে। কারণ যিনি নিজে অপ্রাকৃত নহেন অর্থাৎ 'দীক্ষিত' হন নাই, তিনি কি করিয়া অপরকে 'অপ্রাকৃত করিতে পারিবেন ? যিনি অপ্রাকৃত হইতে পারিলেন না, তাঁহার 'দীক্ষা' বা দিব্যজ্ঞান লাভ হয় নাই ; তিনি কখনও অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবার অধিকার পাইলেন না, কারণ 'না দেবো দেবমর্চ্চয়েৎ" এই ন্যায়ানুসারে 'প্রাকৃত' কখনও 'অপ্রাকৃতে'র সেবা করিতে পারে না।

অপ্রাকৃতের লক্ষণ এই যে, তাঁহার অস্মিতা প্রাকৃত রাজ্যের কোন বস্তুতে নাই। দেহ ও মনোধর্ম্মের কোনও প্রাকৃত অভিমানে 'অপ্রাকৃত' ব্যস্ত নহেন। 'অপ্রাকৃত' যখন প্রাকৃত ভূমিকায় প্রাকৃতমনের দ্বারা বিচরণ করেন না, তখন তাঁহার প্রাকৃত অভিমানও থাকিতে পারে না। অর্থাৎ 'অপ্রাকৃত' সেবা-সুখ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব ইতিহাস বা 'আমি শূদ্র, ব্রাহ্মণ, আমি অমুক পিতার সন্তান, আমি অমুক বসু-রায়-চৌধুরী-ভট্টাচার্য" প্রভৃতি যাবতীয় প্রাকৃত ইতিহাসের হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হন। অপ্রাকৃত গুরুদেব শিষ্যকে ঐরূপ প্রাকৃত অভিমানে লিপ্ত থাকি-বার পরামর্শ না দিয়া তাঁহাকে তাঁহার কৃষ্ণদাস্যসূচক নাম ও উপাধিতে বিমণ্ডিত করেন এবং পুনঃ পুনঃ তাঁহার কর্ণে তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপের কেবলা বৃত্তি কৃষ্ণদাস্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততর ভজনরাজ্যে প্রতি-ষ্ঠিত করেন। দীক্ষিতব্যক্তি এইরূপে শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে

প্রতিক্ষণ 'দীক্ষা' প্রাপ্ত হইয়া যখন অভিধেয় যাজন করিতে করিতে সম্বন্ধজ্ঞানে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হন এবং প্রয়োজন সম্পত্তি লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হন, তখন তাঁহার দীক্ষার পরিপূর্ণতা সাধিত হয়।

জ্ঞানী ও যোগিগণের দীক্ষানুকরণকেও 'দীক্ষা' বা 'দিব্যজ্ঞান' বলা যাইতে পারে না। কারণ তাঁহাদের মতানুসারেই 'গুরু' ও 'শিষ্য' সম্বন্ধ ব্যবহারিক ও অনিত্য অর্থাৎ তাঁহাদের মতে তাঁহাদের প্রাপ্যজ্ঞান লাভের পর গুরু-শিষ্যরূপ ভেদজ্ঞান বা ভ্রমের অবকাশ নাই। যথা—"গুরুর্নৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥" তাঁহাদের মতে জগতের অসত্য নির্দ্ধারিত হওয়ায় শিষ্য, আচার্য্য এবং আচার্য্যের উপদিষ্ট জ্ঞান—এসমস্ত জগতের অন্তর্গত হইয়া পড়ে। যদি তাঁহারা বলেন, আচার্য্য ও আচার্য্যের উপদিষ্ট জ্ঞান শিষ্যোপদেশের জন্য কল্পিত হইয়াছে—এইরূপ যুক্তিও তাঁহারা রক্ষা করিতে পারেন না। কারণ কল্পিত আচার্য্যের উপদিষ্ট কল্পিত জ্ঞান দ্বারা কল্পিত শিষ্যের কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে? রজতরূপে প্রতীয়মান শুক্তি দেখিয়া রজতার্থী কোন ব্যক্তি যদি রজত আহরণের জন্য তাহাতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার সেই প্রযত্ন যেরূপ বিফল হয় অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে রজত লাভ হয় না, সেইরূপ নির্ভেদজ্ঞানানুসন্ধিৎসুগণের মতে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা বিবেচিত হওয়ায় মোক্ষলাভের জন্য গুরুপদাশ্রয়ের অভিনয় এবং তাহা হইতে শ্রবণ প্রভৃতি বিষয়ের প্রযত্নও অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া নিষ্ফল হইয়া পড়ে। কোন কারাগারে

আবদ্ধ পুরুষকে স্বপ্নে যদি কোন পুরুষ উপদেশ করেন যে, "তুমি কারাগার হইতে মুক্ত হইয়াছ" এবং সেই বাক্য হইতে স্বপ্নে যদি পুরুষের এইরূপ জ্ঞান হয় যে, "আমি বন্ধনমুক্ত", তাহা হইলে যেমন সেই জ্ঞান কার্য্যকর হয় না বস্তুতঃ জাগ্রত হইয়া সে আপনাকে বন্ধনগ্রস্তই দেখিতে পায়, সেইরূপ "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য হইতে উৎপন্ন জ্ঞান ও অবিদ্যাকল্পিত বাক্যজাত বলিয়া নিজেও অবিদ্যাত্মকহেতু, অবিদ্যাদ্বারা কল্পিত জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া এবং কল্পিত আচার্য্যের অধীন শ্রবণ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় পুরুষের বন্ধননাশ অর্থাৎ পুরুষকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করিতে পারে না।

অতএব প্রমাণিত হইল যে, 'অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি অভিমানগ্রস্ত ব্যক্তিগণের দীক্ষানুকরণচেষ্টা তত্ত্বকোবিদ-গণের প্রতিপাদ্য 'দীক্ষা' বা 'দিব্যজ্ঞান' নহে। অপ্রাকৃত গুরু-দেব অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান প্রভাবে বদ্ধজীবকে যে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন তাহাই দীক্ষা। সেই দিব্যজ্ঞানে অপ্রাকৃত বিবেক উদিত হয়। (নির্ব্বিশেষবাদিগণের 'অপ্রাকৃত' বা 'আধ্যাত্মিক' পরিভাষার উদ্দিষ্ট বিষয় হইতে গুরু অধোক্ষজ সেবাপর 'অপ্রাকৃত' পৃথক্) অপ্রাকৃত বিবেকাভাবে জীব প্রাকৃত বিবেকানন্দ থাকেন এবং সেই প্রাকৃতবিবেকানন্দে প্রমত্ত হইয়া অর্থাৎ প্রাকৃত রজোগুণকেই (রজোগুণাধিক্যকেই) বহু-মানন করিয়া একজন বড় আরোহবাদী হইয়া পড়েন। এমন কি, গুর্ব্ববজ্ঞা প্রদর্শনকেই একটা 'বড় বাহাদুরী'র কার্য্য মনে করিয়া জগতে তৎসমশীল ব্যক্তিগণের নিকট হইতে 'বাহাবা' প্রাপ্ত হন।

ঐরূপ প্রাকৃতবিবেকানন্দে প্রমত্ত ব্যক্তি মূর্খতাকে গুরুরূপে দাঁড় করাইয়া অর্থাৎ মূর্খতাকে গুরুর মূর্তিরূপে গড়িয়া কল্পিত গুরুকে তাহার ভোগের বস্তুরূপে পরিণত করেন এবং নিজ ভোগবুদ্ধি ও অপরাধকে মূর্খতারূপী কল্পিত গুরুদ্বারা সমর্থনকল্পে শ্রুতির পন্থার প্রতিকূলে মূর্ত্ত মূর্খতার নিকট প্রশ্ন করিয়া থাকে, "হে আমার ভোগ্যবস্তু! তুমি কি ভগবানকে দেখিয়াছ? আমাকে কি তুমি ভগবান্ দেখাইতে পার? তুমি কি ভগবানকে আমার ভোগপর ইন্দ্রিয়ের গোচর করাইয়া আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ দ্বারা আমার সেবক হইতে পার?" এইরূপ চিন্তাস্রোত রজোগুণের প্রাবল্যহেতু প্রচ্ছন্ন নাস্তিক অধিরোহবাদীর ভোগময় চিত্তে উদিত হইলেও উহাতে মূর্খতা ও নাস্তিকতা ব্যতীত আর কিছুই নাই। ইহা গীতোপনিষদের "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" বা শ্রুতির "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্"—এই নির্দ্দিষ্ট পন্থার বিরোধী গুরুলঙ্ঘনা-বজ্ঞা ও অক্ষজ-জ্ঞান-প্রমত্ততারূপ আসুরিক আরোহবাদবিশেষ। শ্রীগুরুদেব কখনও 'আমি ভগবান্ দেখিয়াছি" এইরূপ কথা বলেন না। অগুরু বা অসুরভাবাপন্ন ব্যক্তিগণই ভগবানকে ভূতপ্রেতজাতীয় বস্তু মনে করিয়া 'আমি ভগবানকে দেখিয়া ফেলিয়াছি'—এইরূপ ব্যর্থ দাম্ভিকতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রেমিক ভগবদ্ভক্তগণ সর্ব্বদা কৃষ্ণানুসন্ধানলীলাই প্রদর্শন করেন। তাই জগদ্গুরু-লীলাভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্রে আমরা দেখিতে পাই, তিনি সর্ব্বদা বলিতেছেন,—"কাঁহা যাঙ, কাঁহা পাঙ

মুরলীবদন।" তাই আবার তিনি কখনও শিক্ষাষ্টক দ্বারা জীবকে সিদ্ধির অন্তর্লক্ষণ জানাইতেছেন,—

"যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥"

আবার সিদ্ধির নিষ্ঠা শিক্ষা দিতেছেন,—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"
'প্রেমের স্বভাব এই প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তি-গন্ধ॥"

কলি বা তর্কবহুলযুগে শুদ্ধ-ভক্তিপথ কোটিকণ্টকরুদ্ধ। সুতরাং বর্ত্তমানে দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানের আদর্শ অনুসরণের পরিবর্ত্তে দীক্ষার অনুকরণ বা দীক্ষাবাধকেই 'দীক্ষা' বলিয়া অদীক্ষিত এবং দীক্ষানুকরণকারি-সম্প্রদায়ে প্রচলিত হইতেছে। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের ভাষায় দেখিতে পাই—

"চক্ষুদান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাহা হৈতে, অবিদ্যা-বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত॥"

শ্রীগুরুপ্রণামেও দৃষ্ট হয়;—

"অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা-দ্বারা চক্ষুরুন্মীলন-কার্য্যের বা দিব্যজ্ঞানকে 'দীক্ষা' বলিবার পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান হরিবিমুখ সমাজে যে-সকল হরিবিমুখতাময়ী চেষ্টাকে দীক্ষা-ক্রিয়া বলা হয়, তাহার একটী আংশিক চিত্র নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

বর্ত্তমানে দুইশ্রেণীর দীক্ষা-গ্রহণের অভিনয়কারী এবং দুই-শ্রেণীর দীক্ষাদাতার অভিনয়কারী হরিবিমুখ ব্যক্তি দৃষ্ট হয়। একপ্রকার দীক্ষাগ্রহণের অভিনয়কারী দীক্ষাগ্রহণ ব্যাপারটীকে একটী 'হুজুগে' এবং 'পোষাকী ব্যাপারবিশেষ ধারণা করিয়া দীক্ষা গ্রহণানুকরণরূপ অনুষ্ঠানে রুচিবিশিষ্ট হয়। এই শ্রেণীর মধ্যে 'দীক্ষা ব্যাপারটী কি', 'দীক্ষার আবশ্যকতা কি', দীক্ষাগ্রহণের অধিকারী এবং অনধিকারীই বা কে', 'কে-ই বা প্রকৃত দীক্ষাদাতা' — এই সকল বিষয় তলাইয়া দেখিবার অবকাশ হয় না। ইহারা গড্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় একজনের দেখাদেখি আর একজন বিচার ও বুদ্ধিরহিত হইয়া বুদ্ধিহীন অজার ন্যায় অন্ধকূপে ঝম্প প্রদান করিয়া থাকে। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে কেহ বা পরে অনুতপ্ত হয়, আর যাহার কপাল চিরতরে পুড়িয়াছে, সে ব্যক্তি বঞ্চিত হইয়া চিরজীবন মনোধর্ম্মের প্রহেলিকায় ঘুরিয়া বেড়ানকেই একটা মস্ত কাজ মনে করে। অনেক সময় যেমন প্রকৃত ক্ষুধার উদ্রেক না হইলেও অপরকে কিছু আহার করিতে দেখিলে দুষ্টা ক্ষুধার উদয় হয় এবং সেইকালে অনাবশ্যক দ্রব্যাদি গ্রহণ করার ফলে উদরে আময় সঞ্চার হইয়া থাকে, তদ্রূপ অনেকে 'দীক্ষা' বা দিব্যজ্ঞান-লাভটী কি, তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়াই দীক্ষাকে একটা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াবিশেষ ধারণা করিয়া ও লোকের নিকট

‘আমি খুব একজন নামজাদা গুরু করিয়াছি সেই গুরুকে আমি
বেশ মনের মত করিয়া আমার ভোগের সামগ্রী করিতে পারিব
অর্থাৎ আমি আমার বহির্ম্মুখতার স্বভাব ও রুচি লইয়া যে সকল
মনোধর্ম্মোত্থ কার্য্যের তালিকা বা ভাবুকতার প্রস্তাব উপস্থাপিত
করিব, আমার ভোগ্য গুরুর দ্বারা আমি সেই সকল সমর্থন
করাইয়া লইয়া লোকের নিকট ‘ভক্ত-বিটেল’ সাজিতে পারিব,
এইরূপ ভোগবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া অনেক ব্যক্তি দীক্ষা গ্রহণের
অভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই সকল ব্যক্তি অনেক সময়
প্রাকৃত শিক্ষার অভিমানে প্রমত্ত হইয়া মনে করেন যে. ‘আমি
যখন একজন বড় প্রফেসর কিম্বা ব্যারিষ্টার কিম্বা একজন প্রথিত-
নামা দেশনেতা বা সপ্ততীর্থ মহামহোপাধ্যায়, তখন যিনি আমার
মত ব্যক্তির ‘গুরু’ হইবেন, তাহার সৌভাগ্যের আর সীমা নাই;
আমি গুরুকে বহু উচ্চ শিখরে উঠাইয়া দিতে পারিব; আমার
মত এত বড় লোক যাহার নিকট সমস্ত অবনত করেন, তাঁহার
ভাগ্যের বলিহারী যাই! আবার অন্যদিকে গুরুদেব মনে করেন,
আমি যখন বড় প্রফেসর, ব্যারিষ্টার, রাষ্ট্রনেতা, পি, এইচ, ডি
বা মহামহোপাধ্যায় প্রভৃতির গুরু হইবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হই-
য়াছি, তখন দুনিয়াতে আমার মত আর কে আছে! এইরূপ-
গুরুদেব ঐরূপ সৌভাগ্য লাভ করিয়া তাঁহার প্রফেসর-ব্যারিষ্টার-
শিষ্যবর্গের এরূপ ক্রীতদাস হইয়া পড়েন যে, শিষ্যগণ যে প্রস্তাবই
করুন না কেন, গুরুদেব তাহা সমর্থন না করিয়া অন্যথা করিতে
পারেন না। অবশ্য কখনও কখনও নিজের একটু লোকদেখান

গুরুত্ব ও বাহাদুরী বজায় রাখিবার জন্য শিষ্যবর্গের প্রস্তাবসমূহের মধ্যে একটু মতামত দিয়া থাকেন মাত্র, তাহাতেও শিষ্যানুবর্ত্তিত্বই লক্ষিত হয়। এইরূপ গুরু ও শিষ্যের অভিনয়ে পরস্পরে ভোগ-বুদ্ধি ও অজ্ঞানতিমিরান্ধতা ব্যতীত দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানের লেশমাত্র নাই। ঐরূপ গুরু ও শিষ্য উভয়েই প্রাকৃত অস্মিতায় আবদ্ধ।

উহারা উভয়েই অন্ধকূপে পতিত। এইরূপ গুরু নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়াছেন আর স্বরূপবিভ্রান্ত শিষ্যগণকেও অধিকতর ভ্রান্তপথে চালিত করিতেছেন। তবে উহাঁদের মধ্যে যে ধর্ম্মানুষ্ঠানের বাহ্য-আকার দৃষ্ট হয়, তাহা প্রকৃত ভগবদনুসন্ধান নহে, কেবল ধর্মের আবরণে স্ব স্ব মনোধর্ম ও ভোগবৃত্তি চরিতার্থ করিবার একটা ছলনা মাত্র। এই সকল বঞ্চিত ব্যক্তিই সমাজে 'দীক্ষিত' বা 'দীক্ষাদাতারূপে' প্রচলিত থাকিয়া প্রকৃত দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানের আদর্শকে লোকলোচন হইতে আবৃত করিতেছে। এই ত গেল এক প্রকার দীক্ষাগ্রহণের অনুকরণকারী ও দীক্ষাদানের অভিনয়কারী। আর একপ্রকার অভিনয়কারী শ্রেণীর মধ্যে দীক্ষা-দানানুকরণ কার্য্যটি উদরভরণ, স্ত্রী পুত্রের ভোগ্য ও বিলাস-সামগ্রী সংগ্রহের উপায় বা বণিগ্-বৃত্তি বিশেষ। স্বীয় যোগ্যতা থাকুক্ বা নাই থাকুক্, নিজে দীক্ষিত হউক্ বা নাই হউক্ অর্থাৎ দিব্যজ্ঞানলাভ করুক্ বা না-ই করুক সে সব বিচার করিবার আবশ্যক নাই; যেরূপ কপট ভালবাসা ও স্নেহ-মমতার অভিনয় দেখাইয়া অসদ্ব্যক্তিগণ সরল লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বাহ্যে তিলক-ফোঁটা ও ভাগবত-পাঠকের অভিনয়াদি দেখাইয়া লোকবঞ্চনাকার্যের নামই অনুকরণকারী বঞ্চক

শ্রেণীর মতে 'দীক্ষা'। এই সকল বণিকগণকে যাহারা আশ্রয় করে, তাহারাও তৎসমশীল অর্থাৎ বঞ্চিত বা বঞ্চিত হইতে ইচ্ছুক। সমবস্তুই সমবস্তুকে আকর্ষণ করে। গাঁজাখোর ও গাঁজাখোরেই বন্ধুত্ব হয়। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে 'দীক্ষা' কাহাকে বলে, 'দীক্ষাদাতা গুরুর লক্ষণ কি'—এসব বিচার করিবার আবশ্যক নাই। কাহারও মতে ঐ সকল কথাগুলি মুখে আলোচনা করিবার আবশ্যকতা থাকিলেও গ্রন্থ ও শাস্ত্রমঞ্জুষা-মধ্যেই ঐ বিচারসমূহকে তালা চাবি বন্ধ করিয়া রাখাই কর্ত্তব্য—ঐ সকল বিচার নিজ জীবনে গ্রহণ করিয়া আত্মমঙ্গল বিষয়ে যত্নশীল হইবার আবশ্যকতা নাই। কুলক্রমাগতপন্থায় শৌক্রবিচারাবলম্বন করিয়া গুরুগ্রহণ ও ক্রীতদাসপ্রথার ন্যায় গুরুব্রুব লঘুবস্তুর শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করাই ঐ সকল ব্যক্তির মতে 'দীক্ষা'। যেখানে এইরূপ রক্তমাংসের প্রাকৃত বিচার প্রবল এবং কাপট্য ও বঞ্চনার তাণ্ডব নৃত্য, সেখানে যদি ঐরূপ বাহ্যানুষ্ঠানকে 'দীক্ষা' ও 'দিব্যজ্ঞান' বলিতে হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রকে একটী কাপট্য-বিদ্যা শিখিবার উপায় বিশেষ জ্ঞান করিতে হয়। এই সকল কৌলিক, লৌকিক, বণিগ্‌বৃত্ত গুরুব্রুবগণের হস্ত হইতে মঙ্গলাকাঙ্খী জীবকুলকে মুক্ত করিবার জন্য শাস্ত্র ও আচার্যগণ তারস্বরে বলিয়াছেন,—

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥"

(মহা ভাঃ উদ্যোগ পর্ব্ব ১৭৯।২৫)

"স্নেহাদ্বা লোভতো বাপি যো গৃহ্ণীয়াদ্ দীক্ষয়া।
তস্মিন্ গুরৌ সশিষ্যে তদ্দেবতাশাপ আপতেৎ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ২।৫)

"যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৬২)

বিদ্বেষী চেৎ পরিত্যজ্য এব। 'গুরোরপ্যবলিপ্তস্যে'তি স্মরণাৎ। তস্য বৈষ্ণব-ভাবরাহিত্যেন অবৈষ্ণবতয়া 'অবৈষ্ণবোপদিষ্টেনে'তি বচনবিষয়ত্বাচ্চ।"

(ভক্তিসন্দর্ভ ২৩৮ সংখ্যা)

"পরমার্থ গুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুর্ব্বাদিপরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ।" (ভক্তিসন্দর্ভ ২১০ সংখ্যা)

"তত্র যদি গুরুর্বিসদৃশকারী ঈশ্বরে ভ্রান্তঃ কৃষ্ণযশোবিলাসবিনোদং নাঙ্গীকরোতি, স্বয়ং বা দুরভিমানী লোক-স্তবৈঃ কৃষ্ণত্বং প্রাপ্নোতি তর্হি ত্যজ্য এব। কথমেব গুরুস্ত্যজ্য ইতি ন। কৃষ্ণভাবলোভাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তয়ে গুরোরাশ্রয়নং কৃত্বা তদনন্তরং যদি তস্মিন্নেব গুরৌ আসুরীভাবস্তর্হি কিং কর্ত্তব্যং? আসুরগুরুং ত্যক্ত্বা শ্রীকৃষ্ণভক্তিমন্তং গুরুমন্যং ভজেৎ। তস্য কৃষ্ণবলাদসুরস্য গুরোর্ব্বলং মর্দ্দনীয়মিতি শ্রীশ্রীবৈষ্ণবানাং ভজনবিচারঃ। এবন্ত দৃষ্ট্বা বহবঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারে গুরুনিরূপণসিদ্ধান্তাঃ॥"

(শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরকৃত ভজনামৃতে)

সে স্থানে যদি, 'গুরু' বিরুদ্ধবাদী বা বিরুদ্ধাচারী হন,

'কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব' তাহা ভুলিয়া দুষ্ট মায়াবাদ জড়স্মার্ত্ত-বাদাদি অবলম্বন করেন বা কৃষ্ণের যশোবিলাস-বিনোদ অঙ্গীকার না করেন, স্বয়ং বা দুরভিমানি হইয়া কৃষ্ণবদ্ব্যবহার করেন, তবে সে গুরু অবশ্য ত্যজ্য হইবেন। গুরুত্যাগ কিরূপ হইতে পারে, এরূপ আশঙ্কা করিবে না। কৃষ্ণভক্তিপ্রাপ্তির লোভে এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য গুরুর চরণ আশ্রয় করিতে হয়। যখন সর্ব্বসদ্‌গুণ দেখিয়া শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় করা হয়, আবার তাহার পর সেই গুরুতে ঐ সকল আসুরী ভাবের উদয় হয়, তখন কি করা কর্ত্তব্য? সেই আসুরগুরুকে ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভক্তিমান অন্য গুরুকে অবশ্য ভজনা করিবে। ভক্ত গুরুর কৃষ্ণবলক্রমে আসুর গুরুর ক্রোধজনিত প্রাকৃত বলকে মর্দ্দন করাই শ্রেয়ঃ। ইহাই শ্রীশ্রীবৈষ্ণবদিগের ভজনের রহস্য বিচার। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারে গুরুনিরূপণ বিষয়ে এরূপ অনেক সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়।

সুতরাং দীক্ষাদানের লীলাভিনয়কারী গুরুব্রুবগণ এবং তাহাদের বঞ্চনাবৃত্তির সমর্থনকারী প্রাকৃত সহজিয়াগণ যে আনু-করণিক সম্প্রদায়কে গুরুসম্প্রদায়রূপে প্রচার করিয়া 'গুরু ত্যাগ - মহা অপরাধ' প্রভৃতি বাক্যের ছলে লোকবঞ্চনা করিয়া অযোগ্য, লৌকিক, কৌলিক ও বৈষ্ণববিদ্বেষী ব্যক্তির আনুগত্য সংরক্ষণকেই 'গুরুভক্তি' প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করে, সেই 'অসাধুকে সাধুরূপে গ্রহণ, তৎসঙ্গে প্রকৃত সাধুকে অবজ্ঞারূপ নামাপরাধ ও অসৎ মত-বাদ উপরি-উক্ত শাস্ত্র ও আচার্য্য বাক্য দ্বারা খণ্ডিত হইল।

দীক্ষা-গ্রহণাভিনয়কারী ও দীক্ষাদাতার অনুকরণকারিসম্প্র-

দায়ে আরও বহুপ্রকার বিভিন্ন অদ্ভুত মতবাদ শ্রুত হয়। কোন কোন মনোধর্ম্মী ও প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন, 'প্রভু-সন্তান না হইলে দীক্ষা সমীচীন হয় না'। কেহ কেহ আবার স্বীয় নিষ্কিঞ্চনতা প্রচারের ছলে জড়া প্রতিষ্ঠার কপটসেবক হইয়া তাঁহার নিকট আগত ব্যক্তিগণকে প্রভুসন্তানগণকেই দীক্ষাগুরুরূপে গ্রহণ করিবার পরামর্শ প্রদানপূর্ব্বক নিজে তাহাদের 'শিক্ষাগুরু' সাজিবার অভিনয় করিয়া থাকেন। এইরূপ বিচারে 'দীক্ষা' বা 'দিব্যজ্ঞানের' অভাবই পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ 'প্রভুসন্তান' না হইলে অপরে দীক্ষা-দাতা হইতে পারে না,—এইরূপ বিচারকের প্রভুসন্তানের ধারণা অতীব প্রাকৃত। যে স্থানে কেহ কোন ব্যক্তিবিশেষকে বা সম্প্রদায়-বিশেষকে শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতি বিষ্ণুতত্ত্বের কিম্বা ভগবৎপার্ষদ বৈষ্ণবতত্ত্বের রক্তবহনকারী শৌক্র-অধস্তন মনে করেন, সেই স্থানে বিচারকের দিব্যজ্ঞানের অভাব; কারণ এইরূপ বিচার শ্রীভাগবতধর্ম্ম বা আচার্য্যগণ সমর্থন করেন না। শ্রীস্বামিচরণ দশমস্কন্ধীয় 'ভগবান্ বিশ্বাত্মা' ইত্যাদি শ্লোকের ভাবার্থদীপিকায় বলেন যে, প্রাকৃত জীবের ন্যায় ভগবানের ধাতুসম্বন্ধ নাই—"জীবানামিব ন তু ধাতু-সম্বন্ধঃ" (ভাঃ ১০।২।১৬)। আচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের সিদ্ধান্তও তাহাই। তিনি বলেন,—শ্রীবিষ্ণুর "ন প্রাকৃতবত্তদীয়-চরমধাত্বাদৌ প্রবেশঃ" (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ)। অর্থাৎ প্রাকৃত জীবের ন্যায় বিষ্ণুতত্ত্বের চরম ধাতু প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণরূপ ব্যাপার নাই। সুতরাং এরূপ সূত্রে বিষ্ণু বা বৈষ্ণবতত্ত্বের

রক্তবাহকাভিমানিগণ যদি নিজদিগকে ‘প্রভুসন্তান’ বলেন বা বোলান কিম্বা অপর কেহ তাহা সমর্থন করেন, সেই সকল ব্যক্তির দিব্যজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব এবং অপরাধময় প্রাকৃত সাহজিক জ্ঞানেরই প্রাবল্য প্রমাণিত হইবে। এইরূপ ভীষণ অপরাধের প্রশ্রয়দাতৃগণকে দীক্ষাদাতৃরূপে গ্রহণ করিবার অভিনয় দেখাইলে দেশিক ও তত্ত্বকোবিদগণের উদ্দিষ্ট ‘দীক্ষা’ বা ‘দিব্যজ্ঞানলাভ’ হয় না; পরন্তু নিরয় গমনের পথ প্রশস্ত করা হয়।

‘অন্তঃশাক্ত, বহিঃশৈব, সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ’—এইরূপ অভিমানকারী এক শ্রেণীর ব্যক্তি হৃদয়ের অভ্যন্তরে ‘শাক্ত’ অর্থাৎ ভবানীভর্ত্তৃত্বাভিমান বা ভোগপরা জড়া প্রকৃতির উপাসকাভিমানে প্রমত্ত থাকিয়া ‘বাহিরে’ ‘শৈব’ অর্থাৎ মোক্ষকামী এবং ‘সভা’ অর্থাৎ জনসমাজে (অন্তরে অত্যন্ত ভোগী থাকিয়াও লোকবঞ্চনার্থ) ‘বৈষ্ণব’ অর্থাৎ নিষ্কিঞ্চনের ছলনা প্রদর্শনরূপ বকবৃত্তিদ্বারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য যে দীক্ষাদাতার চেষ্টার অভিনয় করেন, তাহা যে ‘দীক্ষা’ বা দিব্যজ্ঞান হইতে বহুদূরে তাহা বলাই বাহুল্য।

দীক্ষাগ্রহণ-সম্বন্ধে আর এক প্রকার মনোধর্ম্মীর ধারণা এই যে, যখন দীক্ষাদাতা-গুরু লইয়া জগতে এত গোলমাল চলিয়াছে, তখন দীক্ষাদি গ্রহণ না করা ভাল। শাস্ত্র পাঠ করিয়া নিজ বুদ্ধিবলে শাস্ত্র হইতে উপদেশ-সংগ্রহ ও তদনুসারে জীবন যাপন করিবার চেষ্টা করাই শ্রেয়ঃপন্থা। এইরূপ মনোধর্ম্মীর মতও অপর প্রকার প্রাকৃতজ্ঞানেরই পরিচায়ক। শাস্ত্র পাঠ করিবেন কে? যাহার

'দীক্ষা' বা দিব্যজ্ঞান লাভ হয় নাই, সে ব্যক্তি কখনও শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবে না। এই জন্য শ্রুতিস্মৃতিপুরাণ সকলেই গুরুর নিকটে শাস্ত্র-শ্রবণের আদেশ করিয়াছেন। এই জন্যই শ্রীল স্বরূপগোস্বামী প্রভু পণ্ডিতাভিমানী বঙ্গদেশীয় বিপ্র কবিকে বৈষ্ণবের নিকট শ্রীভাগবত অধ্যয়নের উপদেশ দিয়াছেন। প্রাকৃত জ্ঞান লইয়া শাস্ত্র পড়িতে গেলে যে কিরূপ অসুবিধা হয় তাহার চিত্র ব্যাসাবতার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন,—

"শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যমপাশে ডুবি মরে॥"

* * * *

"ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধিনাশ।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু দেবানন্দ পণ্ডিতের চরিত্র দ্বারা ইহার যাথার্থ্য প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং 'দীক্ষা' বা দিব্যজ্ঞানলাভ অর্থাৎ সদগুরুর নিকট প্রপত্তি-স্বীকার না করা পর্য্যন্ত শাস্ত্র পড়িয়াও লোকের ভগবদ্বহির্ম্মুখতার পথেই ধাবিত হইবার সম্ভাবনা।

আবার কাহারও মত এই যে, গুরুতে প্রপত্তি স্বীকার না করিয়া নিজের মনের খেয়াল অনুসারে ভালমন্দ বিচার পূর্ব্বক সেই পথে ধাবিত হইলে কোনও ঝঞ্ঝাটে পড়িতে হইবে না। আনুগত্য স্বীকার করিতে হইলেই নিজের ভগবদ্বহির্ম্মুখতারূপ মনোধর্ম বা ভোগবৃত্তির স্বেচ্ছাচারিতা পরিপূর্ণ মাত্রায় চরিতার্থ করা যায়

না। এই সকল ব্যক্তির জন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'কল্যাণ-কল্পতরু' গ্রন্থে মনঃশিক্ষাচ্ছলে একটী উপদেশ দিয়াছেন—

"মন ! তোরে বলি এ বারতা।
অপক্ক বয়সে হায়, বঞ্চিত বঞ্চক পায়,
বিকাইলে নিজ স্বতন্ত্রতা॥
সম্প্রদায়ে দোষবুদ্ধি, জানি তুমি আত্মশুদ্ধি,
করিবারে হৈলে সাবধান।
না নিলে তিলক-মালা, ত্যজিলে দীক্ষার জ্বালা
নিজে কৈলে নবীন বিধান॥
পূর্ব্বমতে তালি দিয়া, নিজ মত প্রচারিয়া,
নিজে অবতার বুদ্ধি ধরি'।
ব্রতাচার না মানিলে, পূর্ব্বপথ জলে দিলে,
মহাজনে ভ্রমদৃষ্টি করি'॥
ফোঁটা দীক্ষা মালা ধরি', ধূর্ত্ত করে সুচাতুরী,
তাই তাহে তোমার বিরাগ।
মহাজন-পথে দোষ, দেখিয়া তোমার রোষ,
পথ প্রতি ছাড় অনুরাগ॥
এখন দেখহ ভাই, স্বর্গ ছাড়ি' লৈলে ছাই,
ইহকাল পরকাল যায়।
কপট বলিল সবে, ভকতি বা পেলে কবে,
দেহান্তে বা কি হ'বে উপায়॥"

আর এক প্রকার মনোধর্ম্মিসম্প্রদায়ের মত এই যে,—"যখন

একমাত্র নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারাই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হয়, এমন কি নাম-সংকীর্ত্তন 'দীক্ষা পুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে', তখন দীক্ষাদাতা-গুরু-স্বীকার এবং দীক্ষাগুরুর আদেশ প্রতিপালন, গুরুসেবা, গুর্ব্বানুগত্য প্রভৃতি ভার অযথা মাথায় গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা কি? 'স্বাধীনভাবে হরিনাম' করিতে থাকিব, যেখানে খুসী সেখানে বেড়াইব, কাহারও ধার ধারিব না'—এরূপ স্বতন্ত্রতা পাইতে কে পরাধীনতা স্বীকার করে?"—এইরূপ বিচার ভোগবুদ্ধি বা ভগবদ্বহির্ম্মুখতা হইতেই উদিত হয়। এইরূপ বিচারকারিগণের মুখে কখনও শ্রীনাম উদিত হন না। ইহারা সাধু গুরুর চরণে অপরাধী। ইহারা নামাপরাধী। এরূপ মনোধর্ম্মোত্থ ভোগবাদ আচার্য্যগণ খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ৬।২।৯-১০ শ্লোকের সারার্থদর্শিনীতে বলিয়াছেন যে,—'হরিই—ভজনীয়, ভক্তি তাঁহার প্রাপক, শ্রীগুরুই—ভজনোপদেষ্টা, গুরূপদিষ্ট ভক্তগণই পূর্ব্বকালে শ্রীহরিকে পাইয়াছেন'-এইরূপ বিবেক-বিশিষ্ট হইয়াও 'শ্রীকৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র দীক্ষা বা অন্য সৎকার্য্য কিম্বা মন্ত্রপুরশ্চরণ প্রভৃতির কিছুমাত্র অপেক্ষা করেন না এবং রসনা স্পর্শমাত্রেই ফলদান করেন'—এই প্রমাণদর্শনে অজামিলাদির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমার দীক্ষা-গুরু-করণরূপ শ্রমের আবশ্যকতা কি, কেবল কীর্ত্তনাদির দ্বারাই আমার ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে,-এইরূপ যে ব্যক্তি মনে করেন, সে ব্যক্তি গুর্ব্ববজ্ঞা লক্ষণময় মহা-অপরাধহেতু ভগবান্‌কে কোন দিনই প্রাপ্ত হন না।" শ্রীল জীবগোস্বামিপাদও সন্দর্ভে লিখিয়াছেন যে স্বভাবতঃ

দেহাদি-সম্বন্ধ-দ্বারা কদর্য্য-চরিত্র বিক্ষিপ্ত-চিত্ত অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণের অনর্থ সঙ্কোচ-করণার্থ শ্রীনারদাদি ঋষিবর্গ অর্চ্চনমার্গে দীক্ষা-গ্রহণ-মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। অনর্থযুক্ত ব্যক্তি সেই শাস্ত্র শাসন উল্লঙ্ঘন করিলে তাহাদিগের শাস্ত্রাবজ্ঞারূপ দোষ বা নামাপরাধ হইয়া থাকে। সুতরাং সেইরূপ নামাপরাধিব্যক্তি 'নামাক্ষর' গ্রহণ করিলেও কোনদিন মঙ্গললাভ করিতে পারে না। তাহা-দিগের দিব্যজ্ঞান প্রদাতা সদ্‌গুরুচরণে প্রপত্তি স্বীকার-ব্যতীত মঙ্গল লাভের দ্বিতীয় পন্থা নাই।

আর এক প্রকার মনোধর্ম্মিসম্প্রদায়ের ধারণা এই যে, দীক্ষার বাহ্য-অনুষ্ঠান-কার্য্যটী হইলেই দীক্ষা পরিসমাপ্তি হইল। প্রকৃত-পক্ষে তাহা নহে। জীব সদ্‌গুরুচরণ হইতে মন্ত্র প্রাপ্ত হইবার মুহূর্ত্ত হইতেই দিব্যজ্ঞানলাভের পথের পথিক হন। প্রবেশিকা-পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র মহাবিদ্যালয়ের Roll Book এ নাম Registry করিবার অধিকার পাইয়াই যদি মনে করেন, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছি, তাহা হইলে তাহার ভাবী উন্নতির পথ রুদ্ধ হওয়া ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না। প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রকে মহা-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া উক্ত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তাঁহাকে উন্নত শিক্ষা লাভের অধিকার দেন মাত্র। সেই অধিকার লাভ করিয়া পাঠার্থীকে পরিশ্রমসহকারে নিয়মিতভাবে অধ্যয়ন করিতে হইবে অর্থাৎ জীব শ্রীগুরুদেবের নিকট উপনীত হওয়ার পর হইতে বিশ্রম্ভের সহিত গুরুসেবা, সদ্ধর্ম্মশিক্ষাপৃচ্ছা, সাধু মার্গানুগমন ও সর্ব্বতোভাবে

গুরুতে প্রপত্তিসাধন এবং সাধননিষ্ঠার দ্বারা গুরুপ্রসন্নতা লাভপূর্ব্বক ক্রমে অনর্থনিবৃত্তি তৎপরে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তিরূপ সাধনভক্তির ভূমিকা অতিক্রম করিয়া সাধ্য ভাবভক্তি ও তৎপরিপক্কাবস্থা প্রেম-ভক্তি লাভ করিবেন। সেই পরম প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেমা লাভ করিবার সৌভাগ্য হইলেই তাহার মন্ত্রসিদ্ধি বা পূর্ণদীক্ষা লাভ ঘটিবে।

আর এক প্রকার মনোধর্ম্মী, গুর্ব্বপরাধী, কপট ও বাস্তব-সত্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস-রহিত নাস্তিকসম্প্রদায় বলেন যে,—"আমরা যাহা ইচ্ছা হয় তাহা করিব, যেরূপ খুসী সেরূপ চলিব, ভোগ-বৃত্তিকে প্রগ্রহ-রহিত উদ্দাম অশ্বের ন্যায় যথেচ্ছভাবে ছাড়িয়া দিব, যদি গুরু বা সাধুর শক্তি থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা (আমরা যথেচ্ছ বিহার করিতে থাকিলেও) সেই শক্তিবলে যাদুবিদ্যা বা mesmerism দ্বারা লোকের চিত্তবৃত্তি পরিবর্ত্তন করিবার ন্যায় আমাদিগকে কুপথ হইতে ফিরাইয়া আনিবেন। আমরা কিন্তু গুরুর কোন কথা শুনিব না, আমাদের যথেচ্ছ পথে চলিতেই থাকিব।" এইরূপ প্রাকৃত-জ্ঞানান্ধ-সম্প্রদায় গুরুকে তাহাদের ভোগের বস্তু জ্ঞান করিয়া এই সকল প্রলাপোক্তি করিয়া থাকে। ইহারা প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাহীন। ইহারা 'সমিৎপাণি' হইতে পারিবে না; সুতরাং কিরূপে 'দীক্ষা' বা 'দিব্যজ্ঞানলাভ' করিবে? ইহাদিগের ধারণা—'আমাদিগের ভোগবৃত্তি চরিতার্থ করার সময় আমরা পরম স্বতন্ত্র থাকিব, কিন্তু ভগবানের উপাসনার বেলায় যিনি আমাদিগকে স্বতন্ত্রতাহীন জড়বস্তুরূপে পরিণত করিতে না পারিবেন, সেই ব্যক্তির কোন শক্তিই নাই!'

ইহাদিগের কর্ণে কখনও অপ্রাকৃত জ্ঞানের কোন কথা প্রবেশ করে নাই। পরম স্বতন্ত্র-বিভুচৈতন্য ভগবান্ কখনও অণুসম্বিত জীবের স্বতন্ত্রতায় হস্তক্ষেপ করেন না, ইহাই তাঁহার পরম করুণার পরিচয়। আধিকারিকদেবতাগণও এরূপ স্বতন্ত্রতা-মহারত্ন লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া মনুষ্যকুলে আবির্ভূত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রাকৃতরাজ্য হইতেও উহার একটী আংশিক দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতে পারে। যেমন রাজতন্ত্র অপেক্ষা প্রজাতন্ত্রশাসনের প্রচলন আবার প্রজাতন্ত্রমধ্যে প্রজাদিগের উপর স্বায়ত্তশাসনের ভার অর্পণ রাজার প্রজাবর্গের প্রতি উত্তরোত্তর অধিক করুণার পরিচয়, তদ্রূপ জীববিশেষের প্রতি (অর্থাৎ মনুষ্যের প্রতি) ভগবানের স্বতন্ত্রতা মহারত্ন দান যে ভগবানের অসীম ও অযাচিত করুণার পরিচায়ক, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? জীব যদি স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করে' তজ্জন্য ভগবান্‌কে দোষারোপ করা যাইতে পারে না।

বিভুসম্বিত ও অণুসম্বিতে এই সাদৃশ্য (উভয়ের মধ্যে স্বতন্ত্রতা) আছে বলিয়াই পরস্পরের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ সুষ্ঠুরূপে স্থাপিত হইতে পারে এবং তজ্জন্যই বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রসের উৎপত্তি হইয়া থাকে। জীবের প্রতি স্বতন্ত্রতা প্রদত্ত না হইলে জীব জড়বৎ চেতনধর্ম্মরহিত হইয়া জড় হইতে নিজের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হইত না। এই দীব্যজ্ঞানের কথা অদীক্ষিত বা অপদীক্ষিত সম্প্রদায় বুঝিতে পারে না।

অদীক্ষিত নাস্তিক ব্যক্তিগণের উপরি-উক্ত বিচার গ্রহণ

করিলে বলিতে হয়, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার স্বতন্ত্র গৌরবিমুখ পুত্র পরিচয়াকাঙ্ক্ষিগণকে এবং তাঁহার শিষ্যাভিমানী কতিপয় ব্যক্তিকে শক্তির অভাব-নিবন্ধনই ভগবদ্বহির্ম্মুখতা হইতে বা শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু আচার্য্য লীলায় তাঁহার শিষ্যাভিমানী স্বতন্ত্র ব্যক্তিগণকে শক্তির অভাব বশতঃই মায়ার কবল হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই। সর্ব্বশক্তিমত্তত্ত্ব মহাবিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈতে বা ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ শ্রীবীরভদ্র প্রভুতে শক্তির অভাব ছিল বা আছে—এরূপ বিচার নাস্তিকতা ও অপরাধ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভগবান্ সর্ব্ব-শক্তিমান্ তথাপি জীবের স্বতন্ত্রতারূপ মহারত্ন - যাহা তিনি প্রদান করিয়াছেন, তাহা তাঁহার একটি মহাদান, ইহা জানাইবার জন্য সামর্থসত্ত্বেও তাঁহার নিজ নিয়ম তিনি নিজেই ভঙ্গ করিতে ইচ্ছা করেন না।

আর এক প্রকার মনোধর্ম্মী বিপ্রলিপ্সাপর সম্প্রদায়ের মত এই যে,—"দীক্ষিত ও অদীক্ষিত, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, বৈকুণ্ঠপথের যাত্রী ও কর্ম্মমার্গে ও নিরয়মার্গের যাত্রীকে সমপর্য্যায়ে গণনা করা হইবে", যেহেতু বহির্ম্মুখ কর্ম্মজড় অজ্ঞানান্ধ অদীক্ষিত বহু ব্যক্তি-গণের সমষ্টি দ্বারা অদৈব সমাজ সংগঠিত হইয়াছে। ঐ সকল সামাজিকগণ অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া যে সকল ভ্রমপূর্ণ মত প্রকাশ করিবে, দিব্যজ্ঞানপথের যাত্রী সেই সকল মতেরই অনুসরণ করি-বেন।"—এই সকল অজ্ঞানান্ধ জীব বা এই সকল অজ্ঞানতাপূর্ণ মতের সমর্থনকারী ব্যক্তিগণ অদীক্ষিত অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান লাভ করেন নাই, তাই তাহারা দীক্ষিত ব্যক্তিকেও তৎসমশীল ধারণা

করিয়া দীক্ষালাভের পূর্ব্বপরিচয়ে পরিচিত ও নির্দিষ্ট করিবার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু বেদান্তভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত ও বৃদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য স্বামিচরণ প্রামাণিকপ্রবর দেবর্ষি নারদের বাক্য উদ্ধার করিয়া লক্ষণ-দ্বারা বর্ণ-নির্দ্দেশের প্রণালীই সুষ্ঠু বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। শ্রুতি, স্মৃতি, পঞ্চরাত্র তথা আচার্য্যগণও তাহাই একবাক্যে সমর্থন করিয়াছেন। মহাভারতীয় অনুশাসনপর্ব্ব "শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি" সংস্কৃতঃ বাক্যে শূদ্রও পাঞ্চরাত্রিক বিধান-অনুসারে দ্বিজত্ব সংস্কার লাভ করেন, এই কথা বলিয়াছেন। শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র "বিনীতানর্থপুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ" প্রভৃতি বাক্যে দীক্ষিত ব্যক্তির উপনয়নসংস্কারের বিধান প্রদান করিয়াছেন। আচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ দিগ্‌দর্শনী টীকায় দীক্ষিত নরমাত্রেরই বিপ্রতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তিনি আবার শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের ২য় খণ্ডের ৪র্থ অধ্যায়ের ৩৭ সংখ্যায় "দীক্ষা-লক্ষণধারিণঃ" বাক্যে টীকায় অতি স্পষ্ট-ভাবে বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন যে, দীক্ষার লক্ষণ—যজ্ঞোপবীত, তুলসীমালা-মুদ্রাদিধারণ। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সম্মানিত শিষ্টাগ্রগণ্য শ্রীরামানুজের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ে অদ্যাপি এই প্রথা প্রচলিত আছে। 'সংস্কার সন্দর্ভ' নামক আর একটি প্রবন্ধে সংস্কারের বিষয় বিশেষভাবে বর্ণনা করা হইবে বলিয়া এস্থলে আর অধিক লেখা হইল না। যাহারা 'দীক্ষিত ব্যক্তিকে 'অদীক্ষিতে'র সহিত অন্তরে সমান জানিয়া কপটতাপূর্ব্বক নিজ অপস্বার্থ সিদ্ধির জন্য মুখে মাত্র 'দীক্ষিত' বলিয়া থাকেন, তাহারাই দীক্ষালক্ষণ উপনয়ন সংস্কারাদির বিরোধী। যেমন

প্রাকৃত বিচারপরায়ণ একশ্রেণীর ব্যক্তির মধ্যে দীক্ষাগ্রহণের পর তুলসীমালামুদ্রাদি গ্রহণের প্রতি বীতরাগ পরিলক্ষিত হয় এবং ঐ সকল ব্যক্তি কপটতা করিয়া বলিয়া থাকেন—'অন্তরে মালাতিলক থাকিলেই হইল, বাহিরে নিজের অভিমান বাড়াইবার জন্য ঐ সকল গ্রহণের আবশ্যকতা কি? কিন্তু তাহাদের হৃদয়ের রুদ্ধ কপাট খুলিয়া দেখিলে বেশ জানা যায় যে তাঁহাদের ঐরূপ চাতুর্য্যপূর্ণ বাক্য-প্রয়োগের অন্তর্নিহিত কারণ আছে। তাহারা বহির্ম্মুখ সমাজ ও লোক ভয়ে এতদূর ভীত যে পাছে ঐরূপ মালা-তিলক ধারণ করিলে বহির্ম্মুখ লোকে তাঁহাদিগকে অসভ্য বা নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তি মনে করেন, এই ভয়ে স্ব-স্ব প্রাকৃত অভিমান সং-রক্ষণের জন্য ঐরূপ কপটতা অবলম্বন করিয়াছেন। তদ্রূপ যাঁহারা বলিয়া থাকেন, দীক্ষার দ্বারা 'দ্বিজত্ব' বা বিপ্রত্ব সিদ্ধ হইল স্বীকার করিলাম, বাহিরে দীক্ষা-লক্ষণ উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিয়া বৃথা অভিমান বৃদ্ধির আবশ্যকতা কি? এই সকল কপট ব্যক্তিরও হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইলে জানা যায় যে, এই সকল লোক নিজ অপস্বার্থে এতদূর অন্ধ এবং বহির্ম্মুখ-লোকভয়ে এতদূর ভীত যে শাস্ত্রোক্ত বিধানকে কোন প্রকারে বাক্‌চাতুরী দ্বারা বাধা প্রদান না করিতে পারিলে তাহাদিগের বনিগ্‌বৃত্তি ও বঞ্চনাবৃত্তি সংরক্ষিত হওয়া দুষ্কর হইয়া পড়ে। এইরূপ অপস্বার্থ-প্রণোদিত হইয়াই দীক্ষাদাতার অভিনয়কারী প্রাকৃত-সাহজিকগণ দীক্ষিত ও অদীক্ষিতকে সমপর্য্যায়ে গণনারূপ অপরাধ হৃদয়ে পোষণ ও বিবিধ ভাবে তাহার প্রশ্রয় প্রদান করিয়া দেশিক ও

তত্ত্বকোবিদগণের কথিত দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান লাভে বঞ্চিত হয় ও অপরকে বঞ্চনা করে। ইহাদের নিজের পাপ ক্ষয় হয় নাই, লোক-দেখান পতিতপাবন গুরু সাজিবার অভিনয় করিলেও স্বয়ং (সমাজে) পতিত হইবার ভয়ে ভীত এবং বস্তুতঃ পাপে মগ্ন থাকিয়া অপরের পাপরাশি বা পাপমূল অবিদ্যা ক্ষয় করিতে অসমর্থ। যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে 'দীক্ষা' বা দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে এই সকল কথা প্রণিধানসহকারে পুনঃ পুনঃ বিচার করা আবশ্যক। দীক্ষা-সম্বন্ধে এই সকল বিচার প্রদর্শন করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

—•—

বৈরাগ্য

ধর্ম্মপ্রবণ ব্যক্তিমাত্রই 'বৈরাগ্য'-শব্দের সহিত সুপরিচিত। বিশেষতঃ, জ্ঞানি-সম্প্রদায়ে 'বৈরাগ্য'ই মোক্ষ-সাধনের প্রধান 'উপায়'। পূর্ণ বৈরাগ্য না হইলে জ্ঞানের অনুশীলনই সম্ভবপর হয় না। তবে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত-সম্প্রদায়ের বৈরাগ্যের আদর্শ একপ্রকার নহে। আবার 'বৈরাগ্য'-শব্দটী বিভিন্ন বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকাশ করে; যথা,—'ঔপাধিক'-বৈরাগ্য, 'অস্থির'-বৈরাগ্য, 'কপট'-বৈরাগ্য, 'শ্মশান'-বৈরাগ্য, 'মর্কট-বৈরাগ্য, 'বক'-বৈরাগ্য, 'ফল্গু'-বৈরাগ্য, 'শুষ্ক'-বৈরাগ্য, 'যুক্ত'-বৈরাগ্য

'[illegible]'-বৈরাগ্য প্রভৃতি শব্দ বৈরাগ্যের বিভিন্ন প্রকার রূপ ও আদর্শের প্রতীক। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে (৫।২) লিখিয়াছেন,—

"যাহারা মাদক-দ্রব্যের বশীভূত হইয়া সংসারে অযোগ্য হয়, নেশার সময়ে একপ্রকার ঔপাধিক হরিভক্তি প্রকাশ করিবার অভ্যাস করে অথবা অভ্যস্ত রতির দ্বারা ভক্তিলক্ষণ প্রকাশ করিতে শিক্ষা করে, অথবা জড়রতির আশ্রয়ে শুদ্ধরতির সাধন-চেষ্টা করে, তাহারা বৈরাগ্য-লিঙ্গ ধারণপূর্ব্বক **ঔপাধিক বৈরাগী** হয়।"

'অস্থির-বৈরাগ্য'-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"কলহ, ক্লেশ, অর্থাভাব, পীড়া ও বিবাহের অঘটনবশতঃ ক্ষণিক বৈরাগ্যের উদয় হয়; তদ্দ্বারা চালিত হইয়া যাহারা ভেক লয়, তাহারাই **অস্থির-বৈরাগী**; তাহাদের বৈরাগ্য থাকে না, তাহারা অতিশীঘ্রই কপট-বৈরাগী হইয়া পড়ে।"

অস্থির-বৈরাগ্য হইতেই 'কপট-বৈরাগ্যে'র জন্ম হয়। এই কপট-বৈরাগ্যই 'শ্মশান-বৈরাগ্য', 'মর্কট-বৈরাগ্য', 'বক-বৈরাগ্য' প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে ও নামে পরিচিত। শ্মশানে শবদাহ-কালে অথবা অত্যন্ত আসক্তির পাত্রের মৃত্যু বা বিশ্বাসঘাতকতা-প্রভৃতিতে যে জীবনের নশ্বরত্ব ও সংসারের অসারত্ব-প্রভৃতির সাময়িক উপলব্ধি ও তজ্জনিত সাময়িক বৈরাগ্যের উচ্ছ্বাস হয়, তাহাই "শ্মশান-বৈরাগ্য"। প্রিয়তমা ভার্য্যার অকাল-মৃত্যুতে কেহ কেহ

উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক হইয়া পড়েন; জীবনে আর দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করিবেন না,—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন। কোন কোন মাতা বা পিতা প্রাণপুত্তলি একমাত্র পুত্রের অকাল-মৃত্যুতে অধীর হইয়া কখনও আর কোন সন্তানের আশা করিবেন না, তীর্থাদিতে বাস করিয়াই জীবন নির্ব্বাহ করিবেন,—এইরূপ সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন; কিন্তু পরমেশ্বরের প্রীতি ব্যতীত জড়াসক্তি বর্জ্জন করা যায় না; তাই কিছুদিনের মধ্যেই সেই উচ্ছ্বাসময় শ্মশান-বৈরাগ্য বা অস্থির বৈরাগ্যের বুদ্‌বুদ্ মিশিয়া যায় এবং উহার প্রতিক্রিয়ারূপে প্রবলা আসক্তি ও জড়রতিতে উদ্যম অধিকতর বর্দ্ধিত হয়।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মর্কট-বৈরাগী বা বক-বৈরাগীর এইরূপ লক্ষণ লিখিয়াছেন,—

"হৃদয়ে বিষয়চিন্তা, গোপনে স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস, কিন্তু বাহিরে কৌপীন, বহির্বাস ইত্যাদি বৈরাগ্যের চিহ্নগুলি ধারণ— এই সকলই **মর্কট-বৈরাগীর** লক্ষণ।"

(অমৃতপ্রবাহভাষ্য, চৈঃ চঃ মঃ ১৬।২৩৮)

"ভক্তিজনিত স্বাভাবিক বৈরাগ্য পূর্ণবলে উদিত হইবার পূর্ব্বে যে গৃহস্থ গৃহস্থধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহারই মর্কট বৈরাগ্য হইবার সম্ভাবনা।" (শ্রীসজ্জনতোষণী ৮।১০, 'মর্কট-বৈরাগী' প্রবন্ধ)

"যে বৈরাগী নাট্যশালায় (আধুনিক সিনেমা হাউস্ প্রভৃতিতে) স্ত্রীলোক দর্শন করেন এবং তাহার ভাবভঙ্গী দেখেন, তিনিও মর্কট-বৈরাগ্য আচরণ করেন, সন্দেহ নাই। যাত্রা

শুনিতে বা থিয়েটার দেখিতে যে বৈরাগী প্রবৃত্ত হন, তিনি দোষী।" (ঐ)

"মর্কট বৈরাগ্য—একটি প্রধান হৃদয়-দৌর্ব্বল্য। এইটিকে যত্নপূর্ব্বক দূর করিলে ভজনে শক্তির উদয় হয়; তখন জীবের কাপট্য, শাঠ্য, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি বদ্ধমূল শত্রুবর্গ পরাজিত হয় এবং শুদ্ধভক্তি উদিত হইয়া জীবকে চরিতার্থ করে।" (ঐ)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে (১।৭) আরও বলিয়াছেন,—

"মুমুক্ষু হইয়া ক্রম ত্যাগ করিলে মর্কট-বৈরাগ্য আসিয়া জীবকে কদর্য্য করিয়া ফেলে।"

"মর্কট-বৈরাগী দুই প্রকার—অর্থাৎ গৃহী মর্কট-বৈরাগী ও অগৃহী মর্কট-বৈরাগী। * * গৃহিদিগের মধ্যে যাহারা অযথা গৃহ-ত্যাগের জন্য ব্যাকুল, তাহারা অত্যাচারী।"

(সজ্জনতোষণী ৮।১০)

"বিষয়রাগকে দমন করিলেই যে বৈকুণ্ঠরাগ হয়, তাহা নহে। অনেক লোক বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া কেবল বিষয়রাগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বৈকুণ্ঠরাগের সম্বর্দ্ধনের চেষ্টা করেন না; তাহাতে শেষে অমঙ্গলই ঘটে।"

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ—প্রেমপ্রদীপ, ৪র্থ প্রভা)

"বিরক্ত বলিয়া পরিচয় দিলেই যে বিরক্ত হয়—এরূপ নয়। যদি ভাবোদয়-ক্রমে ইন্দ্রিয়ার্থে অরুচি স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদের ভেক গ্রহণ করা 'অবৈধ'।"

(শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৫।২)

"বৈরাগ্যবেষাদি ধারণ করিলেই যে বিষয়হীন ভক্ত হওয়া যায়,—এরূপ নয়, কেন না, অনেক স্থলে বৈরাগিগণ বিষয় অর্জ্জন ও বিষয় সঞ্চয় করেন। পক্ষান্তরে, অনেক বিষয়ি-প্রায় ব্যক্তি হৃদয়ে **যুক্তবৈরাগ্যের** সহিত হরিভজন করেন॥" (শ্রীসজ্জন-তোষণী ১০।১১, 'জনসঙ্গ' প্রবন্ধ)

"নিঃসঙ্গ বাবাজীদিগের স্ত্রীলোভ, অর্থলোভ, খাদ্যলোভ ও সুখলোভ অত্যন্ত বর্জ্জনীয়। কোন কোন নিঃসঙ্গ লিঙ্গধারী বৈরাগীর সেইসকল দৌরাত্ম্য থাকায় সমস্ত নিঃসঙ্গ পুরুষের প্রতি বৈষ্ণব-জগতের অবিশ্বাস হইয়া পড়ে।" (শ্রীসজ্জনতোষণী ২।৭, 'ভেক-ধারণ!'-প্রবন্ধ)

কপট বৈরাগ্য অর্থাৎ শ্মশান, মর্কট, বক-বৈরাগ্য প্রভৃতি—রজস্তমোগুণ হইতে উত্থিত। ঐসকল সাময়িক উচ্ছ্বাসময় অস্থির বৈরাগ্য ব্যতীত বর্ণাশ্রমের চরমাবস্থায় আরূঢ় ব্যক্তি-গণেরও আরাধ্য যে জ্ঞানমূলক সাত্ত্বিক বৈরাগ্য, তাহাই শুদ্ধ-ভক্তের পরিভাষায় 'ফল্গু-বৈরাগ্য'। মর্কট-বৈরাগ্য প্রভৃতি মোহ-মূলক, কিন্তু 'ফল্গু-বৈরাগ্য' জ্ঞানমূলক। বিশুদ্ধসত্ত্বের আভাসও খুব বড় কথা। কিন্তু প্রেমভক্তি-যাজিগণের নিকট তাহা তুচ্ছ। যাহা বর্ণাশ্রমের চরমাবস্থায় আরূঢ় ব্যক্তিগণের কাম্য, ভক্তিহীন ব্রহ্মজ্ঞানীর যাহা শ্রেষ্ঠ সাধন, তাহাও প্রেমভক্তের দৃষ্টিতে ফল্গু অর্থাৎ তুচ্ছ। সেই ফল্গু, তুচ্ছ বা শুষ্ক বৈরাগ্যের সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'প্রেমপ্রদীপে'র দ্বিতীয় প্রভায় বলিয়াছেন,—

"প্রত্যাহার ক্রমে ইন্দ্রিয়-সংযম সাধিত হইলেও যদি প্রেমাভাব হয়, তবে তাহাকেও **শুষ্ক ও তুচ্ছ বৈরাগ্য** বলি ; যেহেতু পরমার্থের জন্য ত্যাগ বা গ্রহণ উভয়ই তুল্য-ফলপ্রদ। নিরর্থক ত্যাগ কেবল জীবকে পাষাণবৎ করিয়া ফেলে।"

শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু অতিশয় বিশ্লেষণসহকারে ও সারগর্ভ মিতবাক্যে ফল্গু-বৈরাগ্যের এইরূপ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন,—

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"

(ভঃ রঃ সি, পূ বি ১।২৫৬)

মুমুক্ষুগণের দ্বারা শ্রীহরিসম্বন্ধি দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়াকে প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে যে পরিত্যাগ, তাহাই 'ফল্গু' অর্থাৎ 'তুচ্ছ-বৈরাগ্য' নামে কথিত হয়।

'ফল্গু'-শব্দের অর্থ—অসার, তুচ্ছ। শ্রীহরিসম্বন্ধি 'দ্রব্য' বলিতে শাস্ত্র, শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীনাম, শ্রীমহাপ্রসাদ, শ্রীচরণামৃত প্রভৃতি; শ্রীহরিসম্বন্ধি-'জাতি' বলিতে গুরু, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, গো প্রভৃতি; শ্রীহরিসম্বন্ধি-'গুণ' বলিতে দৈন্য, অযোগ্যতার উপলব্ধি, অমানিমানদত্ব, কারুণ্য, জীবে দয়া, সর্ব্বভূতে আদর প্রভৃতি ; 'ক্রিয়া' বলিতে শ্রীধামে বাস, শ্রীগুরুসেবা, বৈষ্ণবসেবা, শ্রীতুলসী-সেবা, সাধুসঙ্গ, গঙ্গাদি-তীর্থে স্নান, শ্রীধাম-পরিক্রমা প্রভৃতি।

শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সততযুক্ত ব্যক্তিগণের যে বৈরাগ্য, তাহাই 'যুক্ত-বৈরাগ্য'-নামে কথিত। এ-সম্বন্ধে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"

(ভঃ রঃ সিঃ, পূ বি ২।২৫৫)

কৃষ্ণেতর-বিষয়াসক্তি শূন্য হইয়া এবং শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে নির্বন্ধ করিয়া তদীয় সেবানুকূল বিষয়সমূহ গ্রহণ করিলে, তাহাকে 'যুক্ত-বৈরাগ্য' বলে। যুক্ত-বৈরাগী শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধান-স্মৃতির অনুকূল বিষয় গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জন করেন। তিনি অযথা দেহকে কর্ষণ করেন না, বা যুক্তবৈরাগ্যের ছলনায় নিজ-সুখানুসন্ধানপর কোন ভোগেও লিপ্ত হন না। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ সংশয়যুক্ত হইবার লীলা করিয়া শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—শ্রীভগবানের পদযুগলের কামাদি-সন্তাপহারিণী ছায়ায় যাঁহাদের চিত্ত প্রশান্ত হইয়াছে, সেই-সকল মহদ্ব্যক্তির নিশ্চয়ই পুত্রকলত্রাদিতে স্পৃহাযুক্তা মতি হইতে পারে না, তবে কি করিয়া শ্রীপ্রিয়ব্রত স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদিতে আসক্ত হইয়াও সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন,— শ্রীকৃষ্ণেই বা তাঁহাদের কিরূপে অবিচ্ছিন্না মতি হইয়াছিল ? তদুত্তরে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়াছিলেন,—

"বাঢ়মুক্তং ভগবত উত্তমঃশ্লোকস্য শ্রীমচ্চরণারবিন্দ-মকরন্দ-রস-আবেশিতচেতসো ভাগবতপরমহংস-দয়িতকথাং কিঞ্চিদন্তরায়-বিহতাং স্বাং শিবতমাং পদবীং ন প্রায়েণ হিন্বন্তি।"

(ভা ৫।১।৫)

হে রাজন্, আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য ; কিন্তু উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির পরমশোভাযুক্ত শ্রীপাদারবিন্দমকরন্দরসে

যাঁহাদের চিত্ত আবিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা ভাগবতপরমহংসগণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা শ্রীবাসুদেবের কথাকেই পরমকল্যাণরূপা পদবী বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তাই কিঞ্চিন্মাত্র সংসার ভোগাদিরূপ বিঘ্নের দ্বারা তাহা স্থগিত হইলেও, তাঁহারা সেই মঙ্গলময়ী পদবীকে পরিত্যাগ করেন না।

শ্রীব্রহ্মা শ্রীপ্রিয়ব্রতকে বলিয়াছিলেন (ভাঃ ৫।১।১৭), –
"ভয়ং প্রমত্তস্য বনেষ্বপি স্যাদ্—যতঃ স আস্তে সহষট্‌সপত্নঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতের্বুধস্য গৃহাশ্রমঃ কিং নু করোত্যবদ্যম্?"

অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের বনে গমন করিয়াও দ্বিতীয়াভিনিবেশজ ভয় বা সংসার হইতে পারে। যেহেতু সে মন ও বুদ্ধীন্দ্রিয়পঞ্চক—এই ছয় রিপুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াই অবস্থান করে। যিনি পরতত্ত্বে রতিবিশিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন, সেইরূপ জ্ঞানি-ব্যক্তির গৃহস্থাশ্রম আর কি অপকার সাধন করিবে?

"যঃ ষট্ সপত্নান্ বিজিগীষমাণো
গৃহেষু নির্বিশ্য যতেত পূর্ব্বম্।
অত্যেতি দুর্গাশ্রিত ঊর্জ্জিতারীন্,
ক্ষীণেষু কামং বিচরেদ্বিপশ্চিৎ॥"

(ভা ৫।১।১৮)

যিনি শত্রুতুল্য মন ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়—এই ষড়রিপুকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন, প্রথমতঃ তাঁহার গৃহাশ্রমে থাকিয়াই তদ্বিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য। শত্রুবর্গ নির্জ্জিত হইলে যেরূপ তৎপশ্চাৎ দুর্গে বা তদ্ভিন্ন অন্য যে-কোনও স্থানে ইচ্ছামত বিচরণ

করা যায়, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ষড়্‌রিপু জয় করিয়া তৎপশ্চাৎ গৃহে বা বনে, যে কোনও স্থানে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে পারেন। কারণ, পুরুষ প্রথমে দুর্গ আশ্রয় করিয়াই প্রবল বিপক্ষ-সমূহকে জয় করেন।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও এই শ্রীভাগবত-সিদ্ধান্তের প্রতি-ধ্বনি করিয়াই বলিয়াছেন, —

"গৃহে থাকিয়া মর্কট-বৈরাগ্য দূর করত সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণনামানন্দে আত্মার উন্নতি সাধন করুন, —ব্যস্ত হইয়া অকালে বৈরাগ্য গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।"

(শ্রীসজ্জনতোষণী ৮।১০, মর্কটবৈরাগী')

এইসকল কথা শুনিয়া কেহ কেহ এমনও মনে করেন যে, যাঁহাদের গৃহব্রত-ধর্ম্মের প্রতিই নৈসর্গিকী রুচি, তাঁহারাই ঐ-সকল কথাকে বহুমানন করেন। বস্তুতঃ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, "যদহরেব বিরজ্যেত, তদহরেব প্রব্রজেত"—যখনই হৃদয়ে বৈরাগ্যভাব আসিবে, তখনই বহির্গত হইয়া পড়িবে, ইহাতে কালাকাল বা অধিকারের কোন কথা নাই। বস্তুতঃ শ্রুতির তাৎপর্য্য ইহা নহে। হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিজাত বিষয়বিরাগ মহতের কৃপায় উদিত না হইলেও আমরা অনেক সময় শান্তিপ্রিয়তাকেই বৈরাগ্য বা ভগবৎপ্রীতি মনে করি। এ-সম্বন্ধে বহু প্রত্যক্ষ ইতিহাস দৃষ্ট হয়। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার একটি যুবক নবীন উৎসাহে ও নবীন আবেগে সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া ভক্তি প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। যুবকটির মাতা পূর্ব্বেই বিগতা হওয়ায় সম্ভবতঃ

তাঁহার বাল্য বয়সেই সংসারের প্রতি উদাসীনতা উপস্থিত হয়। 'গৌড়ীয়ে'র প্রথম বর্ষে সেই যুবক 'বৈরাগ্য'-শীর্ষক একটী প্রবন্ধও লেখেন। তখন তাহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের পূর্ণ প্লাবন। কেহ উহাতে বিন্দুমাত্র বাধা দিলে যুবকটী বাধাপ্রদানকারীকে 'গৃহব্রত, 'স্ত্রীসঙ্গী', 'স্ত্রীর অঞ্চলধৃক্' প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা কণ্ঠ রুদ্ধ করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করে নাই। যাহাদের প্রতি কিছুটা পোষাকী শ্রদ্ধার আবরণ ছিল, তাহাদিগকে সম্মুখে ঐ ভাবে গালি না দিলেও অন্তরে অন্তরে যে গালি দিত, ইহা বেশ বুঝা যাইত। যুবকটী বৈরাগ্যের বন্যার মধ্যে জীবনতরণীকে ভাসাইয়া দিয়া এক যুগ অতিক্রম করিল। আমাদের বন্ধুগণ অনেকেই বলিলেন,—'সুদীর্ঘ বার বৎসর যখন কাটাইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই সে পরিণামে জয়ী হইবে, তাহার বৈরাগ্যের গতি কখনও রুদ্ধ হইবে না।' প্রবন্ধটীও যাহা লিখিয়াছিল, তাহাতে অস্থির বৈরাগ্যের নিন্দাই ছিল। বন্ধুদের কথা নীরব হইয়া শুনিলাম ; মনে মনে ভাবিলাম, শেষরক্ষাই রক্ষা ; একযুগ কাটিলেও ফাঁড়া কাটে নাই। দেখিতে দেখিতে আঠার বৎসরকাল বৈরাগ্যের স্রোতের মধ্য দিয়া জীবনতরণীটি অনেকটা প্রশংসার সহিতই পাড়ি দিয়া উঠিল। কিন্তু মায়ার এমনই মহীয়সী শক্তি যে, শ্রীগুরুদেবের অপ্রকট-লীলার পরই চক্রান্তকারী কতিপয় অসদ্ব্যক্তির সহিত মিশিয়া সে গুরুবৈষ্ণবের নিন্দারূপ অপরাধে মগ্ন হইল। এবার সেই 'বৈরাগ্য'-প্রবন্ধ-লেখকের হৃদয়ে অপরাধ-ফলে জড়বিলাসের অনেক মোহিনী মূর্ত্তি লুকোচুরি-খেলা খেলিতে আরম্ভ করিল।

বিরাগী এইবার টেড়ী কাটিয়া, পান চিবাইয়া, সিগারেট ফুঁকিয়া, তুলসীর মালা ছিঁড়িয়া, অৰ্দ্ধবিলাত-নামধারিণী রেস্তরাঁগুলোতে অমেধ্য ভোজন করিয়া ও তথায় একটি চাকুরী গ্রহণ করিয়া বিলাসের সমুদ্রে জীবনতরণীটি ভাসাইয়া দিয়া প্রায় বিশ বৎসর পরে একদিন মহানগরীর ফুট্‌পাথে সেই বিরাগী যুবককে দেখিয়া আর চিনিতে পারা গেল না; তবে আমাদিগকে সে চিনিতে পারিল ও পরিচয় দিল। পরে জানিতে পারা গেল,—তাহার বৈরাগ্যের বালাই দূরে গিয়াছে, সে সন্তানের জনক পর্য্যন্ত হইয়াছে। হউক্, উহাতে কিছু ক্ষতি নাই, বরং উহাকে পুণ্যকার্য্য বলিয়াই মানিয়া লওয়া যাইত, কাপট্যের পরিবর্ত্তে সারল্য বলিয়াই স্বীকার করা যাইত, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাহাতে যে ভীষণ বিষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহার গতি কতদূর, তাহা বলা যায় না। সে সাধু-গুরু-বৈষ্ণব নিন্দুক, অপরাধী ও নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছে। শুনিতে পাওয়া গেল, স্ত্রীটী কিছু ধৰ্ম্মপ্রবণা, সেইজন্য ধর্ম্মের বোলচালগুলি একেবারে বিসর্জন করে নাই, স্ত্রীটীকে একটী গুরুবৈষ্ণববিদ্বেষী পাষণ্ডীর নিকট দীক্ষিত করাইয়াছে।

এইরূপ দৃষ্টান্ত যে এই একটী হইয়াছে, তাহা নহে, পঁচিশ বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ বিভিন্ন ভাবের পাঁচশত দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের তথা শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপদেশ সমূহ অধিকারভেদে পালিত না হওয়ায়, কেবল যে অস্থির বৈরাগ্যের অভিনয় হইয়াছে, তাহা নহে, অনেক অপরাধ এবং সর্ব্বাপেক্ষা যাহা বিষময়—শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববিদ্বেষ ও তজ্জাত অশ্রদ্ধা, কুটীলতা, জড়াভিনিবেশ, ভক্তিশৈথিল্য, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা

কামনা এবং প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার বহুরূপী প্রতীকসমূহের উদ্ভব হইয়াছে।

দুই, চার, পাঁচ, ছয় মাস হইতে আরম্ভ করিয়া দুই, চার, পাঁচ, দশ, পনের, বিশ, পঁচিশ বৎসর পরও যখন বৈরাগ্যের ভরা নদী অকস্মাৎ শুকাইয়া যাওয়ার সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে, তখনই উহার কারণ-অনুসন্ধানে বৈরাগ্যের যে পূর্ব্ব ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে যে অস্থির বৈরাগ্যের কারণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে অর্থাৎ 'কেহ কলহ, কেহ ক্লেশ, কেহ অর্থাভাব, কেহ পীড়া, কেহ বিবাহের অঘটনবশতঃ ক্ষণিক নির্ব্বেদ, কেহ বিমাতার বাক্যবাণ, কেহ পত্নীর দ্বিচারিণীত্ব, কেহ নিজের পশুচরিত্র প্রভৃতির পরিণাম দেখিয়া' অস্থির বৈরাগী সাজিয়াছে। যদি অবন্তীনগরীর ত্রিদণ্ডীভিক্ষুর ন্যায়, অথবা শুদ্ধোধন পুত্র সিদ্ধার্থের ন্যায় ঐরূপ হৈতুক বৈরাগ্যও ভবিষ্যৎ জীবনে একান্ত শরণাপত্তি ও শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিতে পর্য্যবসিত হইত এবং 'শেষরক্ষাই রক্ষা'—এই নীতি-অনুসারে হরিভজনে উত্তরোত্তর রতিবিশিষ্ট করিত, শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের চরণে কোন-রূপে অপরাধের লেশও উদয় না করাইত, অপিচ রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিত বেশ্যার প্রতি বা নলকুবর-মণিগ্রীবের প্রতি নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বা শ্রীনারদ গোস্বামীর যাদৃচ্ছিকী কৃপার ন্যায় মহতের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করাইত, তাহা হইলে, 'সাত খুন মাপ' হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইত।

অবশ্য ইহা বলা হইতেছে না যে, যখন প্রত্যেক অনর্থযুক্ত সাধক হৃদয়েই ন্যূনাধিক সম্ভোগ-পিপাসা বর্ত্তমান, তখন সকলেই দেহ-গেহাসক্ত সাধারণ প্রাণিজগতের ন্যায় মিথুনধর্ম্মে লিপ্ত থাকুক্। এইরূপ নরকদ্বারে প্রবেশের কথা কোন মহাজন ত' বলেনই না, অধিকন্তু শ্রীমদ্ভাগবত উর্দ্ধবাহু হইয়া নিরয়বর্ত্ম-গৃহান্ধকূপ হইতে জীবকে সতত রক্ষা করিবার জন্য কত সুতীব্র-ভাষায় না উপদেশ প্রদান করিতেছেন। কিন্তু তৎসঙ্গে শ্রীঅর্জ্জুনের প্রতি শ্রীশ্রীগীতোক্ত এই মহামূল্য উপদেশটী স্মরণ রাখিতে হইবে,—

"বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥"

(গীঃ ২-৫৯)

[যদি বল, ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ে অপ্রবৃত্তিই স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ হইতে পারে না; কেননা জড়, আতুর, উপবাস-পরায়ণ ব্যক্তিগণেরও বিষয়ের প্রতি প্রবৃত্তি থাকে না, ইহাতে বলিতে-ছেন—] যিনি ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় গ্রহণ করেন না, এইরূপ জীবের নিকট ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু আসক্তি নিবৃত্ত হয় না, পরন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়বাসনা পরতত্ত্বকে অনুভব করিয়া আপনিই নিবৃত্ত হয়।

বৈরাগ্য কেন উদয় হয়, তাহার কারণ কি, তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত (১১।১৯।১৭) বলিতেছেন,—

"শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ম্।
প্রমাণেষ্বনবস্থানাদ্বিকল্পাৎ স বিরজ্যতে॥"

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি (১) শ্রুতি ঘটাদির ভঙ্গুরত্বরূপ (২) প্রত্যক্ষ ; লোকের ও জগতের বিনাশশীলতার (৩ ইতিহাস বা ঐতিহ্য এবং সর্ব্বকালে জগতের এইরূপ নশ্বরত্ব, হেয়ত্ব ও দুঃখদায়কত্বের (৪) অনুমান-রূপ প্রমাণ-চতুষ্টয় হইতে ভেদ বাধিত হওয়ায় জীব নশ্বর বস্তুর প্রতি বিরক্ত হইয়া থাকেন।

এই বিরাগ যদি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্ত হইয়া উদিত হয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি বা প্রীতি এবং অন্যত্র অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির প্রতিকূল বিষয়ে বিরক্তির উদয় করায়, তবেই তাহা 'যুক্ত-বৈরাগ্য'-নামে অভিহিত হয়। পরতত্ত্বে প্রীতিরসের আস্বাদন না পাইয়া কেবল জড়রস-পরিত্যাগের নীতি জড়রসের প্রতি আসক্তির প্রকার-ভেদ মাত্র। অমৃত পাইলেই মনুষ্য চিটে গুড়ে আসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারে, তৎপূর্ব্বে কৃত্রিমভাবে পরিত্যাগের চেষ্টার দ্বারা কেবল শুষ্কত্যাগ হইতে পারে, কিন্তু কোন স্থায়ী-রসের আস্বাদন পাওয়া যায় না। স্থায়ী-রসের আস্বাদন-প্রাপ্ত হইলে সেই অখণ্ডরসকে কেহ কখনও পরিত্যাগ করিতে পারে না। তাই শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
নবনবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমাণে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥"

(ভ. রঃ সিঃ, দঃ বিঃ ৫।৭২)

অহো! যখন হইতে আমার চিত্ত নবনবরসধাম শ্রীকৃষ্ণপাদ-পদ্মে রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন হইতেই নারী-সঙ্গমের কথা স্মরণপথে উদিত হইলে তাহাতে মুখবিকার ও অত্যন্ত থুৎকার করিতে ইচ্ছা হয়।

শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে! বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ॥"

(ভঃ রঃ সিঃ, পূ বিঃ ২।২৩৯)

হে সখে! যদি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে রঙ্গ করিবার তোমার লোভ থাকে, তবে শ্রীকেশিঘাটের নিকটবর্ত্তী ঈষদ্ধাস্যযুক্ত, ত্রিবক্রতা-শালী, বাম অঞ্চলে নেত্র-কটাক্ষবিশিষ্ট, অধরপঙ্কজকিশলয়ে বংশীধারী, ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা উৎকৃষ্ট-শোভান্বিত শ্রীগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তির দর্শন করিও না। তাৎপর্য এই যে, শ্রীগোবিন্দের শ্রীমুখারবিন্দ-দর্শনের রস একবার মাত্র অনুভব করিলে ইতররসের প্রতি বিরাগ অনিবার্য্য।

পরতত্ত্ব-রসাকৃষ্ট হইয়া যে বিরসের প্রতি স্বাভাবিক বৈরাগ্য, তাহা কোনপ্রকার প্রতিকূল অবস্থা বা বিঘ্নের দ্বারা প্রতিহত হয় না। তাই শ্রীল রঘুনাথ দাস-গোস্বামী প্রভুর প্রসঙ্গে শ্রীল রঘুনাথের পিতা শ্রীগোবর্দ্ধনদাস নিজ পত্নীকে বলিয়াছিলেন,—

"ইন্দ্রসম-ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরা-সম।
এ-সব বান্ধিতে নারিলেক যাঁ'র মন॥
দড়ির বন্ধনে তাঁ'রে রাখিবা কেমতে?
জন্মদাতা পিতা নারে 'প্রারব্ধ' খণ্ডাইতে॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হঞাছে ইঁহারে।
চৈতন্যচন্দ্রের বাতুল কে রাখিতে পারে?"

(চৈ: চ: অ: ৬।৩৯-৪১)

নিজের চেষ্টায় কেহ বিষয় ত্যাগ করিতে পারে না। 'বিষয়-ত্যাগ' বা 'বৈরাগ্য' বলিতে সংসার বাসনা হইতে নির্মুক্তি। এজন্য শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

"আর কবে নিতাই-চাঁদ করুণা করিবে?
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে;" (প্রার্থনা)

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল রঘুনাথের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"* * * *কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে।
তোমারে কাড়িল বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্ত হৈতে॥"

(চৈ: চ: অ: ৬।১৯৩)

তদুত্তরে শ্রীল রঘুনাথ বলিয়াছিলেন,—

"* * * *কৃষ্ণ নাহি জানি।
তব কৃপা কাড়িল আমা,—এই আমি মানি॥"

(ঐ—১৯৪)

যেস্থানে প্রাকৃত কোন কারণ অথবা জগতের নশ্বরতা

বৈরাগ্যের জনকজননী, তথায়ই বৈরাগ্যের অস্থিরতা ; তাহাই ভক্তির প্রতিকূল বৈরাগ্য ; আর যে-স্থানে ভক্ত ও ভগবানের কৃপা ও পরতত্ত্বের প্রীতি ও রতির অনুগামিরূপে বৈরাগ্যের উদয়, তাহাই—'প্রকৃতবৈরাগ্য'। তাই শ্রীমদ্ ভাগবত বলিয়াছেন, –

"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥

(ভাঃ ১।২।৭)

ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে নিরন্তর সুখানুসন্ধানাত্মক স্মৃতিময় আবেশ প্রযুক্ত হইলে অতি শীঘ্রই ভক্তি ব্যতীত অন্যত্র অর্থাৎ ভোগে ও ত্যাগে বৈরাগ্য এবং শুষ্কতর্কাদির অগোচর উপনিষৎ প্রতিপাদ্য জ্ঞানের উদয় হয়। সেই শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধবৈরাগ্য ভক্তির অনুগামী।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু মহতের কৃপালব্ধ, ভক্তির অনুগামী বৈরাগ্যের কথা এইভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

"মহাসম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়েকুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥"

(স্তবাবলী, শ্রীচৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ, ১১শ শ্লোক)

আমি মহা কুজন হইলেও তিনি আমাকে পতিত দেখিয়া কৃপাপূর্ব্বক সম্পৎ ও স্ত্রী (পাঠান্তরে বিষয়রূপ দাবাগ্নি) হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীস্বরূপের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে

প্রচুর আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যিনি আমাকে স্বীয় বক্ষের শ্রীগুঞ্জামালা ও শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা দান করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে মত্ত করুন্।

"বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী, সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি ॥"

(বিলাপকুসুমাঞ্জলি, ৬ষ্ঠ শ্লোক)

যিনি সর্ব্বদা পরদুঃখেকাতর ও দয়ারসাগর, আমি অনিচ্ছুক হইলেও যিনি যত্ন-সহকারে অজ্ঞানান্ধ আমাকে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস পান করাইয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধজ্ঞানদাতা শ্রীসনাতন-প্রভুতে আমি প্রপন্ন হইতেছি।

মর্কটবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্য নিজ সুখানুসন্ধানমূলক অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা, শান্তি বা মুক্তিরূপ উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধির সাধক ; আর যুক্তবৈরাগ্য—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধান মূলক। মহতের কৃপা ব্যতীত যুক্তবৈরাগ্যের উদয় হয় না। মহতের কৃপার প্রথম লক্ষণই পরতত্ত্বের সুখ কি প্রকারে হয়, সেই চিন্তা বা অনুসন্ধান'। নরকে পাতিত করিয়াও যদি শ্রীকৃষ্ণ সুখী হন, যুক্তবৈরাগী সেইরূপ নরক হইতেও উদ্ধার পাইতে চাহেন না, স্বর্গ মুক্তি শান্তি-প্রভৃতি ত' দূরের কথা। যুক্তবৈরাগীর হৃদয়টী দৈন্যে পরিপূর্ণ, আর মর্কট-ফল্গুবৈরাগীর হৃদয়ে দম্ভদৈত্যের বাসস্থান। যুক্ত বৈরাগী বাহিরে বিষয়ি প্রায় হইয়াও 'শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধান হইল না' বলিয়া সর্ব্বদা আর্ত্ত। তাঁহার হৃদয়টী বিপ্রলম্ভাগ্নির আগার। যুক্তবৈরাগ্যের সিদ্ধি-পরাকাষ্ঠায় এইরূপ চিত্তবৃত্তি

প্রকাশিত হয়। তিনি তখন আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে বিষয়-বিগ্রহের সুখানুসন্ধানে তন্ময় হইয়া আশ্রয়বিগ্রহের কৃপা ব্যতীত স্বয়ং বিষয়বিগ্রহের প্রতিও বিরাগী হইয়া পড়েন, মুক্তি ত' দূরের কথা। যদি আশ্রয়বিগ্রহের সুখে সুখী হইতে না পারিলেন, আশ্রয়বিগ্রহের সহিত বিষয়বিগ্রহের মিলন করাইতে না পারিলেন, তবে বিষয়বিগ্রহ দ্বারা পৃথগ্‌ভাবে নিজেকে নন্দিত করিতে চাহেন না,—ইহাই যুক্তবৈরাগ্যের সিদ্ধি-পরাকাষ্ঠা।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—
"মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি' প্রীত হন গৌর ভগবান্॥"
(চৈঃ চঃ অঃ ৬।২২০)

সেই 'বৈরাগ্য' কি? সেই 'বৈরাগ্য' বলিতে 'বিশেষ রাগ' বুঝায়। রাগময়ী ভক্তি-ব্যতীত শ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতি হয় না। যাঁহারা এই রাগময়ী ভক্তির উপাসক, তাঁহারাই সর্ব্বহারা 'গৌড়ীয়-বৈরাগী'। এই বৈরাগ্য শ্রীশ্রীশুক-সনক, শ্রীশ্রীব্যাস-নারদ, শ্রীউদ্ধবাদি মহাজনেরও নিত্য আরাধ্য।

—০—

সেবা-বিঘ্ন ও সেবোৎসাহ

যাহারা ধর্ম্মকে সখের জিনিষ, আরামের জিনিষ, বিশ্রামাগারের উপভোগ্য-ব্যাপার বা জাগতিক শান্তির বাহন-বিশেষ মনে করেন, তাহারাই বিঘ্ন-বহুল জগতের প্রতিযোগিবস্তুরূপে ধর্ম্মানুষ্ঠানকে দেখিতে চাহে। কিন্তু ভগবানের সেবার পথ সেরূপ সখের বা আরামের বীথিকা নহে, তাহা পুষ্পাস্তরণে আচ্ছাদিত নহে। গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদের ভাষায়—

"শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কোটিকণ্টকরুদ্ধঃ।"

অর্থাৎ পরম শোভাময় ভক্তিপথ কোটিকণ্টকের দ্বারা অবরুদ্ধ; কোটি বিঘ্ন দ্বারা আবৃত। তজ্জন্যই ইহার সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য। যে জিনিষ যত মূল্যবান্, যে জিনিষ "সর্ব্বগুহ্যতম', তাহা তত বিঘ্ন-বহুল ও কোটি আবরণে আবৃত। এইজন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ৮।১৭ সংখ্যাধৃত তন্ত্রবচন)

জ্ঞান-চেষ্টা-দ্বারা সহজে মুক্তি হয়, যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা স্বর্গভোগাদি সুলভ হয়; কিন্তু সহস্র সহস্র সাধন করিলেও সহজে হরিভক্তি লাভ হয় না।

"অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥"

(ভাঃ ৫।৬।১৮)

সেই ভগবান্ মুকুন্দ ভজনকারিগণকে মুক্তি প্রদান করেন, কিন্তু কখনও তাঁহাদিগকে সহজে ভক্তিযোগ প্রদান করেন না।

"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেম ভক্তি না দেন, রাখেন লুকাইয়া॥"
(চৈঃ চ আঃ ৮।১৮)

কৃষ্ণ ভক্তকে যদিও ভুক্তি-মুক্তি দিয়া অবসর লাভ করেন, তথাপি কখনও ভক্তি প্রদান করেন না। সেই সর্ব্বগুহ্যতম রত্নটিকে লুকাইয়া রাখেন।

এইরূপ সুগোপ্য ভগবদ্ভক্তি, আরামের কোলে থাকিয়া কখনই লাভ করা যায় না। ধাপ্পাবাজী, লোকের চক্ষে ধূলি-নিক্ষেপ, পাটোয়ারি-বুদ্ধি, ওকালতী প্যাঁচ, কপটতা, দ্বিজিহ্বতা, অপরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া নিজ অপস্বার্থ সাধন-চেষ্টা, লোক-দেখান ভক্তির ভাণ, মর্কটের ন্যায় বৈরাগ্য ও তপস্যার প্রদর্শনী উন্মোচন, সকল লোককে বোকা বানাইয়া "নিজের দাঁড়ে ছোলা"-নীতি অবলম্বন, বাহ্যে নির্ব্বিষয়ের ভাণ দেখাইয়া অন্তরে বিষয়ের প্রতি অত্যাসক্তি, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার উৎসাহকে সেবোৎসাহ বলিয়া জাহির করিবার চেষ্টা, হরি-গুরু-বৈষ্ণব বা শালগ্রাম দিয়া বাদাম-ভাঙ্গা, তাঁহাদের সুপারিসের দ্বারা ভক্ত-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের অতৃপ্ত আকাঙ্খা, যুক্ত-বৈরাগ্যের নামে বিষয়-ভোগ, নিস্পৃহতার মুখোসে কুবিষয় ভোগের আকাঙ্খা প্রভৃতি বৃত্তি চিত্তরাজ্য অধিকার করিলে কখনই অহৈতুকী ভক্তির আভাসও আমাদের হৃদয়ে উদিত হইতে পারে না। গুরু ও কৃষ্ণের সহিত চালাকী করিয়া, তাঁহা-

দিগকে ঠকাইয়া এপর্যন্ত কেহ ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে পারে নাই বা কোনদিন পারিবে না। নিজের সেবার বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া বা বহুরূপী ভাড়াটিয়া স্তাবকগণের দ্বারা স্তুত হইয়া, কিংবা সুপারিস-পত্রের দোহাই দিয়া কৃষ্ণের অহৈতুকী ভক্তির ভাণ্ডার কেহ লুট করিতে পারে নাই। কৃষ্ণ তাঁহার এই সর্ব্বগুহ্যতম ভক্তি-সম্পদ্‌কে তাঁহার নিজস্ব সুগুপ্ত মঞ্জুষার মধ্যে নানা বিঘ্ন-বহুল ও কোটিকণ্টকরুদ্ধ করিয়া সংরক্ষণ করিয়াছেন। কাহাকেও সর্ব্বতো-ভাবে না যাচাইয়া, কঠোরতম অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে পাতিত না করিয়া কৃষ্ণ এই সর্ব্বগুহ্যতম বস্তু প্রদান করেন না। বন্ধু, সখা, আত্মীয় পাণ্ডবগণকে কৃষ্ণ কত কঠোরতম অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে—বিপদের মধ্যে পাতিত করিয়াছিলেন! কৃষ্ণ যাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা ছিলেন ও নিত্যকাল আছেন, সেই পাণ্ডবগণ সহস্র সহস্র বিপদ্‌রাশির মধ্যে কেন পতিত হন? কেনই বা দুর্য্যোধনাদির অকথ্য উৎপীড়ন সহ্য করেন? বাৎসল্য-রসের রসিক বসুদেব-দেবকী কেনই বা কংসের অত্যাচার উৎপীড়নের মধ্যে পতিত হন—কারারুদ্ধ হন? শ্রীকুন্তীদেবী কৃষ্ণকে স্তব করিয়া বলিতেছেন,—

> "যথা হৃষীকেশ খলেন দেবকী
> কংসেন রুদ্ধাতিচিরং শুচার্পিতা।
> বিমোচিতাহঞ্চ সহাত্মজা বিভো
> ত্বয়ৈব নাথেন মুহুর্বিপদ্গণাৎ॥
> বিষান্মহাগ্নেঃ পুরুষাদদর্শনা-
> দসৎসভায়া বনবাসকৃচ্ছ্রতঃ।

মৃধে মৃধেঽনেকমহারথাস্ত্রতো
দ্রৌণ্যস্ত্রতশ্চাস্ম হরেঽভিরক্ষিতাঃ॥
বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্‌গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভব দর্শনম্‌॥"

(ভাঃ ১।৮।২৩—২৫)

হে ইন্দ্রিয়াধিপতে, যেরূপ তোমার মাতা দেবকীকে ক্রূর কংস বহুকাল যাবৎ কারারুদ্ধ করায় তিনি শোকে বশীভূত হইলে তুমি তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়াছিলে, তদ্রূপ হে বিষ্ণো, পুত্র পাণ্ডবগণের সহিত আমার রক্ষকরূপে বিপদ্‌রাশি হইতে তুমি বারংবার মুক্ত করিয়াছ। হে শ্রীহরি, তুমি আমাদিগকে বিষ-মিশ্রিত মোদকজনিত মৃত্যু হইতে, জতুগৃহদাহ ও হিড়িম্বাদি রাক্ষসগণের দর্শন হইতে, দ্যুতস্থান ও বনবাসরূপ কষ্ট হইতে, প্রত্যেক যুদ্ধেই ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি বহু মহারথীর প্রাণ-ঘাতী অস্ত্রসমূহ হইতে ও সম্প্রতি অশ্বত্থামার এই ব্রহ্মাস্ত্র হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছ। হে জগদ্‌গুরো, সেই সেই বিষয়ে আমাদের পূর্ব্বোক্ত বিপৎসমূহ নিত্যকাল হউক্‌। সে সকল বিপদে সংসার-দর্শন নাই, কেবল তোমারই দর্শন-সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে।

কুন্তীর এই উপদেশ সমগ্র শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ের ভক্তিপথের আলোকস্তম্ভ-স্বরূপ। যাঁহার সত্য সত্য কৃষ্ণভজন আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহারই নিকট নানাপ্রকার বিঘ্নবিপদ্‌রাশি কৃষ্ণেচ্ছায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার হৃদয়ের অকপটতা পরীক্ষা করিয়া থাকে।

যাঁহারা এই বিপৎ-সমূহকে কৃষ্ণের "অনুকম্পা" জানিয়া কায়মনো-বাক্যে হরি-গুরু-বৈষ্ণবে নমস্কার-বিধান-পূর্ব্বক একান্ত আনুগত্য-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হন, তাঁহারাই মুক্তিপদে দায়ভাক্ হইতে পারেন।

বিঘ্ন ও বিপৎসমূহ কোটিগুণ প্রগতিতে আমাদের হরিভজনের তীব্রতা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। বিপদের অগ্নিপরীক্ষা আমাদের সম্ভোগ-পিপাসা ও অনর্থরাশিকে অনায়াসে ও অজ্ঞাতসারে দগ্ধ করিয়া থাকে। বিপদের মধ্যেই বিজয়ের জয়মাল্য রহিয়াছে।

শুদ্ধভগবদ্ভক্তগণ কখনও বিপদ্ বা বিঘ্নের নিবৃত্তিরূপ শান্তি অর্থাৎ শান্তরসের কামনা করেন না। শান্তরস নির্ব্বিশেষবাদে পরিণত হইতে পারে; কিন্তু যেখানে বিপদ্‌রাশি আমাদিগকে অধিকতর সেবারাজ্যে আকৃষ্ট করে, সত্যের প্রতি ঐকান্তিক করিয়া তুলে, অনায়াসে দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনে দৃঢ়ব্রত করিয়া দেয়, সেইখানে বিপদ্ বিপ্রলম্ভেরই উদ্দীপক হইয়া থাকে। বিপদের মধ্যে বিপ্রলম্ভের অনুভূতি কৃষ্ণসেবানন্দকে অধিকতর পুষ্ট ও সুদৃঢ় করিয়া থাকে।

সেবার বিঘ্ন-সমূহ অহৈতুক সেবকের সেবোৎসাহই বর্দ্ধন করে। বিঘ্ন ও বিপদ্ না থাকিলে সেবা কেবল একঘেয়ে ও বিচিত্রতা-হীন হইয়া যাইত। এইজন্য প্রত্যেক আচার্য্যের অভ্যুদয়-লীলার সেবা করিবার জন্য সহস্র সহস্র বিপদ্-বিঘ্নরাশি কৃষ্ণেচ্ছায়ই উদিত হয়। অসুরগণের আসুরিক-চেষ্টা-সমূহ, পাষণ্ডগণের পাষণ্ডতা, দুর্ম্মুখগণের কুৎসিত নিন্দা, কুচক্রিগণের নানা-প্রকার কুচক্র ও ষড়যন্ত্র, বিষয়-মদান্ধগণের আস্ফালন ও সাধু-

নির্য্যাতনের উদ্যম, কপটিগণের কুনাট্য কৃষ্ণেচ্ছায়ই প্রত্যেক আচার্য্যের অভ্যুদয়-লীলায় আত্মপ্রকাশ করিয়া আচার্য্য লীলার পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। কৌরব ও পাণ্ডবগণের সমর-ক্ষেত্রে সর্ব্বগুহ্যতম ভক্তির সন্দেশ আবিষ্কৃত হয়। কৃষ্ণ তাঁহার নারায়ণী সেনাকে একদিকে ও স্বয়ং নিজেকে আর একদিকে সংস্থাপন করিয়া সংগ্রাম ও দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়াই সত্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেন, এবং দুর্য্যোধনের দাম্ভিকতা ও অর্জ্জুনের শরণাগতি-ধর্ম্ম প্রকাশ করেন। বিপদ্ ও বিঘ্নরাশির মধ্যেই শুদ্ধভক্তগণের সেবোৎসাহ কোটিগুণে পরিবর্দ্ধিত হয়, আনুগত্য-ধর্ম্ম কোটিগুণে আত্মপ্রকাশিত হয়, দৈন্য কোটি কোটি গুণে প্রকটিত হয়, ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, চিত্তদর্পণ পরিমার্জ্জিত হয়, শ্রেয়ঃকৈরব-চন্দ্রিকা বিতরিত হয়, পরবিদ্যার জীবন লাভ হয়, বিপ্রলম্ভানন্দসাগর উদ্বেলিত হয়, প্রতিপদে পূর্ণামৃতের আস্বাদন হয় ও সমস্ত আত্মা সেবারসে অভিষিক্ত হয়।

শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু উপদেশামৃতের তৃতীয় শ্লোকে উপদেশ দিয়াছেন,—

> “উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
> সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্‌ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥”

অর্থাৎ উৎসাহ, দৃঢ়তা, ধৈর্য্য, ভক্তিপোষক কার্য্যানুষ্ঠান, সঙ্গত্যাগ ও সদাচার বা সদ্বৃত্তি—এই ষড়্‌গুণ হইতে ভক্তি সিদ্ধ হন।

এই ছয়টী গুণই অহৈতুক সেবাভিলাষীর হৃদয়ে বিপদ্ ও বিঘ্নরাশির মধ্যে স্বতঃ আবির্ভূত ও পরিস্ফুট হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধ সত্য। বিপদের মধ্যে যে হরি-গুরু-বৈষ্ণবে শরণাগতিতে উৎসাহ ও বল পাওয়া যায়, তাহা অন্যত্র দুর্লভ। বিপদের মধ্যে দৃঢ়তা ও ধৈর্য্য স্বভাবতঃই সেবকগণের হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে। বিপদে যে-প্রকার আর্ত্তি সহজেই হৃদয়ে উদিত হয়, শরণাগতির ষড়্‌বিধ লক্ষণ চিত্তে অধিষ্ঠিত হয়, এইরূপ আর কিছুতেই হয় না। বিপদের মধ্যে আমরা ভক্তিপোষক আচার-সমূহে অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, সম্পদের মধ্যে সম্ভোগের মায়াবী মূর্ত্তি আমাদিগকে ভক্তিপোষককার্য্য-সমূহে অন্যমনস্ক ও বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়; কিন্তু আক্রমণকারিগণের আক্রমণ ও বিপদের কষাঘাত অনর্থযুক্ত আমাদিগকে সাধুমার্গানুগমন করিবার জন্য প্ররোচিত করিয়া থাকে। আমরা বিপদের মধ্যে দুঃসঙ্গ ত্যাগে কোটিগুণ দৃঢ়তা লাভ করিয়া থাকি। সদাচার ও সদ্‌বৃত্তি-সমূহ বিপদরাশি সহ্য করিবার বন্ধুরূপে আমাদের চিত্তে উদিত হয়।

বিপদের মধ্যে যাহাদের হৃদয়ে এই ষড়্‌গুণ, ছয় সৎসঙ্গ ও ষড়্‌বিধ শরণাগতি উদিত না হয়, তৎপরিবর্ত্তে যাহাদের ষড়্‌রিপুর চাঞ্চল্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, দুর্ব্বলতা, জাড্য, নিরুৎসাহ, শিথিলতা, অন্যাভিলাষ; মৎসরতা, আনুগত্যহীনতা ও নানাবিধ নাস্তিকতার উদয় হয়, তাহারা যে অসত্য পথাশ্রিত, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সৎ ও অসৎ উভয় পথাশ্রিত ব্যক্তিগণের নিকটই বিপদ্ উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু সৎপথাশ্রিত ব্যক্তিগণ

বিপদ্‌কে ভগবানের পরম অনুকম্পা বলিয়া বরণ করেন এবং বিপদের মধ্যে ভগবানের মঙ্গলময় হস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া ষড়্‌বিধা শরণাগতি ও ছয় সৎসঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ও সেবোৎসাহাদি ছয়গুণে বিভূষিত হন। আর অসৎ-পথাশ্রিত ব্যক্তিগণ ষড়্‌রিপুর তাণ্ডবের ক্রীড়নক হইয়া পড়ে।

বিপদের মধ্যেই কপট ও অকপটের, আসল ও নকল বন্ধুর বাছাই হয়—মৌখিক ভক্তি ও আন্তরিক ভক্তির পরীক্ষা হয়—সখের ধার্ম্মিক ও বাস্তব-ধার্ম্মিকের যাচাই হয়। কাজেই ভক্তি-রাজ্যে বিপদের মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান আর কিছুই নাই। এইজন্যই বুঝি কুন্তীদেবী কৃষ্ণের নিকট চিরকাল বিপদের প্রার্থনা করিয়াছেন। শুদ্ধভক্তগণের হৃদয়ে বিপদের মধ্যে চিত্তে আতঙ্ক উপস্থিত হয় না ; কারণ, তাঁহারা শরণাগত। নারায়ণের ভক্তগণ কোন কিছু হইতেই ভীত নহেন। তাঁহারা স্বর্গ ও মোক্ষ উভয়কেই নরকতুল্য দর্শন করিয়া থাকেন। বৃক্ষতলবাস ও প্রাসাদধিকারী অট্টালিকা-বাস—উভয়ের মধ্যেই তাঁহারা কৃষ্ণ সেবা প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—

"বরং হুতবহজ্বালা-পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তা-বিমুখজনসংবাসবৈশসম্॥"

—(ভঃ রঃ সিঃ, পূঃ বিঃ ২।৩১ শ্লোকধৃত কাত্যায়ন-সংহিতা-বাক্য।)

প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাবিশিষ্ট পিঞ্জরে অবস্থান করিতে হয়, সেও বরং ভাল, তথাপি যেন কৃষ্ণচিন্তাবিমুখ-জনের সহবাসরূপ বিপদ্ উপস্থিত না হয়।

আনুগত্যহীনতার ন্যায় ভীষণতম বিপদ্ আর কিছুই নাই। শরণাগতের আপাত বিপদ্ বা বিঘ্ন সমস্তই পরমমঙ্গলের অগ্রদূত। শরণাগত ও আশ্রিতব্যক্তি সর্ব্বদা সুরক্ষিত, সৎসঙ্গের প্রতি আনুগত্য ধর্ম্মযুক্ত। অসৎসঙ্গ পরিত্যাগে দৃঢ়নিষ্ঠ ব্যক্তিই সর্ব্বদা সংসারের বিপদ্ হইতে মুক্ত। যাহারা বিষয়ী, দুর্জ্জন বা জাগতিক প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তির বল-ভরসাকে বহুমানন করেন বা ঐসকল প্রাকৃত বলের দ্বারা সাধুগণকে নির্য্যাতিত ও তাঁহাদিগের ভজনপথ বিঘ্নসঙ্কুল করিতে চাহেন, তাহাদের জাগতিক বল-ভরসা কিছুতেই তাহাদেরকে রক্ষা করিতে পারে না। বিষয়ী বা জাগতিক বলীর বল সাধুগণের কেশস্পর্শও করিতে পারে না।

"তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্-
ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধ-সৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥"

(ভাঃ ১০।২।৩৩)

হে মাধব! আপনার ভক্তগণ আপনাতেই বদ্ধসৌহৃদ। তাঁহারা কখনই স্থানভ্রষ্ট হন না অর্থাৎ মুক্তাভিমানীদিগের ন্যায় অধঃপতিত হন না। তাঁহারা আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বিঘ্নকারীদিগের মস্তকে পদক্ষেপ করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন।

এই কথাগুলি কেবল কবির কবিত্ব, বা অবাস্তব নহে, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। 'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'—গীতার এই বাক্য বর্ণে বর্ণে

সত্য। অহৈতুক সেবকের কখনও বিনাশ নাই। শ্রীচৈতন্য-বাণী-সেবক-সম্প্রদায়ের কেশ স্পর্শ করিতে পারে, ত্রিলোকে এইরূপ দেবতা বা অসুর নাই। তবে যে স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভু জগাই মাধাইর দ্বারা লাঞ্ছিত হইবার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস বাইশবাজারে প্রহৃত হইবার লীলা প্রকট করিয়াছিলেন, শ্রীব্যাসাদি ভক্তবৃন্দ নানাভাবে উপদ্রুত হইবার আদর্শ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা লোক-শিক্ষার জন্য। তাঁহারা সেই সকল আদর্শ স্থাপন করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, সেবায় বিঘ্ন ও বিপদে সেবার অকৃত্রিমতাই পরীক্ষিত হয়, তদ্দ্বারা সেবায় দৃঢ়তা ও সত্যে অনুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আমাদের প্রভুগণ যখন ঐরূপ বিঘ্ন ও বিপদের মধ্যে জয়যাত্রায় অভিযানের আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন, তখন আমরা তাঁহাদের পদসংলগ্ন রেণূ হইয়া—তাঁহাদের পদত্রাণের একটি ধূলিকণা রূপে তাঁহাদের শ্রীচরণতলে নিত্য সংযুক্ত থাকিয়া কোটিকণ্টকরুদ্ধ শ্রীভক্তিমার্গে বিচরণকালে তাঁহাদের নিত্য জয়-যাত্রার সঙ্গী হইতে পারিব, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; কেবল আমাদের এইটুকু লক্ষ্যের বিষয়, যেন আমরা অনন্তকোটি বিঘ্ন ও বিপদের মধ্য হইতে তাঁহাদের পদত্রাণ হইতে বিচ্যুত না হই। কোটি কোটি বিপদ্, কোটি কোটি বিঘ্নকে আমরা সাদরে অভ্যর্থনা করিব, যদি সেই বিপদ ও বিঘ্নের মধ্যে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য-ধর্ম্মে আমরা অধিকতর আর্ত্তিবিশিষ্ট হইতে পারি। জীবনে-মরণে, বিপদে-সম্পদে, সুখে-দুঃখে হরিগুরুবৈষ্ণবের আনু-

গত্যই আমাদের নিত্যধর্ম্ম—মায়াবী স্বতন্ত্রতার দুঃসঙ্গ আমাদের চিরবর্জ্জনীয়।

—•—

গ্রন্থ ও নির্গ্রন্থ

'গ্রন্থ'-শব্দ ধনে, সন্দর্ভে ও বর্ণসংগ্রহণে ব্যবহৃত হয়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু 'বিশ্ব'-নামক কোষগ্রন্থ হইতে এই অর্থ উদ্ধার করিয়াছেন,—

"গ্রন্থো ধনেঽথ সন্দর্ভে বর্ণসংগ্রহণেঽপি চ।"

কেহ কেহ বলেন, প্রাচীনকালে পুঁথিসমূহকে ডোরিকাদ্বারা গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া রাখা হইত বলিয়া 'গ্রন্থ' নামে অভিহিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীল কবিরাজগোস্বামিপ্রভু 'নির্গ্রন্থ' শব্দের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন,—

'নির্গ্রন্থ'-শব্দে কহে, অবিদ্যা-গ্রন্থি-হীন।
বিধি-নিষেধ-বেদশাস্ত্র-জ্ঞানাদি-বিহীন॥
মূর্খ, নীচ, ম্লেচ্ছ আদি শাস্ত্ররিক্তগণ।
ধনসঞ্চয়ী—নির্গ্রন্থ, আর যে নির্ধন॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ২৪।১৬-১৭)

শ্রীমদ্ভাগবতের (১।৭।১০) "আত্মারাম" শ্লোকে যে 'নির্গ্রন্থ'-শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহার টীকায় শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ

বলিতেছেন,—"নির্গ্রন্থাঃ গ্রন্থেভ্যো নির্গতাঃ। তদুক্তং গীতাসু (২।৫২)-যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি। তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ইতি। যদ্বা গ্রন্থিরেব গ্রন্থঃ, নিবৃত্তঃ ক্রোধাহঙ্কাররূপো গ্রন্থির্যেষাং তে নিবৃত্তহৃদয়গ্রন্থয় ইত্যর্থঃ।"

শ্রীল স্বামিপাদের অনুগমন করিয়া শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন,—'নির্গ্রন্থা জিজ্ঞাসিতগ্রন্থেভ্যো নির্গতাঃ। যদুক্তম্ (গীতা ২।৫২)—যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি। তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ইতি। যদ্বা গ্রন্থিরেব গ্রন্থঃ। নির্গতাহঙ্কারগ্রন্থয়ঃ। যদুক্তং (ভাঃ ১।২।২১)-ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিরিতি। যদ্বা বিধিনিষেধ-গ্রন্থাতীতাঃ। যদুক্তং (ভাঃ ১১।১৮।২৮) চরেদবিধিগোচর ইতি।" তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা হৃদয়ে পরমতত্ত্ব অবধারণ করায় বাহিরে শাস্ত্রগ্রন্থাদির অপেক্ষা-হীন, তাঁহারাই নির্গ্রন্থ। যেহেতু শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ শ্রীঅর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, যখন দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ গহনকে (দুর্গকে) তোমার বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি সমস্ত শ্রোতব্য ও শ্রুতফলে নির্ব্বেদ লাভ করিবে। অথবা গ্রন্থিই গ্রন্থ। যাঁহা-দিগের ক্রোধাহঙ্কারাদিরূপ গ্রন্থি নিবৃত্ত হইয়াছে, তাঁহারাই নির্গ্রন্থ-যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।২১) উক্ত হইয়াছে, আত্মদর্শন হই-লেই অহঙ্কাররূপ মনের শৃঙ্খল বিনষ্ট হয়। যাঁহারা বিধিনিষেধরূপ গ্রন্থির অতীত, তাঁহারাই নির্গ্রন্থ।

শ্রীভগবান্ সাধু, শাস্ত্র ও গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন। শাস্ত্র ও গুরু ভিন্ন নহেন। শ্রীগ্রন্থ-

ভাগবতই—শাস্ত্র, শ্রীভক্তভাগবতই—শ্রীগুরুদেব বা সাধু। শ্রীগুরুদেব শ্রীগ্রন্থভাগবতেরই আচার ও প্রচার করেন। যেরূপ শ্রীআচার্য্যদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি থাকিলে শ্রীআচার্য্যদেবের স্বরূপ উপলব্ধি হয় না, শ্রীআচার্য্যতত্ত্ব হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করে না, তদ্রূপ শ্রীগ্রন্থভাগবতে কোনরূপ মর্ত্ত্যবুদ্ধি থাকিলে তাঁহার প্রতিপাদ্য তত্ত্বসমূহ হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করে না। এইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু দেবানন্দ পণ্ডিতকে উপলক্ষ করিয়া আমাদিগকেই শিক্ষা দিয়াছেন,—

"গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার ॥
মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা, তপ, প্রতিষ্ঠায় ॥
'ভাগবত বুঝি' হেন যা'র আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য-ঈশ্বরবুদ্ধি যা'র।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ-ভক্তিসার ॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২১।১৪, ২৩-২৫)

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিতেছেন,—শ্রীগুরুপাদপদ্ম সাক্ষাৎ শ্রীভাগবতরসবিগ্রহ—

"ভাগবত-রস—নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।
ইহা জানে যে, হয় পরম ভাগ্যবন্ত ॥"

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৫৩৫)

যাহাদের শ্রীগ্রন্থভাগবতে ভোগবুদ্ধি, তাহারা বহু শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন, এমন কি সন্ন্যাসাদি আশ্রম গ্রহণ করিয়াও শ্রীভক্ত

ভাগবতের নিন্দক হইয়া থাকে। দুরন্ত গুরুবৈষ্ণবাপরাধ ফলে তাহাদের গ্রন্থাদি পাঠ নিরর্থক হয়, —

"গ্রন্থ পড়ি' মুণ্ড মুড়ি' কা'রো বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে যাইবেক নাশ॥"
(চৈঃ ভাঃ মঃ ৬।১৭৩)

"বেদাধ্যায়রতা নিত্যং নিত্যং বৈ যজ্ঞযাজকাঃ।
অগ্নিহোত্ররতা নিত্যং বিষ্ণুধর্ম্মপরাঙ্মুখাঃ।
নিন্দন্তি বিষ্ণুভক্তাংশ্চ বেদবাহ্যা সুরেশ্বরী॥"
(পাদ্মোত্তরে ৫০ অধ্যায়)

"বেদৈঃ পুরাণৈঃ সিদ্ধান্তৈর্ভিন্নৈর্বি ভ্রান্ত চেতসঃ।
নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছন্তি কিং তত্ত্বং কিংপারং পদম্॥"
(নারদ-পঞ্চরাত্র ২।২৬)

এই সকল শ্রীব্যাসবাক্যের তাৎপর্য্য শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস সরল পদ্যানুবাদে এইরূপ বলিয়াছেন,—

"যেবা ভট্টাচার্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র সব।
তাহারাও না জানে সব গ্রন্থ-অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যমপাশে ডুবি' মরে॥"
(চৈঃ ভাঃ আঃ ২।৬৭-৬৮)

"শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম, অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে॥

পড়িয়া-শুনিয়া লোক গেল ছারে-খারে।
কৃষ্ণমহামহোৎসবে বঞ্চিলা তাহারে ॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১।১৫৮-৫৯)

'গ্রন্থানুভব' অর্থাৎ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য তাঁহারই নিকট প্রকাশিত হন, যিনি শাস্ত্রের প্রতি ভোগ ও ত্যাগবুদ্ধি না করিয়া তাঁহাকে নিত্যসেব্যবস্তু জ্ঞান করিয়া থাকেন।

শ্রুতিও এই কথাই বলেন,—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥"

(শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬।২৩)

এই সকল গ্রন্থ আমার সম্পত্তিবিশেষ, এই সকল আমার অধিকারে থাকিবে, ইহার ফল আমি ভোগ করিব বা ইহাদ্বারা আমি পণ্ডিত হইয়া লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিব, এইরূপ অভিসন্ধি থাকিলে তাহা গ্রন্থ ভোগ করিবার দুর্ব্বুদ্ধিতে পর্য্যবসিত হয়। অতিমর্ত্ত্য সেব্যতত্ত্ব কখনও ভোক্তাভিমানীর নিকট আত্মপ্রকাশ করেন না। গ্রন্থরূপা গুরুবর্গ ভুবনমঙ্গল বিধানের জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সুতরাং সেইরূপভাবেই তাঁহাদের সেবা করিতে হইবে। গৃহ, বিত্ত, অলঙ্কার, মালা, পত্নী, পুত্র প্রভৃতির ন্যায় গুরুরূপী গ্রন্থরাজিকে নিজস্ব সম্পত্তিবিশেষ মনে হইলে গৃহ, পত্নী, পুত্র, অর্থাদি পরিত্যাগ করিয়াও জড়ে আসক্ত হইয়া যাইতে হয় ও তাহা হইতে ক্রমশঃ "গীতার সংসার" পর্য্যন্ত বিস্তার-লাভ করে। আসক্ত ব্যক্তির নিকট কখনও সত্য আত্ম-

প্রকাশ করেন না। গ্রন্থচর্চ্চা গ্রাম্য সাহিত্যিক বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-লোলুপ জাগতিক পণ্ডিতগণের ন্যায় কৌতূহল-পরিতৃপ্তি বা প্রতিষ্ঠাশাদি অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য কৃত হইলে তদ্দ্বারা আত্মমঙ্গলরূপ ফল লাভ করা যায় না।

নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদের নামে জগতে বহুপ্রকার ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির উপায় ও উপকরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। 'বহুগ্রন্থকলা-ভ্যাস' তন্মধ্যে অন্যতম। শ্রীভক্ত-ভাগবতগণের কীর্ত্তিতা অনর্থ-বিধ্বংসিনী বাণী-শ্রবণে যাহাদের রুচি নাই, অথচ নানাপ্রকার গ্রন্থাদি চর্চ্চার জন্য আগ্রহ, যত্ন ও অধ্যবসায় আছে, তাহাদের গ্রন্থাদি অনুশীলনের অভিনয় ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা অর্থাৎ কৌতূহল-পরিতৃপ্তি বা প্রতিষ্ঠাদি অন্যাভিলাষ পরিপূরণের প্রচেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীহরির কথা শ্রবণ করিবার সময় যাহারা অন্যমনস্ক বা নিদ্রালু হইয়া পড়েন, অথচ বড় বড় গ্রন্থ-সংগ্রহ ও পুস্তকাগার সাজাইবার জন্য যাহাদের অত্যধিক চেষ্টা ও আগ্রহ দৃষ্ট হয়, তাহারা যে গ্রন্থরূপী আচার্য্যগণকে ভোগ্যবস্তু বা ইন্দ্রিয়-তর্পণের উপকরণ বলিয়া বিচার করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কোন কোন 'গৃহস্থ'-নামধারী গৃহব্রত ব্যক্তিতেও এইরূপ চিত্তবৃত্তি অধিক লক্ষিত হয়। তাহারা স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত প্রভৃতির ন্যায় শাস্ত্রগ্রন্থাদিকেও ভোগ্য সম্পত্তিবিশেষ মনে করেন—মুখে না বলিলেও কার্য্যতঃ ঐরূপই আচরণ করিয়া থাকেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীগীতা বা শ্রীভাগবতাদির মর্ম্ম-গ্রহণের প্রতি অধিক মনোযোগী না হইয়া নির্ব্বিশেষবাদী

কোন কোন সম্প্রদায়ের ন্যায় "গ্রন্থ-সাহেবের" পূজা অর্থাৎ কেবল ফুলচন্দনাদি দ্বারা গ্রন্থের অর্চনমাত্র করিয়া থাকেন, কিন্তু শব্দব্রহ্মাবতারের অসমোর্দ্ধকৃপা মহান্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখবিগলিত বাণীগঙ্গা হইতে গ্রহণ করেন না। শ্রীগ্রন্থভাগবতের কৃপা আমরা শ্রীভক্ত-ভাগবতশ্রেষ্ঠ শ্রীব্যাস, শ্রীশুক, শ্রীসূতগোস্বামী প্রভৃতি মহাজনগণের শ্রীমুখামৃত হইতে প্রাপ্ত হই।

শ্রীগ্রন্থভাগবত-বহির্ম্মুখ গৃহব্রতধর্ম্মের আসক্তিকে উন্মূলিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণগৃহব্রত হইবার কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাহারা 'ঘরে বসিয়া সাধুসঙ্গ করিব' অর্থাৎ গৃহব্রতধর্ম্মের নোঙ্গর কোনদিনই উন্মূলিত করিব না, মৃত্যু পর্য্যন্ত ও তৎপরেও জন্মজন্মান্তর উহা সংরক্ষণ করিব,—এইরূপ প্রচ্ছন্ন দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থপাঠের জন্য প্রয়াস করেন কিন্তু নিষ্কিঞ্চন পরমহংসকুলের শ্রীপাদপদ্মের সম্মুখে উপনীত হইয়া তাঁহাদের পদরেণুতে অভিষিক্ত হইতে প্রস্তুত হন না, তাহারা কখনও শাস্ত্রগ্রন্থানুভব লাভ করিতে পারিবেন না। কারণ তাহাদের গ্রন্থে কেবলমাত্র লৌকিক বা মৌখিক অর্থাৎ কাপট্যপূর্ণ পূজ্যবুদ্ধির অভিনয় থাকিলেও গ্রন্থরূপী আচার্য্যগণে আত্মনিবেদনের বুদ্ধি নাই, তাহারা শ্রীগ্রন্থভাগবত ও শ্রীভক্তভাগবতে অন্তরে ভেদবুদ্ধি করেন। মহান্ত শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা শ্রীভক্তভাগবতের শাসন ও দণ্ড হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য শ্রীগ্রন্থভাগবতকে অচেতন ও নিষ্ক্রিয় বস্তু মনে করিয়া কোন না কোনরূপ অন্যাভিলাষ চরিতার্থ অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ-

কামমোক্ষাদি অর্জ্জনের আশায় গ্রন্থভাগবতের পূজার (?) অভিনয় করেন।

মঠবাসিগণের মধ্যেও যাহারা শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত নহেন, নিজ নিজ স্বতন্ত্রতাকে পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে আনুগত্য করিবার জন্য অকপটে উন্মুখ নহেন, তাহারা যে গ্রন্থাদি পাঠের প্রযত্ন করেন, তাহাও ভক্তভাগবত ও গ্রন্থভাগবতে ভেদবুদ্ধি হইতে জাত কাপট্যবিশেষ। ভক্তভাগবতের কৃপায় গ্রন্থভাগবতের শিক্ষা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়।

শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামি-মহারাজ স্বয়ং নিগ্রন্থ অবধূতশিরোমণি হইয়াও শ্রীগোদ্রুমের শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট প্রত্যহ উপস্থিত হইয়া ঠাকুরের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন। শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভু কিছুদিন শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীমুখে 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে"র ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ নিগ্রন্থ হইয়াও কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীকাশীধামে শ্রীদশাশ্বমেধঘাটে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের মুখে শ্রীসনাতন-শিক্ষা-শ্রবণের অহৈতুকী করুণাময়ী লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নিগ্রন্থ মহাভাগবতগণের এইরূপ লীলার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীগ্রন্থভাগবত শ্রীভক্তভাগবতের নিকটই অনুশীলন করিতে হয়। শ্রীশব্দাবতারের কৃপা শ্রীমহান্তগুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইতে হয়। গ্রন্থ দেখিয়া যদি কেহ মহামন্ত্র বা মন্ত্র শিক্ষা করেন ও

তাহা কীর্ত্তন ও জপ করিতে আরম্ভ করেন, অথবা যদি কোন ব্যক্তি গুরুর নিকট হইতে শ্রীনৃসিংহমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া অপরকে কোন গ্রন্থ দেখিয়া শ্রীনারায়ণমন্ত্র প্রদান করেন, বা শ্রীমহান্ত-গুরুদেবের নিকট শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া গ্রন্থ দেখিয়া অন্য বিষ্ণু-মন্ত্র শিক্ষা করিয়া তাহা অপরকে প্রদান করেন, তবে তাহা পাষণ্ডিত্ব বলিয়া পরিগণিত হইবে। শ্রীমহান্তগুরুদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত মন্ত্রোপদেশ ব্যতীত গ্রন্থ দেখিয়া মন্ত্রোপদেশ লাভ বা সেই মন্ত্র অপরকে প্রদান করিয়া গুরুর সজ্জা-গ্রহণ করা যায় না।

মহান্ত শ্রীগুরুদেব বা শ্রীভক্তভাগবত ব্যতীত নিজে নিজে শ্রীগ্রন্থভাগবতের কৃপা অর্জ্জন করা যায় না। এইজন্যই শ্রীমন্মহা-প্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছিলেন,—

"যাহ, ভাগবত পড় **বৈষ্ণবের স্থানে।**"

(চৈঃ চঃ অঃ ৫।১৩১)

মঠবাসিগণের মধ্যে যাঁহারা সংস্কৃত বা অধিক বিদ্যাকুশল নহেন, তাঁহারা সংস্কৃত মূল শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীষট্সন্দর্ভ, শ্রীসর্ব্ব-সম্বাদিনী, শ্রীশ্রীভাষ্য, শ্রীমাধ্বভাষ্য, শ্রীগোবিন্দভাষ্য বা শ্রীগোস্বামি-পাদগণের রচিত সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ পাঠ করিবার জন্য কৌতূ-হলাক্রান্ত হইলে তাঁহাদিগের সেইরূপ কৌতূহলকে গুরুবর্গ প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত হন না দেখিয়া তাঁহারা যেন মনে না করেন যে, তাঁহাদিগকে 'মূর্খ' ভাবিয়া তাঁহাদিগের প্রতিহিংসা করি-বার উদ্দেশ্যে শ্রীগোস্বামিবর্গের সিদ্ধান্ত ও উপদেশ লাভে

তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করা হইতেছে ; কিংবা কেহ যেন ইহাও না ভাবেন যে, জাগতিক পাণ্ডিত্য অর্জ্জন না করিলে গুরুবর্গের কৃপা, শুভদৃষ্টি ও তাঁহাদের নিকট সমাদর-লাভ হয় না। শ্রীগুরু-বর্গকে এইরূপ আধ্যক্ষিক বিচারে দেখিতে গিয়া কেহ কেহ অপরা বিদ্যা অর্জ্জনে মনোনিবেশ করিয়া দুরন্ত অপরাধে মায়াবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মা শ্রীভগবানকে বলিয়াছেন,—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৪।৩)

হে ভগবন্! জ্ঞানের প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া সাধু-গণের শ্রীমুখবিগলিত আপনার কথা যাঁহারা **নিজ নিজ স্থানে স্থিত হইয়া** শ্রবণ করেন ও কায়মনোবাক্যে আত্মনিবেদন করিয়া জীবন-ধারণ করেন, ত্রিলোকের মধ্যে আপনি দুর্ল্লভ ও অজিত হইলেও তাঁহাদের নিকট জিত ও সুলভ হইয়া থাকেন।

এই শ্লোকে স্থানে স্থিত, কায়মনোবাক্যে নমস্কার বিধান করিয়া শ্রীসাধুমুখবিগলিত শ্রীহরিকথা-শ্রবণ ও জ্ঞানের প্রয়াস সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ—এই কয়েকটী বাক্য বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। জ্ঞানের প্রয়াস কোনদিনই শুদ্ধভক্তি বা শরণাগতি-পথের অনুকূল নহে। যাঁহারা জ্ঞান-প্রয়াসের প্রচ্ছন্ন অভিলাষ

অন্তরে পোষণ করিয়া শাস্ত্রীয় গ্রন্থ-পাঠের প্রচেষ্টা করেন, তাঁহাদের কোনদিন গ্রন্থানুভব হইতে পারে না।

স্বল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ "স্থানে স্থিতাঃ" ও "নমন্তঃ" কথা দুইটি ভুলিয়া যদি শ্রীগোস্বামিপাদগণের দুরূহ সংস্কৃতগ্রন্থসমূহ কিংবা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীশ্রীধরস্বামীর টীকা, শ্রীগোবিন্দভাষ্য, শ্রীশ্রীভাষ্য প্রভৃতি পাঠ করিবার জন্য প্রয়াস ও অত্যাগ্রহ প্রকাশ করেন, তবে 'স্বল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী'' এই ন্যায়ানুসারে তাহাদের দ্বারা সম্প্রদায়ে নানা প্রকার জঞ্জাল উপস্থিত হইবে: "ভুঃ, ভুবঃ, স্বর্'কে 'ভূতভবিষ্যং', 'বিদুরকাষ্ঠ'শব্দকে বিদগ্ধ-কাষ্ঠ প্রভৃতি বিকৃত অর্থ করিয়া অশিক্ষিত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ আউল-বাউল-সহজিয়াদলের পুষ্টিসাধন করিতে থাকিবেন। যাহারা স্বল্পশিক্ষিত তাহাদিগকে "গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে" সমাহৃত সংস্কৃত শ্লোক বা উপনিষদের মন্ত্রসমূহ কণ্ঠস্থ করিতেই হইবে, অথবা সংস্কৃত শ্রীমদ্ভাগবত বা ষট্সন্দর্ভ ব্যাখ্যা করিয়া লোকসমাজে তাহা প্রচার করিতেই হইবে, নতুবা নিজের ও পরের হরিভক্তি হইবে না ; কল্যাণকল্পতরু', 'শরণাগতি', 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' বা শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা' মাত্র কীর্ত্তন করিলে লোকে অশিক্ষিত বলিয়া অসম্মান করিবে—এরূপ বিচার জড়প্রতিষ্ঠা-কামনারূপ অন্যাভিলাষ হইতে উত্থিত। ইহাকে সর্ব্বতোভাবে দূর করিতে হইবে। কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, কোন শিক্ষিত ব্যক্তি আসিলে কোন কোন স্বল্প-শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠের পরিবর্ত্তে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীগীতা প্রভৃতির সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া সেই শিক্ষিত

শ্রোতার মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের ধারণা এই যে, শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিলে লোকে পাঠককে "বাঙ্গালা দপ্তরের লোক" মনে করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা (অথবা পাঠককে স্বল্পশিক্ষিত ভাবিয়া তৎপ্রতি অশ্রদ্ধা অর্থাৎ তাহাকে স্বল্প-প্রতিষ্ঠাদান) প্রকাশ করিবে। কিন্তু অশুদ্ধ ও বিকৃত উচ্চারণ করিয়া সংস্কৃত পাঠ করা অপেক্ষা শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত বা শ্রীগুণরাজ খাঁ'র "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়", শ্রীভাগবতাচার্য্য প্রভুর "শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী", শ্রীল জগদানন্দের "প্রেমবিবর্ত্ত", শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের "প্রার্থনা" ও "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা", শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের "শরণাগতি" ও 'কল্যাণকল্পতরু" পাঠ করিলে যে নিজের ও পরের অধিক উপকার হইতে পারে, ইহা তাহারা বুঝিতে পারেন না। যাহারা এইরূপ প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী তাহাদের নিকট শাস্ত্র-গ্রন্থের তত্ত্ব কখনই স্ফূর্ত্তিলাভ করে না। ইহারা 'প্রচারক' নামের অযোগ্য। ইহাদের কেহ কেহ এইরূপ যুক্তি প্রদান করিয়া বলেন যে,—

"মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১১।১০৮ সংখ্যা-ধৃত শাস্ত্রবচন)

এইরূপ যুক্তি যদি শুদ্ধভক্তের জন্য প্রদত্ত হয়, তবেই তাহা শোভা পায়; নতুবা নিজের জন্য বা সমশীল অপরের জন্য প্রদত্ত হইলে তাহাতে প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষারই সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া মূর্খতা করিলে তাহা লৌকিক ও পারমার্থিক উভয় সমাজেই নিন্দার কারণ হয়।

বর্ত্তমান যুগের শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস পরমকারুণিক শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার "শরণাগতি", "কল্যাণ-কল্পতরু" প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীগোস্বামিপাদগণের ও বেদ-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতের মূল শিক্ষা ও সিদ্ধান্তের নির্য্যাস আমাদের ন্যায় মূর্খ ও তত্ত্বান্ধ ব্যক্তিগণের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। একমাত্র "কল্যাণকল্পতরু" ও "শরণাগতির" উপদেশ জীবনে পালন করিলে শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদগণের যাবতীয় গ্রন্থের মূল শিক্ষা লাভ করা যায়। তবে ইহাও বক্তব্য নহে যে, শ্রীশ্রীগোস্বামিপাদগণের বা বেদান্তাদি শাস্ত্রের চর্চ্চা ও অনুশীলন হইতে সকলেই বিরত থাকিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবল একই প্রকার ব্যক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করিবেন। শ্রীশ্রীগুরুবর্গের দ্বারা যাঁহারা সম্প্রদায়-বৈভব-বিস্তারের অধিকার লাভ করিয়াছেন বা করিবেন, তাঁহারা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট প্রচার -কল্পে সংস্কৃতশাস্ত্র-গ্রন্থ অনুশীলন করিবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু "মায়াবাদিভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ" ইহা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ ও তাঁহার বৈভব-বিস্তারের জন্য শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু, শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-প্রমুখ আচার্য্যগণ শঙ্কর-ভাষ্য পাঠ করিয়া উহার অপসিদ্ধান্তসমূহ খণ্ডন ও সৎসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি

আচার্য্যগণ অসুর-মোহপর মায়াবাদ-ভাষ্য পাঠ করিয়া তাহা খণ্ডনপূর্ব্বক সংসম্প্রদায়ের গৌরব সংরক্ষণ করিয়াছেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের 'ভজনানন্দীর' নামে স্বল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহারা উপনিষদ্, বেদান্ত প্রভৃতির নাম শুনিলেই উহাদিগকে দুঃসঙ্গ বা অবৈষ্ণবসঙ্গ মনে করিতেন। স্বল্পশিক্ষার দুর্নামকে আবৃত করিবার উদ্দেশ্যে অথবা স্বল্পশিক্ষার দোষে তাহারা এইরূপ ভক্তির ছলনা গ্রহণ করিতেন। ইহার ফলে যদিও তাহাদিগকে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের "প্রার্থনা" বা অন্যান্য কবির "হাটপত্তন" 'বৈষ্ণব-বন্দনা' প্রভৃতি কীর্ত্তনাদি করিতে শুনা যাইত, তথাপি শিক্ষার অভাবে, বিশেষত: প্রকৃত সাধুর সঙ্গা-ভাবে তাহাদিগের মধ্যে নানাপ্রকার কু-সিদ্ধান্ত ও ব্যভিচারের স্রোত: প্রবাহিত হইয়াছিল। আবার কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-পণ্ডিতগণের অনুকরণ করিয়া সম্প্রদায়-রক্ষার নামে কোন কোন ব্যক্তি গ্রন্থাদি-চর্চ্চা ও অনুশীলনের প্রদর্শনী উন্মোচনপূর্ব্বক ভাড়াটিয়া বক্তা ও পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিল। বস্তুত: কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী, দেহ-গেহাসক্ত বহু 'তীর্থো'পাধিক পণ্ডিতম্মন্য ভাড়াটিয়া বক্তা ও পাঠক প্রাকৃত পাণ্ডিত্যবলে গোস্বামি-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও তাঁহাদের টীকাটিপ্পনী রচনার অভিনয় করিয়াও সম্প্র-দায়-রক্ষা করিতে পারেন নাই; কারণ, তাহারা 'সরাগ বক্তা'। 'নিরাগ বক্তা' না হইলে লোকের উপকার করা যায় না। লোক-রঞ্জন ও লোকোপকার এক নহে। "লোকসংগ্রহ"-অর্থে লোকের প্রতি কৃপা—জীবে দয়া। যাহারা দগ্ধোদর ভরণের জন্য অথবা

দেহসম্পর্কিত স্ত্রী-পুত্রাদির রক্তমাংসের পিণ্ড-সংবর্দ্ধনের জন্য অথবা প্রতিষ্ঠাদি-সংগ্রহের আশায় শ্রীমদ্ভাগবত বা গোস্বামি-শাস্ত্রের অনুশীলনকারী, ব্যাখ্যাতা বা বক্তার অভিনয় করেন, সেই সকল অন্যাভিলাষী, কুবিষয়ী 'সরাগ বক্তা' কি করিয়া লোকোপকার করিবেন ?

শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে "দাসকূট" ও "ব্যাসকূট"-নামে দুইটি বিভাগ হইয়াছিল। যাঁহারা সংস্কৃতশাস্ত্রাদি চর্চ্চা অপেক্ষা কীর্ত্তন-ভজনাদির প্রতি অধিক রুচিবিশিষ্ট তাঁহারা 'দাসকূট'-নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। দাসকূট-সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণ যে শাস্ত্রসিদ্ধান্তে অজ্ঞ ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহারা তাঁহাদিগের সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত অবগত হইয়া ভজনাদিতেই বিশেষ রুচিবিশিষ্ট ছিলেন। দাসকূট-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণেরও রচিত বহু গ্রন্থাদি আছে। তাহা তাঁহাদিগের মাতৃভাষায় অর্থাৎ কনড়ভাষায় রচিত ও অধিকাংশই পদ্যাত্মক। শ্রীকনকদাস প্রভৃতি দাসকূট-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ব্যাসকূট-সম্প্রদায় সংস্কৃত-শাস্ত্রগ্রন্থাদি আলোচনা করিয়া তাহা আচার ও প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারা সম্প্রদায়-সংরক্ষক আচার্য্যপদবীতে অভিষিক্ত হইয়াছেন। ইহা নহে যে, শ্রীকনকদাস প্রভৃতি 'আচার্য্য'-পদবাচ্য নহেন। শ্রীকনকদাস শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের দ্বারাও সম্মানিত। তবে শ্রীব্যাসকূট-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের সংস্কৃত-ভাষায় রচিত গ্রন্থ সর্ব্বত্র প্রচার হইয়াছে। শ্রীবাদিরাজস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণ "যুক্তিমল্লিকা", "ন্যায়সুধা"-টিপ্পনী প্রভৃতি

গ্রন্থ-রচনা এবং সর্ব্বত্র প্রচার ও দিগ্বিজয়-করিয়া "দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য"-নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি ব্যাসকূট-সম্প্রদায়ের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত।

অতএব যাঁহারা স্বল্পশিক্ষিত তাঁহারা দাসকূট-সম্প্রদায়ের ন্যায় অধিক পাণ্ডিত্য প্রদর্শনী-উন্মোচন করিবার চেষ্টা করিয়া সমস্ত পাণ্ডিত্যের সার "কল্যাণকল্পতরু" ও "শরণাগতি"র শিক্ষায় অধিষ্ঠিত হন, তাহা জীবনে আচার ও প্রচার করেন, আধ্যক্ষিক-জ্ঞানের প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া স্থানস্থিত হইয়া কায়মনোবাক্যে শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখবিগলিত বাণীর সেবা করেন, তবেই মঙ্গল হইতে পারে। জগতে প্রতিষ্ঠা-লাভ বা 'পণ্ডিত' বলিয়া লোকের নিকট খ্যাতিলাভের আশা কিছু হরি-ভজনেচ্ছা নহে।

যাঁহারা অন্যাভিলাষরহিত, হরিসেবোন্মুখ, অথচ যাঁহাদের তীক্ষ্ণ মেধা ও পাঠাদির প্রতি রুচি আছে, তাঁহাদিগকে পর-বিদ্যাপীঠে শাস্ত্রগ্রন্থাদি চর্চ্চার সুযোগ দিতে হইবে। তাঁহারা ভবিষ্যতে সম্প্রদায়ের সেবা করিতে পারিবেন। কিন্তু অন্যাভিলাষ-যুক্ত ব্যক্তি তীক্ষ্ণধী হইলেও তাহাকে গ্রন্থচর্চ্চায় অভিনিবিষ্ট করাইয়া তাহাকে অধিকতর দাম্ভিক ও অন্যাভিলাষী করিতে হইবে না।

এইরূপ একাধিক সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে যে, যাহারা হরি-ভজন পরিত্যাগ করিয়া পতনের পিচ্ছিল পথে পদনিক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইয়াছে, যাহারা মঠ-জীবন পরিত্যাগ করিয়া

স্বতন্ত্র-জীবনযাপনে উন্মুখ হইয়াছে, সন্ন্যাসী হইতে বান্তাশী হইবার সংকল্প করিয়াছে, বৈষ্ণবসেবা পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব-বিদ্বেষ কার্য্যের অভিযান আরম্ভ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহারা সর্ব্বাগ্রেই গ্রন্থসমূহকে ভোগ্যসম্পত্তিবিচারে ঐসকল যে-কোন উপায়ে মঠ হইতে স্থানান্তরিত বা অপহরণ করিবার চেষ্টা করিতে ত্রুটি করে নাই। যে-স্থানে **বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা নাই, ভক্তভাগবতে প্রীতি নাই, শ্রীগুরুদেবে ভক্তি নাই, শ্রীগুরুগৃহের প্রতি আসক্তি নাই, অথচ গ্রন্থ সংগ্রহে আসক্তি আছে,** তথায় গ্রন্থসমূহকে ভোগ্যসম্পত্তিরূপে বিচার করিবার প্রবৃত্তি ব্যতীত হৃদয়ে আর কি থাকিতে পারে ?

কাহারও কাহারও আবার গ্রন্থের প্রতিপাদ্য-বিষয়ে প্রবেশের চেষ্টা অপেক্ষা গ্রন্থের প্রচ্ছদপটের সৌন্দর্য্যের প্রতি অত্যাসক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। নানাপ্রকার রঙ্‌বিরঙের কাপড় সোণার জলের বর্ডার ও নাম-খোদাই করিয়া সাজাইবার জন্য যেরূপ যত্ন দেখা যায়, গ্রন্থের প্রতিপাদ্য-বিষয়- অনুশীলন ও তাহা নিজ আচরণে প্রতিপালন করিবার জন্য সেরূপ যত্নের শতভাগের একভাগও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল অন্যাভিলাষ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইরূপ অন্যাভিলাষ থাকিলে গ্রন্থরূপী আচার্য্য কৃপা করেন না। তখন ভক্তভাগবত যদি কৃপা করিয়া আমাদের সেই অন্যাভিলাষ প্রদর্শন করেন এবং আমরা তাঁহাদিগকে শত্রু না ভাবিয়া পরমবন্ধুবিচারে তাঁহাদিগের সেই উপদেশ প্রতিপালন করি, তবেই আমাদের মঙ্গল হইতে পারে।

মঠবাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা পরিব্রাজক সন্ন্যাসী—ইঁহারা সর্ব্বতোভাবে নিগ্রন্থ অর্থাৎ নিষ্কিঞ্চন হইবেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'শরণাগতির'—

"সর্ব্বস্ব তোমার, চরণে সঁপিয়া,
পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমি ত' ঠাকুর, তোমার কুকুর,
বলিয়া জানহ মোরে॥

* * *

নিজের পোষণ, কভু না ভাবিব,
রহিব ভাবের ভরে॥"

—এই গীতির আদর্শ প্রত্যেকের চরিত্রে প্রতিফলিত হইবে। **কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা দ্রবিণ অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় আশ্রয়স্থল আছে—এইরূপ কল্পনাও হৃদয়ে থাকিলে কখনও শরণাগতির বিচার আসিবে না।** মঠবাসিগণের ব্যক্তিগতভাবে কোন গ্রন্থাদি থাকিবে না। অধিক কি, পরিধেয় বস্ত্রটি পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত ভোগ্য সম্পত্তি নহে—উহা শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রসাদ,—এইভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। যদি কেহ হরিসেবা না করেন, তবে তাহার সেই প্রসাদ বা মাধুকরী-ভিক্ষার একটি তণ্ডুলও গ্রহণ করিবার অধিকার নাই। মঠবাসী যদি গৃহস্থের ন্যায় ব্যক্তিগতভাবে সঞ্চয় করেন, বা অসময়ের জন্য কিছু অর্থাদি—যত সামান্যই হউক্ না কেন, "নিজের (?) তহবিলে" রক্ষা করেন, তাহা হইলে তিনি

শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মকে নিত্যরক্ষাকর্ত্তা বলিয়া বরণ না করিয়া প্রাকৃত দ্রবিণে অধিক বিশ্বাসী হইয়া পড়িলেন। ইহা শরণাগতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। শরণাগত ব্যক্তি কখনও 'আমার শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কিছু আছে'—স্বপ্নেও এইরূপ বিচার করেন না; অতএব মঠবাসীর সর্ব্বতোভাবে নির্গ্রন্থ হইয়া বিচরণ করাই কর্ত্তব্য।

মঠবাসিগণ মঠের গ্রন্থাগার হইতে অধিকার ও প্রয়োজনানুরূপ গ্রন্থ পাঠ করিতে পারিবেন। প্রচারকগণ যাঁহারা নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া হরিকথা প্রচার করেন, তাঁহাদিগের সহিত আবশ্যক গ্রন্থ থাকিতে পারে, কিন্তু **'নীরাগ-বক্তাই'—'প্রচারক'-পদবাচ্য**। 'সরাগবক্তার' আচার ও প্রচার এক নহে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

"বক্তা সরাগো নীরাগো দ্বিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সরাগো লোলুপঃ কামী তদুক্তং হৃৎ ন সংস্পৃশেৎ॥
উপদেশং করোত্যেব ন পরীক্ষাং করোতি চ।
অপরীক্ষ্যোপদিষ্টং যৎ লোকনাশায় তদ্ভবেৎ॥"

(ভক্তিসন্দর্ভ, ২০৩ অনুচ্ছেদ)

অর্থাৎ ধর্ম্মবক্তা দ্বিবিধ—সরাগ ও নীরাগ। সরাগবক্তা লোলুপ ও কামী। তাহার বাক্য হৃদয় স্পর্শ করে না। তিনি কেবল উপদেশই প্রদান করেন, কিন্তু নিজের জীবনে কখনও

উপদিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষা করেন না। পরন্তু পরীক্ষা না করিয়া উপদেশ প্রদান করিলে তাহা লোকনাশার্থই হইয়া থাকে।

যাহারা সরাগবক্তা তাহারা 'প্রচারক'-পদবাচ্য নহে। তাহাদের নিকট কোনও গ্রন্থ থাকিবে না, কারণ তাহারা গ্রন্থে ভোগ্যবুদ্ধি করিয়া থাকে। ঐ গ্রন্থই তাহাদের গ্রন্থি অর্থাৎ বন্ধন বা আসক্তির বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে।

কেবল মঠবাসী নহেন, 'গৃহস্থ'-নামধারী গৃহব্রতব্যক্তিগণ যাহারা গ্রন্থকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিবিশেষ মনে করেন, যাহারা নিষ্কিঞ্চন পরমহংসকুলের সঙ্গ করেন না, যাহাদের হৃদয়ে পরোপকার-প্রবৃত্তি নাই, যাহারা হরিকথা-বিমুখ আত্মঘাতী, যাহাদের বৈষ্ণবে প্রীতি নাই, কেবলমাত্র নিজ শৃগালকুক্কুরভক্ষ্য দেহে ও দেহসম্পর্কিত স্ত্রীপুত্রাদিতে আত্মীয়-বুদ্ধি, তাহাদিগের গ্রন্থই গ্রন্থির কারণ হইয়া থাকে। নিষ্কিঞ্চন পরমহংসকুলের প্রসঙ্গরূপা ও পরিচর্য্যারূপা সেবাব্যতীত কখনও হৃদয়গ্রন্থির ছেদন হইতে পারে না। যাঁহারা সেইরূপ বৈষ্ণবের সঙ্গে অবস্থান করিয়া নিরন্তর তাঁহাদের সেবা করিতে করিতে সেব্যবুদ্ধিতে গ্রন্থের অনুশীলন করেন এবং নিজের ও জগতের উপকার করিবার জন্য সতত ব্যস্ত, যাঁহারা দম্ভহীন, অন্যাভিলাষরহিত, নিষ্কপট সেইরূপ বৈষ্ণব-গৃহস্থগণের সেবাই গ্রন্থরূপী আচার্য্যগণ স্বীকার করিয়া থাকেন।

আচার্য্যগণের সকলেই শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি প্রীতি ও আসক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। পে-আল্‌বর্‌, তিরুমঢ়িসাইপ্পিরাণ-আল্‌বর্‌,

সম্রাট্ শ্রীকুলশেখর তোণ্ডারড়িপ্পড়ি আল্‌বর্, আণ্ডাল প্রভৃতি আচার্য্যগণ শাস্ত্রগ্রন্থ-সংগ্রহ ও সংরক্ষণে অতিশয় আসক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। আণ্ডাল বা শ্রীগোদাদেবী স্ত্রীমূর্ত্তিধারিণী হইলেও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য 'সারদা-পীঠ' (বৃজ্‌ব্ররো) হইতে 'বোধায়ন-বৃত্তি'-সংগ্রহের জন্য কত ক্লেশই না স্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য যখনই যেস্থানে গমন করিতেন, শত শত শাস্ত্র-গ্রন্থের মঞ্জুষাসমূহ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইত। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে কত যত্নের সহিত "শ্রীব্রহ্মসংহিতা' ও "শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের' পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। গোস্বামিপাদগণ এক এক বৃক্ষের তলে এক এক দিন শয়ন ও একান্ত বিরক্ত হইলেও তাঁহাদের শাস্ত্র-গ্রন্থের অভাব ছিল না। তাঁহারা তাঁহাদের রচিত গ্রন্থে যে শত শত শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা হইতেও তাঁহাদের শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি প্রীতির প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রমুখ আচার্য্যবৃন্দকে বহু গ্রন্থ প্রদান করিয়া গৌড়দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শত-শত-গ্রন্থপূর্ণ মঞ্জুষাকে ধনরত্নপূর্ণ সিন্ধুক মনে করিয়া বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীর দস্যু-গণের দ্বারা তাহা অপহরণ করাইয়াছিলেন। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়, শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়, শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রভৃতির বিরাট্ গ্রন্থাগার এখনও ঐসকল সম্প্রদায়ের মঠাদিতে দৃষ্ট হয়। মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের বিরাট্ গ্রন্থাগার হইতে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অনেক গ্রন্থ স্বহস্তে লিপি করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল

প্রভুপাদ যখনই যে-স্থানে গমন করিতেন, তখনই সে-স্থানের গ্রন্থাগার হইতে প্রাচীন গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিতেন। অধিক কি, তাঁহার সম্পাদিত বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতিতে পুরীর গোবর্দ্ধন-মঠের গ্রন্থাগারের একটি গ্রন্থ-তালিকা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। যখন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সহিত শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও আমরা ফয়জাবাদে ছিলাম, তখন স্থানীয় একটি প্রাচীন গ্রন্থাগার হইতে "বৈষ্ণব-মঞ্জুষা"র জন্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অনেক উপকরণ সংগ্রহ করাইয়াছিলেন। মহীশূরের মহারাজের সংস্কৃত গ্রন্থাগার ও উড়ুপীর বিভিন্ন মঠের গ্রন্থাগার, সলিমাবাদের শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের গ্রন্থাগার, জয়পুরে শ্রীগোবিন্দজীউর শ্রীমন্দিরের গ্রন্থাগার হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গ্রন্থবিবরণ-সংগ্রহের যত্ন করিয়াছিলেন। যখন তিনি শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থান করিতেছিলেন, তখনও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পুরীর বিভিন্ন মঠের গ্রন্থাগার ও দক্ষিণদেশে ভ্রমণকালে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গ্রন্থাগার হইতে বহু যত্নে বহু সাম্প্রদায়িক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমাকালে যখনই যে-কোন শ্রীপাটে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উপস্থিত হইতেন, তখনই শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে ও তদানুগত্যে আমাদিগকে শ্রীপাটস্থ গ্রন্থাগারের অনুসন্ধান ও গ্রন্থাদির বিবরণ সংগ্রহ করিতে বলিতেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে যখন আমরা শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখন শ্রীপাটস্থ গোস্বামিবৃন্দ শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ গোস্বামিপ্রভুর গ্রন্থাগারের সমস্ত গ্রন্থ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে প্রদর্শন

করাইয়াছিলেন। শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীতে বহু সাম্প্রদায়িক গ্রন্থরাজি প্রদর্শিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবেও সেই আদর্শ পরিপূর্ণভাবে দৃষ্ট হয়। শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থাগার হইতে তিনি পূর্ব্বাচার্য্যগণের গ্রন্থসমূহ সংগ্রহের জন্য বিশেষ উৎসাহ ও প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিছুদিন পূর্ব্বেও তাঁহারই কৃপাদেশানুসারে আমরা শ্রীব্রজমণ্ডলে পণ্ডিতবর শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর প্রভুর সহিত শ্রীগোস্বামিপাদগণের গ্রন্থাগার হইতে বহু-দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের অনুসন্ধান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দিরের গ্রন্থাগার, শ্রীরাধারমণ-ঘেরার পরলোকগত পণ্ডিতবর সখালাল ও গোপীলাল গোস্বামীর গ্রন্থাগার দর্শন ও তাহা হইতে বহু গ্রন্থ লিপি করা হইয়াছিল। মহাজনগণ যে গ্রন্থসংগ্রহে প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা কি প্রত্নতাত্ত্বিক বা সাহিত্যিকগণের ন্যায় ইন্দ্রিয়াসক্তি বা কৌতূহল-পরিতৃপ্তির প্রচেষ্টাবিশেষ? পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরিত্রে ও সেইরূপভাবে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের চরিত্রেও দেখিয়াছি যে, তাঁহারা যে-কোন ব্যক্তিকে অন্য যে-কোন বস্তু প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হন না, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থকে তাঁহারা কখনও কাহারও হস্তে প্রদান করেন না। গ্রন্থসমূহ যেন তাঁহাদিগের প্রাণ। ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোডে যখন শ্রীগৌড়ীয়মঠ অবস্থিত ছিল, সেই সময় একবার সাধারণ উৎসবের পূর্ব্বদিবস শেষরাত্রে মঠের এক পার্শ্বে হঠাৎ আগুন ধরিয়া গিয়াছিল। তখন শ্রীশ্রীল

প্রভুপাদ সর্ব্বাগ্রে গ্রন্থরাজিকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। আচার্য্যগণের এইরূপ গ্রন্থপ্রীতি তাঁহাদের পূর্ব্বগুরুবর্গের প্রতি প্রীতি ও জীবের প্রতি করুণা বা পরদুঃখ-দুঃখিতারই প্রকৃষ্ট সাক্ষ্যস্বরূপ। তাঁহাদিগের গ্রন্থপ্রীতি দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ইঁহারা অপরকে নিগ্রন্থ হইবার উপদেশ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা বিষয়ীর ন্যায় গ্রন্থের প্রতি অত্যধিক আসক্তি প্রদর্শন করিতেছেন; তাঁহারা যাহা প্রচার করিতেছেন, তাহা আচার করেন না।

অন্যাভিলাষী জড়াসক্ত জীব আচার্য্যগণের হৃদয়ের ভাব অবধারণ করিতে সমর্থ না হইয়া ঐরূপ কল্পনা করিতে পারে। বস্তুতঃ আচার্য্যগণ শ্রীসম্প্রদায়েশ্বরের সেবা, শ্রীসম্প্রদায়ের বৈভব প্রকাশ, শ্রীগুরুবর্গের মনোঽভীষ্ট প্রচার তাঁহাদের বাণী সংকীর্ত্তন ও জীবের প্রতি অতুলনীয়া অহৈতুকী অমন্দোদয়া দয়া বিস্তারের জন্যই এইরূপ গ্রন্থপ্রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। অন্যাভিলাষী জীবের নিকট যাহা গ্রন্থি বা বন্ধনের কারণ হয়, আচার্য্যগণের নিকট তাহাই শ্রীনামে রুচি, শ্রীবৈষ্ণবসেবা ও জীবে দয়ার পরাকাষ্ঠা বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব সম্প্রদায়ের সেবার জন্যই সমস্ত গ্রন্থ সংরক্ষিত থাকিবে। মঠবাসী কাহারও কোন ব্যক্তিগত গ্রন্থ বা কোনপ্রকার ব্যক্তিগত দ্রবিণাদি থাকিবে না। তাঁহারা শরণাগতির মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব সেবাময় জীবন যাপন করিবেন।

—•—

উপাসনা

'উপ' অর্থাৎ সম্মুখে 'আস্' ধাতুর অর্থে আসীন হওয়া বা উপবেশন করা। পরতত্ত্বের সাম্মুখ্যই উপাসনা। ইহাকে 'অভি-ধেয়' বলা হয়।

"তত্রাভিধেয়ং তদ্বৈমুখ্যবিরোধিত্বাত্তৎসাম্মুখ্যমেব, তচ্চ তদুপাসনলক্ষণম্, যত এব তজ্জ্ঞানমাবির্ভবতি।" (ভ স, ১ম অনুচ্ছেদ)

পরতত্ত্বের প্রতি বিমুখতার বিরোধী তৎসাম্মুখ্যই অভিধেয়; সেই সাম্মুখ্য—পরতত্ত্বের উপাসনালক্ষণযুক্ত; তাহা হইতেই পরতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানের আবির্ভাব হয়।

নিত্যবদ্ধ জীব অনাদিকাল হইতে পরতত্ত্বের প্রতি বিমুখ। পরতত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানের এই অভাব নিত্যসিদ্ধ বা নিত্যোন্মুখ মহতের কৃপায় দূরীভূত বা ধ্বংস হইতে পারে। পরতত্ত্বই সম্বন্ধি-বস্তু; তাঁহার প্রাপ্তির উপায়, তৎপ্রতি উন্মুখ হওয়ার উপায় বা তদ্বিষয়ে কৃত্যই অভিধেয় বা উপাসনা।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু প্রথম-মুখেই 'শ্রীবিষ্ণু'র বা শ্রীকৃষ্ণের 'সেবা', 'ভক্তি' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তিনি সাধারণ তত্ত্ববিদ্‌গণের পরিভাষা 'পরতত্ত্ব', 'উপাসনা', 'অনুভব', 'সাক্ষাৎকার' প্রভৃতি পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। উপনিষদে, জ্ঞানি-সম্প্রদায়ে, ধ্যানি-সম্প্রদায়ে, রাজা রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ে 'পূজা', 'সেবা', 'ভক্তি' প্রভৃতি শব্দের পরিবর্ত্তে 'উপাসনা' শব্দটীর বহুল প্রয়োগ আছে। উপনিষদে

(বৃহদারাণ্যক ৪।৫।৬) 'নিদিধ্যাসন' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। জ্ঞানী ও যোগী-সম্প্রদায়ে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনকে 'উপাসনা' বলে। সেই নিদিধ্যাসন শব্দের অর্থই 'উপাসনা'। (ভ স, ৭ম অনু)

শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্তানুসারে সম্বন্ধীবস্তুর প্রাপ্তির যে উপায় বা অভিধেয়, তাহাই উপাসনা বা সাম্মুখ্য। তাহা গৌণ ও মুখ্য-ভেদে দ্বিবিধ। কর্ম্মযোগ বা কর্ম্মার্পণ—গৌণ-উপাসনা, আর জ্ঞান, ভক্তিবিশেষ (যোগ) ও সাক্ষাৎ ভক্তি—মুখ্য-উপাসনা। জ্ঞান ও যোগকে মস্তিষ্কের পথ বা বিচার-প্রধান পথ বলা হয় এবং ভক্তিকে হৃদয়ের পথ বা রুচি-প্রধান পথ বলা যায়। অতন্নিরসনই জ্ঞান-মার্গের প্রধান কৃত্য। ইহা ক্ষুরের ধারের উপর দিয়া বিচরণের মত বিপজ্জনক। মস্তিষ্কের আর একটী পথ—যোগ। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা পরমাত্মার প্রতি বিমুখ ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় হইতে বিকর্ষণপূর্ব্বক একমুখী করিবার জন্যই যোগমার্গে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম. প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই অষ্টাঙ্গ যোগের প্রণালী দৃষ্ট হয়। এই অষ্টাঙ্গ যোগের শেষ তিনটী অঙ্গ ধারণা ধ্যান ও সমাধি পরতত্ত্বের আবির্ভাব বিশেষের স্মৃতি বা চিন্তামূলক অর্থাৎ ভক্তিমূলক হওয়ায় এই পন্থাকে 'ভক্তিবিশেষ' বলা হয় ; কিন্তু এই ধারণা, ধ্যান ও সমাধি শুদ্ধভক্তির অন্যতম ভক্ত্যঙ্গ স্মরণের অন্তর্গত ধারণা, ধ্যান ও সমাধি হইতে পৃথক্। কারণ, অষ্টাঙ্গ-যোগের অন্তর্গত যে ধ্যানাদি, তাহা কৃত্রিম চেষ্টা বা অভ্যাস-যোগমূলক। কিন্তু ভক্ত্যঙ্গ-স্মরণের অন্তর্গত ধারণা, ধ্যান ও সমাধি হ্লাদিনীর কৃপা হইতে বিকশিত সহজ ধর্ম্ম। যোগিগণ নিজ হৃৎকমলে

পরমাত্মা বা নারায়ণের ভাবনা করেন। বৈকুণ্ঠে বা পরতত্ত্বের স্বধামে তাঁহার ধ্যান করেন না ; কিন্তু ভক্তগণ স্বীয় অভীষ্টদেবকে তাঁহার নিজ ধামে বিহারশীলরূপেই ধ্যান করেন, যথা,— "দীব্যদ্‌বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুমাধঃ" অথবা "স্মরেৎ বৃন্দাবনে রম্যে" ইত্যাদি।

যম-নিয়মাদি নিজ চেষ্টার দ্বারা ইন্দ্রিয়কে পরমাত্মার দিকে একমুখী করিবার যে চেষ্টা, তাহা কৃত্রিম ও মস্তিষ্কের কার্য্য। এই কৃত্রিম পথেও যদি কিছুটা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা যায়, তবেই তাহা ফলপ্রসূ হয়। কিন্তু যদি ইহাতে হৃৎকমলে অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ পুরুষের চিন্তাটী না হয়, যদি পরমাত্মার উপাসনা ভক্তির আকার-রূপ ধারণা, ধ্যান ও সমাধির অধীন না হয়, তাহা হইলে উহা ফলপ্রসূ হয় না।

অপরের কা কথা, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাও বিচার-মার্গ অবলম্বন করিতে গিয়া মোহগ্রস্ত হইয়া যান। যে বিচার-প্রধান মার্গে মস্তিষ্কই একমাত্র সম্বল, কর্ম্মফলানুসারে সেই মস্তিষ্কের বিভিন্ন অবস্থা লাভ হয়—কখনও সুস্থ, কখনও বিকৃত ; সুস্থতার মধ্যেও আবার নানাপ্রকার তারতম্য-অবস্থা দৃষ্ট হয়। কিন্তু হৃদয় (হৃৎপিণ্ড নহে)— যাহা রুচির আধার, তাহা কর্ম্মফলের অধীন নহে। মস্তিষ্কের দ্বারা বিচার করিয়া কোনদিনই প্রীতিলাভ হয় না। Synthesis বা মিলনের মতই সংহিতা বা বেদের মত। হিতের সহিত যাহা বর্ত্তমান, তাহাই সংহিতা। সংহিতায় একমুখী বা মিলন করায়, ইহাকেই 'যোগ' বলে। বিয়োগ বা বিভাগই অহিত, উহাকে

analytical process বলে। নারায়ণের দিকে গতিতে যোগ হয়; উহাই মিলন বা Synthesis. Analytical মতবাদই সমস্ত মাংসদৃক্ বিশ্বের মত। এই মতবাদের মূলে আছে,—জাতিতে জাতিতে ভেদ, উদরে উদরে ভেদ, ভিটায় ভিটায় ভেদ অর্থাৎ স্থূল রক্তমাংস-দর্শনই ইহার ভিত্তি। Analysisএর দ্বারা অপরের উপর প্রভুত্বকামনা প্রবল হয়; আর Synthesisএর দ্বারা সেবা-বৃত্তির অভ্যুদয় হয়। **যত অন্তর্য্যামিদর্শন কম হইবে, ততই উদর-ভেদ প্রবল হইয়া বাদবিসম্বাদ, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, যুদ্ধবিগ্রহ ও প্রলয়ভয়ঙ্করী** রৌদ্র-লীলা চলিতে থাকিবে।

উদরভেদবাদী প্রকৃতিকে তুলোপেঁজা করিতে চাহে। যাহারা ইতিহাসে ও ভূগোলের বিভাগ প্রণালীকে বাস্তব সত্য মনে করে, তাহাদিগকে বঞ্চনা করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে ইতিহাস ও ভূগোলের বঞ্চনাময় রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।

অজাতরুচির পক্ষে বিচারপ্রধান মার্গ ও জাতরুচির পক্ষে রুচি-প্রধান মার্গ। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বিচার-প্রধান মার্গ—মনীষা বা মস্তিষ্কের পথ। স্বীয় অযোগ্যতার তীব্র-অনুভূতি হইতে রুচির উদয় হয়। প্রীতির আধার হৃদয়ই এই রুচির আবির্ভাবক্ষেত্র। এই বিচার ও রুচির পথে প্রত্যেকটীরই পূর্ব্বাঙ্গ ও পরাঙ্গ-ভেদ আছে।

সাম্মুখ্যমাত্রেরই নিদান—সাধুসঙ্গ। শাস্ত্রমূর্ত্তি সাধু বা মহৎ-হ্লাদিনী শক্তির দূত। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধু বা মহৎই শ্রীগুরুদেব; তিনি ব্রহ্মে

উপশমাশ্রয়। 'উপ আধিক্যেন' 'শম' নিষ্ঠা, আশ্রয় করিয়াছেন যিনি, তিনিই শ্রীগুরুদেব। তিনি নৈষ্ঠিকী ভক্তি অর্থাৎ ধ্রুবানুস্মৃতিতে পরমাবিষ্টতাপ্রাপ্ত। শ্রীমদ্ভাগবতরূপী শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় এই ভক্তভাগবতবর শ্রীগুরুদেব বা মহতের সন্ধান পাওয়া যায়।

উপাসনা বা অভিধেয়ের মধ্যে ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কেননা অন্যান্য সাধনের যাহা ফল, তাহা সমস্তই ভক্তি স্বতন্ত্রভাবে অনায়াসে দান করিতে পারেন। কিন্তু ভক্তির যে ফল তাঁহার আভাসও অন্যান্য সাধনের দ্বারা পাওয়া যায় না।

ভক্তির দুইটী লক্ষণ—(১) নবধা ভক্তির আকার থাকিবে ও (২) নৈরন্তর্য্য থাকিবে। নৈরন্তর্য্যটী অসাধারণ বা তটস্থ বা নিজস্ব লক্ষণ। আদৌ অর্পিতা অর্থাৎ ভাবিতা বা ভগবৎসুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতিযুক্তা হইয়া যদি এই ভক্তি অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে উহা শীঘ্রই সাধ্যভক্তি প্রীতিতে পর্য্যবসিত হইবে। ভগবৎসুখানুসন্ধান-স্মৃতিটী হ্লাদিনীর বৃত্তি। ভগবৎসুখানুসন্ধানযুক্ত নিরবচ্ছিন্ন অমৃতধারার ন্যায় স্মৃতি-সংযুক্ত যে নববিধ ভক্ত্যঙ্গ, ইহাই অকিঞ্চনা বা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালনদ্বারা যে বিষ্ণুতোষণ, তাহা ভক্ত্যাভাস বা প্রীণনাভাস। তাহার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়; আত্মার প্রসন্নতা বা সংসার-মুক্তি হইতে পারে, কিন্তু সুপ্রসন্নতা, বিমুক্তি বা প্রীতি হয় না। আবেশময়ী অকিঞ্চনা-ভক্তির দ্বারাই বিমুক্তি বা বিজ্ঞান অর্থাৎ অন্তর্বহিঃসাক্ষাৎকার লাভ হয়, মাধুর্য্যানুভব বা লীলারস আস্বাদন হয়।

ভক্তি ও ভক্তিযোগ—এই দুইটী পরিভাষার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। ভক্তি—অনুষ্ঠানময়ী ; ইহা ক্রিয়ারূপে ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত হয় ; আর ভক্তিযোগ ক্রিয়াময় ও তৎসহিত ইষ্টবস্তুর নিরন্তর সুখানুসন্ধানময়ী চিন্তা বা আবেশ-যুক্ত। ভক্তিযোগের দুইটী লক্ষণ—১) শ্রবণকীর্ত্তনাদি ক্রিয়া-লক্ষণমাত্র ; ইহা স্বরূপলক্ষণ। ২) আবেশ বা যোগরূপ নৈরন্তর্য্য ; ইহাই অসাধারণ লক্ষণ। প্রিয়ত্ব-ধর্ম্মই সম্বন্ধী পরতত্ত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আনন্দময় হইয়াও তিনি নবনবায়মানভাবে আনন্দী হন। 'দেহলীপ্রদীপন্যায়া'নুসারে পূর্ণতম আনন্দময়ের স্বরূপশক্তি নিজ প্রেমাস্পদ ও কায়ব্যূহ-সমন্বিত আপনাকে নন্দিত করেন। এই প্রিয়ত্ব-ধর্ম্ম পূর্ণতমভাবে মাদনদশাপ্রাপ্ত শ্রীর বশীভূত শ্রীকৃষ্ণে প্রকাশিত। তিনি শ্রীচরণকমলমধুদ্বারা শ্রীমদনমোহনরূপে, শ্রীমুখকমলমধুদ্বারা শ্রীগোবিন্দরূপে ও শ্রীবক্ষঃকমলমধুদ্বারা শ্রীগোপীনাথরূপে আত্মসাৎ করিয়াছেন যে শ্রীগৌড়ীয়গণকে, তাঁহাদের সেবাপরিপাটীতে লুব্ধ রাগানুগগণের ভক্তিযোগই শ্রীর বশীভূত শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবার একমাত্র উপায়। এই রাগানুগাভক্তি-যোগের লক্ষণ —তৃণাদপি সুনীচতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদত্ব। শ্রীদ্বারকা, শ্রীমথুরা ও শ্রীবৃন্দাবনবাসিগণের পদধূলিরূপে অভিমানই তৃণাদপি সুনীচত্ব। সহিষ্ণুতা বলিতে 'দয়া' ও 'অহিংসা' বুঝায়। ইষ্টদেবের সহিত মিলন করাইবার ইচ্ছাই দয়া। সর্ব্বপ্রকার দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়া দৌরাত্ম্যকারীর সর্ব্বোত্তম প্রতিশোধ অর্থাৎ দ্রোহরূপ মূল বীজ উৎপাটন করিয়া তাহাকে সুখী দেখিতে চাওয়া,

ইষ্টদেবের সহিত সেবা-সংযুক্ত করা,—ইহাই দয়া। অমানিত্ব-প্রতিষ্ঠার মূল আকর স্বরূপশক্তি ও তাঁহার বৈভবগণ, ইহা জানিয়া সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠাশা-রাহিত্য ও নিজ-প্রতিষ্ঠাভাসেও লজ্জানুভব। মানদত্ব—ইষ্টদেবের সহিত সম্পর্কযুক্ত দর্শন করিয়া মানদান, সর্ব্বত্র ভগবদ্‌বৈভব-দর্শন, ভগবদ্‌রূপ, গুণ, লীলা ও ধামের উদ্দীপন; ইহাই অন্ত্য-পরমহংস ধর্ম্ম। অন্তর্যামিদৃষ্টিতে ভূতানুকম্পা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক জীবে ইষ্টদেব ও ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধান-কারিণী হ্লাদিনীর স্ফূর্ত্তি—ইহাই হইল অহিংসা বা দয়াবৃত্তির ক্রম-বিকাশ-বিজ্ঞান।

ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানে যদি তন্ময়তা থাকে, তাহা হইলেই সহজে প্রীতি লাভ করা যায়। বৈধী ভক্তিতে যে তন্ময়তা, তাহাকে ধ্রুবানুস্মৃতি ও রাগানুগা ভক্তিতে যে তন্ময়তা, তাহাকে 'আবেশ' বলা যায়। রাগানুগা ভক্তির গতি বিদ্যুতের মত। বর্ণাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক শাস্ত্রবিধি-অনুসারে ভজন—বৈধী সাধন-ভক্তি; ইহাকে অনন্যা ভক্তি বলা যায়; আর অভিরুচি-সহকারে অভিমানযুক্ত ভজনই রাগানুগা ভক্তি। ইহার অপর নাম—অনন্যভাবা ভক্তি। সাধনভক্তি তরলা; তাঁহার দুইটী লক্ষণ—ক্লেশঘ্নী ও শুভদা। ভাবভক্তি সাধনভক্তি অপেক্ষা গাঢ়; তাহা মোক্ষলঘুতাকৃৎ ও সুদুর্ল্লভা; তৎসঙ্গে পূর্ব্বের দুইটী লক্ষণও আছে। প্রেমভক্তি অত্যন্ত গাঢ়াবস্থা-প্রাপ্ত; ইহা সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী; তদ্‌ব্যতীত পূর্ব্বের চারিটী লক্ষণও আছে। ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি ক্ষীর ও খোয়ার ন্যায় গাঢ়তায়

তারতম্যযুক্ত। সাধক-অবস্থার অভিরুচিই সিদ্ধাবস্থায় স্নেহে পর্য্যবসিত হয়।

কাব্যশাস্ত্রে 'সামাজিক' বলিয়া একটী পরিভাষা আছে। 'সামাজিক'-শব্দের অর্থ—কাব্যরস-আস্বাদক। এই সামাজিক যদি সহৃদয় অর্থাৎ সমঝ্‌দার না হ'ন, তাহা হইলে সম্যগ্‌ভাবে কাব্যরসাস্বাদন তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় না। মস্তিষ্কের দ্বারা আস্বাদন হয় না, ভালবাসা যায় না। মস্তিষ্কের দ্বারা পাপপুণ্য-বিচার বা নির্ব্বাণ লাভ পর্য্যন্ত হইতে পারে; কিন্তু প্রিয়জনের বৈশিষ্ট্যানুভব হয় না। আবেশের আধার—হৃদয়; নিরবচ্ছিন্না অভিরুচি বা আবিষ্টতাই হৃদয়গতি। স্মরণ ও ধারণা সাধন-ভক্তির পূর্ব্বাঙ্গ, অবিচ্ছিন্ন-মনোগতি হইতেই পরাঙ্গ আরম্ভ হইল। অভি-রুচির সহিত যে সম্যক্ কীর্ত্তন, তাহাই সংকীর্ত্তন। বহু ব্যক্তি মিলিত হইয়া একপ্রাণে, ঐক্যতানে অদ্বয়জ্ঞানের সুখানুসন্ধানরূপ চেষ্টায় আবিষ্ট অর্থাৎ সেই জ্ঞান, সেই ধ্যান, সেই জপ, সেই তপ—এইরূপ নিষ্ঠা লইয়া যে শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন, তাহাতে চমৎকার-বিশেষের পোষণহেতু শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয়। "হর্ষে প্রভু কহেন—শুন স্বরূপ-রামরায়! নাম-সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥" শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের—"ভক্তি-সাধন-শ্রেষ্ঠ শুনিতে হইল মন। প্রভু উপদেশ কৈলা নাম-সংকীর্ত্তন॥" (চৈ চ অ ২০।৮, ম ৬।২৪১)। শ্রীর বশীভূত কৃষ্ণের সুষ্ঠু কীর্ত্তনই শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।

"ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্ ॥"

(বি পু ৬।২।১৭, পদ্ম পু ৭২।২৫, বৃহন্নারদীয় পু ৩৮।৯৭)—বাক্যে যে কীর্ত্তনের কথা আছে, তাহা অভিরুচির সহিত কীর্ত্তন নহে। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন অর্থাৎ অভিরুচি বা আবেশের সহিত কীর্ত্তনই মূল গুরুপাদপদ্ম শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর নিজস্ব ভজন। এই নিজস্ব ভজনরত্নের নিগূঢ়কুঞ্চিকা শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামরায়ের নিকট হইতে তাঁহাদের মিত্রবর শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-প্রমুখ অষ্টগোস্বামী প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের মহাবদান্যতা 'জয়তাং সুরতৌ' ইত্যাদি শ্লোকে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরলীলায় তদপেক্ষা অধিক মহাবদান্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের উপাসনার কথাই শ্রীমদ্ভাগবত উপক্রমে বলিয়াছেন,—"সত্যং পরং ধীমহি।"

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনাই ভক্তি ; তাহা বেদনধর্ম্মাত্মিকা রসময়ী বিদ্যা। ইহারই অপর নাম—রাজগুহ্য-বিদ্যা ; কারণ, ইহা সমস্ত গুহ্যবিদ্যার মধ্যে রাজা—বেদের নিগূঢ় রহস্য।

—০—

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও দৃগ্‌দৃশ্য-বিচার

যিনি কোন বস্তু দর্শন করেন, তাঁহাকে বস্তুর 'দ্রষ্টা' বলে আর দ্রষ্টা যে বস্তুকে দর্শন করেন, সেই বস্তুকে 'দৃশ্য' বলে ; আর যাহা দ্বারা দর্শন করেন, তাহাকে 'দৃষ্টি' বলে। অনেক সময় দর্শনেন্দ্রিয়কেও 'দ্রষ্টা' বলিয়া ভ্রম হয়। যাহাকে আমরা এই চক্ষুর্দ্বারা বা যে-কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মাপিয়া লইতে পারি, তাহাই দৃশ্যবস্তু, আর যাহা মাপিতে পারে, তাহা 'দ্রষ্টা'।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ দৃগ্‌দৃশ্য-বিচার-সম্বন্ধে যে বিপ্লবময়ী ধারণা জগতের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা, অন্ততঃ আমি, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখ হইতেই সর্ব্বপ্রথম শুনিয়াছি।

যখন এই অযোগ্যতম পতিতাধম ভৃত্যাভাস শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে 'সরস্বতী-জয়শ্রী'র জন্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রুতলিপি লিখিতেছিল, তখন শ্রীল প্রভুপাদ আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন,—"আমাদের এত লোকের নিকট দৃগ্‌দৃশ্যের কথা বলিলাম, কিন্তু ইহা কাহারও কাণেই গেল না—কেহই ধরিতে পারিল না, একমাত্র' বাসুদেবই এই কথাটি ধরিতে পারিয়াছে। আমার সকল কথা এই কথাটির উপর নির্ভর করিতেছে।"

যখন শ্রীল প্রভুপাদ, সম্ভবতঃ বঙ্গাব্দ ১৩২৫ সনের গ্রীষ্মের সময়, দৌলতপুরে বৈষ্ণব-সম্মেলনে হরিকথা কীর্ত্তন করিতে-

ছিলেন, সেই সময় শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব আমাকে বলিয়াছিলেন,—

"শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে এই সময় একটি সম্পূর্ণ নূতন কথা শুনিলাম। 'জীবের আপনাকে কৃষ্ণভোগ্য দৃশ্য অভিমানই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। দ্রষ্টৃ অভিমানে জগৎকে ভোগ্যজ্ঞান বা ভোক্তৃ অভিমানে অহঙ্কার-ফলে অমঙ্গল লাভ হয়। জগতের প্রতি ভোগ্যদৃষ্টিতে অনুপাদেয়তা বা ভোগ্যত্ব দূর করিয়া সেব্যত্ব বা অপ্রাকৃতত্ব প্রকটন অর্থাৎ কৃষ্ণের সংসার ও গোকুল-দর্শনই জীবের নিত্যমঙ্গল ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ।" এই সিদ্ধান্তটি শুনিয়া মনে হইল, ইহা জগতের নিকট একটি—সম্পূর্ণ বিপ্লবের বাণী। 'আমি দ্রষ্টা নহি,—কৃষ্ণ-দৃশ্য,' 'আমি ভোক্তা নহি, – কৃষ্ণ-ভোগ্য' —এই বিচারের সম্পূর্ণ বিপরীত বিচারে জগৎ প্রধাবিত। জগতের ভোগিসম্প্রদায় আপনাদিগকে ভোক্তা ও দ্রষ্টা মনে করেন, ত্যাগি-সম্প্রদায় উহার তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে হারউ প্রতিবাদী হইয়া ভোক্তা ও দ্রষ্টার নির্ব্বিশেষ-ভাবই চরম মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রভুপাদের কাছে শুনিলাম,—আপনাকে ভোক্তা ও দ্রষ্টা মনে করা যেরূপ অমঙ্গল, ভোক্তৃ ও দ্রষ্টভাবের গলায় ফাঁসীরদড়ি ঝুলাইয়া দিয়া ভোক্তা ও দ্রষ্টার আত্মহত্যা ততোধিক অমঙ্গলের পথ। একমাত্র পরম ভোক্তা ও পরম দ্রষ্টার ভোগ্য ও দৃশ্য হইলেই পরম মঙ্গল। এতৎপ্রসঙ্গে প্রভুপাদ হিরণ্যকশিপুর কথা বলিয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু আপনাকে তাহার সভা-স্তম্ভের দ্রষ্টা জ্ঞান করিয়া তথায় ভগবানের অস্তিত্ব দর্শন অর্থাৎ বিষ্ণুকে

মাপিয়া নিতে চাহিয়াছিল, আর প্রহ্লাদকে পুত্ররূপে ভোগ্য জ্ঞান করিয়া নিজেকে তাঁহার ভোক্তা বলিয়া বিচার করিয়াছিল। কিন্তু অবিচিন্ত্যশক্তি-ভগবান্ কশিপুর চিন্তার অতীত নিত্যসিদ্ধ শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিয়া দ্রষ্টৃ-অভিমানী হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ ও বিষ্ণুর দৃশ্য-অভিমানী প্রহ্লাদকে প্রচুর কৃপা করিয়াছিলেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে শ্রীল প্রভুপাদের দৃগ্‌দৃশ্য বিচারের ঐ শিক্ষা-ব্যতীত আর একটি প্রসঙ্গও শুনিয়াছিলাম, সেও ১৩২৫ সনেরই কথা। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সহিত পুরুষোত্তমে গমন করিয়াছেন। একদিন শ্রীল প্রভুপাদ আচার্য্যদেবকে লইয়া শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে গমন করিলেন এবং স্বয়ং গরুড়স্তম্ভের পশ্চাতে থাকিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে করিতে বলিলেন,—'শ্রীগরুড়স্তম্ভের পশ্চাতে থাকিয়া আশ্রয়বিগ্রহের অনুগমন করিয়াই আমাদের শ্রীজগন্নাথ দর্শন করা কর্ত্তব্য।' সেই সময়ও প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"শ্রীজগন্নাথ—দৃশ্য নহেন, জগন্নাথ—দ্রষ্টা। জীব দ্রষ্টৃ-অভিমান পরিত্যাগ করিয়া যখন সম্পূর্ণভাবে জগন্নাথের দৃশ্য বা ভোগ্যরূপে শুদ্ধ স্বরূপগত অভিমান হয়, তখনই জীব সেবোন্মুখ হইয়া থাকেন এবং সেই সেবোন্মুখ প্রেম-নেত্রেই শ্রীজগন্নাথের দর্শন লাভ করেন। যতক্ষণ আমরা মনে করি, আমরা জগন্নাথকে দেখিয়া লইব, ততক্ষণ আমরা জগন্নাথ না দেখিয়া কাঠ, পাথর, বৌদ্ধ সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকের ইঁটো-ভোগ্য-মূর্ত্তিবিশেষরূপে দেখিয়া থাকি। মাংসদৃক্ কখনও

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকে মাপিয়া লইতে পারে না। শ্রৌতদৃক্, নাম-দৃক্ হইলেই আপনাকে দৃশ্য উপলব্ধিতে সচ্চিদানন্দ বস্তুর দর্শন হয়।"

আমি যখন শ্রীল প্রভুপাদকে মুখে "বৈকুণ্ঠ-বস্তু", "মুকুন্দ-দয়িত" বা "মহাপ্রভুর পার্ষদ" বলিয়া তাঁহার অনেক সেবা করিয়াছি, তিনি আমার ধামের কুকুর (!!!), আমাকে বা আমাদিগকে তিনি সিদ্ধ-প্রণালী দিয়াছেন, প্রভুপাদকে আমরা ইচ্ছামত উঠাইয়াছি, বসাইয়াছি, প্রভুপাদের সহিত নিভৃতে অবস্থান করিয়াছি ইত্যাদি বিচার করি, তখন নিজেকে দ্রষ্টা বিচার করিয়া প্রভুপাদকেই দৃশ্য বিচার করিয়া ফেলি! নিজেই প্রভুপাদের আসন অধিকার করিবার চরম পাষণ্ডতা প্রদর্শন করিয়া প্রভুপাদকে শিষ্য করিতে যাই! আপনাকে দৃশ্য-বিচারই — শিষ্য বিচার।

সম্ভবতঃ যখন 'গৌড়ীয়ে'র ৩য় বর্ষ চলিতেছিল, সেই সময়ে একদিন ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোডের বাড়ীতে অবস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংলগ্ন গৌড়ীয়-প্রিন্টিং-ওয়ার্কসে জনৈক স্বনাম-খ্যাত সুপ্রবীণ অধ্যাপক শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। শ্রীল প্রভুপাদ তখন গৌড়ীয়-প্রিন্টিং-ওয়ার্কসে বসিয়া আমাদের নিকট হরিকথা বলিতেছিলেন। কথা-প্রসঙ্গে সেই অধ্যাপক মহোদয় বলিলেন যে, তিনি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট গীতা পাঠ করিয়াছেন এবং শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কোন কোন সন্তানের সহিত তাঁহার পরিচয় আছে ইহা শুনিবামাত্র

শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত অধ্যাপককে বলিয়া উঠিলেন,—"আপনি কোন দিনই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে দেখেন নাই, তাঁহার নিকট যান নাই।" এই কথা শুনিয়া উক্ত অধ্যাপক আশ্চর্য্যান্বিত ও মর্ম্মাহত হইয়া বলিলেন,—"আমি অমুক সন হইতে অমুক সন পর্য্যন্ত রামবাগানে ভক্তিভবনে ঠাকুরের নিকট গিয়া গীতা পাঠ করিয়াছি, আর আপনি ইহা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিতেছেন! আমি আপনার বয়োজ্যেষ্ঠ; শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমুক অমুক পুত্রের সহিত আমার পরিচয় আছে।" এই কথা শুনিয়া শ্রীল প্রভুপাদ আরও উত্তেজিত হইয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ আচার্য্য-কেশরীমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আপনি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট গীতা পড়া দূরে থাকুক্, কোন দিনই তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে কোন লোক দেখিতে পারে না। আমাদের বিচার—শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কোন ছেলেপিলে হয় নাই। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই জড়জগতের কোন বস্তু ছিলেন না। যাহারা আপনাদিগকে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্রষ্টা মনে করেন, তাহাদের নিকট শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর আত্মগোপন করিয়াছেন। শ্রীভক্তিবিনোদের দৃশ্য জ্ঞান হইলে শ্রীভক্তিবিনোদ আত্মপ্রকাশ করেন।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই বিচার শুনিয়া সুপ্রবীণ অধ্যাপক মহাশয় স্তম্ভিত হইলেন কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের কথা ধরিতে পারিলেন না। স্থান ত্যাগ করিবার সময় একটুকু অসন্তোষের সহিতই শ্রীল প্রভুপাদকে বলিয়া গেলেন—"আমি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের

নিকট কখনও গমন করি নাই, কখনও তাঁহাকে দেখিতে পর্য্যন্ত পাই নাই, আপনার এইরূপ দাম্ভিকতাপূর্ণ উক্তির সহিত আমার মতভেদ আছে। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাকে কত স্নেহ করিতেন, তাঁহার নিকট গেলে আমাকে না খাওয়াইয়া ছাড়িতেন না, অনেক গোপনীয় কথা বলিতেন, আপনিও তাহা সময় সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, অথচ আপনার ন্যায় সাধুপুরুষের এইরূপ অশোভন উক্তি শুনিয়া আমি যারপরনাই দুঃখিত হইলাম।"

এত বড় স্বনামধন্য শিক্ষিত প্রবীণ ব্যক্তি চটিয়া যাইবেন বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ সত্যকথা বলিতে একটুকুও সংকোচ বোধ করিলেন না,—আবার বলিলেন,—"যতক্ষণ আপনার আধ্যক্ষিকতা আছে, ততক্ষণ আপনি শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে দেখিতে পারেন না; তাঁহার দৃশ্য-বিচারে প্রতিষ্ঠিত হউন।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই সকল উপদেশ ও আদর্শ প্রতিনিয়তই জানাইয়াছেন,—শ্রীশ্রীল **প্রভুপাদের দৃশ্য উপলব্ধিই তাঁহার শিষ্যত্ব।** শ্রীল আচার্য্যদেবের সম্বন্ধে আর একটি কথা বলি। স্বধামগত পণ্ডিত *** শাস্ত্রী এক সময় ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন-রোড্স্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে কোন মহোৎসবোপলক্ষে প্রসাদ সম্মান করিতে বসিয়া ছিলেন। তিনি কিছু উত্তম-ভোজন-প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। যখন তিনি মল্লপূপ (মালপো) ভোজন করিতেছিলেন, সেই সময় শাস্ত্রী মহাশয়কে শ্রীল আচার্য্যদেব বলিলেন,— "শাস্ত্রী মহাশয়, আপনি মালপো খাইতেছেন, না মালপো আপনাকে খাইতেছেন, ইহা বিচার করিবেন। 'পণ্ডিত হইয়া

কেন না কর বিচার।' প্রসাদপ্রাপ্তির সময় এই বিচারে অধিষ্ঠিত থাকিবার জন্যই বৈষ্ণবগণ 'সাধু সাবধান' বলিয়া ভক্তিবিনোদ-গীতি গান করিয়া থাকেন।" শ্রীল আচার্য্যদেবের এই কথা শুনিয়া ও ইহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া শাস্ত্রী মহাশয় অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং দেশে গিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিলেন,—"আমি গৌড়ীয়-মঠে মহোৎসবে গিয়াছিলাম, কিন্তু প্রসাদ সেবনের সময় আমি হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখ পাইয়াছি। আমি অভাবগ্রস্ত লোক নহি, আমি গভর্ণমেণ্ট হইতে পেন্সন পাইয়া থাকি, আমার দুই পুত্র অনেক অর্থ অর্জন করে, আমার গৃহিণী নানাপ্রকার ভোজ্যদ্রব্য নির্ম্মাণে পরম নিপুণা, আমি মালপো অনেক খাইয়াছি, মঠে-মালপো খাইতে যাই নাই। কিন্তু আপনার শিষ্য অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ আমাকে বলিয়াছেন,—'মালপোকে আপনি খাইতেছেন, না মালপো আপনাকে খাইতেছেন'?-এই কথা শুনিয়া আমার হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে। আমি কি এত লোভী যে, আমাকে মালপো খাইয়া ফেলিবে ;"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যখন এই পত্রটি পাঠ করিয়া রহস্যের সহিত আমাদের নিকট এই প্রসঙ্গ বলিতেছিলেন, তখন আমরা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত কিরূপে পণ্ডিতেও বুঝিতে পারেন না, তাহা অনুভব করিতেছিলাম। শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেছিলেন,—বাসু-দেবের বিচার কি জগতের পণ্ডিত বুঝিতে পারিবে ? আমাদের মধ্যেই বা কয়জন লোক আছে যে, এইসকল কথা ধরিতে পারে।

মানবজাতির সাধ্য নাই এইসকল কথা বুঝিতে পারে। কৃষ্ণ-কৃপা হইলেই এইসকল কথা বুঝা যায়।”

পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট এই সকল কথার মর্ম্ম বুঝাইয়া একখানি পত্র লেখা হইল। ভগবৎপ্রসাদকে ভক্ষণ করা যায় না, মাপা যায় না; ভগবৎপ্রসাদ যদি আমাদিগকে ভক্ষণ করেন, গ্রাস করেন, আত্মসাৎ করেন, তবেই আমাদের প্রপঞ্চ জয় হয়—মঙ্গল হয়। ‘প্রসাদ’ অর্থে—‘অনুগ্রহ’, ‘কৃপা’। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট—মহা-মহাপ্রসাদ। শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৬।৪৬) বলিয়াছেন,—

“ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কার-চর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি॥”

নিজেকে ভগবৎপ্রসাদ বা বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্টের দৃশ্য বা ভোগ্য জ্ঞান করিতে হইবে, দ্রষ্টা বা ভোক্তৃ-বুদ্ধি হইলে আরও অধিকতর মায়ার রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে।

“ব্রহ্মবন্নির্ব্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ”।

শাস্ত্রী মহাশয়কে এই সকল কথা লেখা হইল বটে, কিন্তু তিনি বিষয়টি সুষ্ঠুরূপে অবধারণ করিতে পারিলেন বলিয়া মনে হইল না। শ্রীল প্রভুপাদের বিচার এইরূপ বিপ্লবময়। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম এত বড়! তাঁহার ভক্তিসিদ্ধান্ত অতুলনীয়। তিনি বলিতেন,—“শ্রীনবদ্বীপধামে বাসের অভিনয় করিয়াও আমরা শ্রীধামে বাস করিতে পারি না, শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট গমন ও দীক্ষা শিক্ষার অভিনয় করিয়াও শ্রীগুরুপাদপদ্মে অভিগমন ও তাঁহার দর্শন করিতে পারি না; মৎকুণ, ছারপোকা, মশক

প্রভৃতির ন্যায় সাধু-মহাপুরুষের শ্রীঅঙ্গের সংলগ্ন প্রদেশে থাকিয়াও সেই অপ্রাকৃত বস্তুর স্পর্শ দূরে থাকুক্, দর্শন করিতে পারি না, ইহা শ্রীল প্রভুপাদের একমাত্র অতিমর্ত্ত্য সিদ্ধান্তেই আমরা পাই।

শ্রীল প্রভুপাদ রাবণের মায়াসীতা-হরণের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর"—এই বাক্যের দ্বারাও আমাদিগকে দৃগ্-দৃশ্য-বিচারের কথা পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে সর্ব্বদা 'আধ্যক্ষিক', 'আধ্যক্ষিকতা' প্রভৃতি শব্দের নিরাসব্যঞ্জক বাক্য এবং 'অধোক্ষজ' 'অপ্রাকৃত' প্রভৃতি শব্দের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করাইবার আদর্শ দেখা যাইত। ইহাও শ্রীল প্রভুপাদের দৃগ্-দৃশ্য-বিচারের প্রতি জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার আর একটি উদ্দেশ্য ও পরম করুণা।

—:—

আনুগত্য

শ্রীভক্তিপথের মূল কথাই—'আনুগত্য'। কর্ম্মপথ ও ভক্তি-পথ একমাত্র আনুগত্য-বৈশিষ্ট্যের কষ্টি-পাথরে পরীক্ষিত হয়। 'আনুগত্য'-অর্থে জীবের সহজধর্ম্ম স্বতন্ত্রতার উচ্ছেদ বুঝায় না। বস্তুতঃ স্বতন্ত্রতার প্রকৃত সদ্ব্যবহারই—'আনুগত্য'। শ্রীভগবান্ জীবকে স্বতন্ত্রতারূপ মহা-রত্ন দান করিয়াছেন। তটস্থা শক্তিজাত

জীবের স্বভাবে সর্ব্বদাই স্বতন্ত্রতা-বৃত্তি অনুস্যূত আছে। স্বরূপবিস্মৃতি বা সম্বন্ধ-জ্ঞানের বিস্মৃতি হওয়ায় জীব মায়িক জগতের প্রভুত্ব-কামনাকেই স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতা মনে করিতেছে। বস্তুতঃ জড়জগতের উপর প্রভুত্ব করিবার চেষ্টায় উহার অধীনতাই বরণ করিতে হয়। একমাত্র মায়াধীশ ব্যতীত কেহই মায়া বা প্রকৃতির 'প্রভু' হইতে পারে না ; তবে জীব যখন শ্রীমায়াধীশের শ্রীপদরেণুর অভিমানে উদ্বুদ্ধ থাকেন, তখন মায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এজন্য শ্রীশ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের পদধূলিরূপে যাঁহারা সংসারে বিচরণ করেন, তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীন। ভূমণ্ডল, সসাগরা পৃথিবী, ধন, রত্ন, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির প্রভু স্বাধীন নহে। কারণ, সে মায়ার অধীন, কাম, ক্রোধ-লোভাদি রিপুর অধীন, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার অধীন। সামান্য কামিনীর কটাক্ষ ভুবনবিজয়ী বীরকে জঘন্যতম ক্রীতদাস করিয়া ফেলে। অতএব তাহার স্বাধীনতা কোথায় ? রাজ্য জয় বা যুদ্ধ জয় করিলেই স্বাধীন হওয়া যায় না। যিনি দুর্ব্বার মনকে জয় করিয়াছেন, যাঁহার আত্মা বিকসিত হইয়াছে, যিনি প্রীতিবলে অজিতকে জয় করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত জয়ী ও স্বাধীন।

কর্ম্মপথ ও ভক্তিপথের আনুগত্যের মধ্যে অন্তর্নিষ্ঠা পৃথক্। কর্ম্মপথেও আনুগত্যের যথেষ্ট পরিচয় আছে। প্রত্যেক যোদ্ধা প্রধান সেনাপতির বা নিজের উচ্চতর কোন কর্ম্মচারীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া থাকে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে, সঙ্ঘে, সমিতিতে, রাজ্যে, সমাজে, নিত্যনৈমিত্তিক গার্হস্থ্যজীবনে পরস্পর আনুগত্যের

পরিচয় পাওয়া যায়! আনুগত্য না থাকিলে জগচ্চক্র স্তব্ধ হইয়া যায়। সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলতা বিপ্লব, অরাজকতা, স্বেচ্ছাচারিতা, বিদ্রোহ ও বিনাশের দৃশ্য উপস্থিত হয়। গ্রহোপগ্রহের মধ্যেও আনুগত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐরূপ আনুগত্য না থাকিলে একমুহূর্ত্তে বিশ্ব ধ্বংস হইয়া যাইত।

কর্ম্মপথের আনুগত্যের মধ্যে স্বাভাবিক প্রীতি নাই ও তাহা অহৈতুক অপ্রতিহত ভাববিশিষ্ট নহে। কোন নিম্ন কর্ম্মচারী যে উচ্চ কর্ম্মচারীর আনুগত্য করে, তাহাতে প্রীতি অপেক্ষা বাধ্য-বাধকতার ভাবই অধিক প্রবল। নিম্ন কর্ম্মচারী বাধ্য হইয়া উচ্চ কর্ম্মচারীর সেবা করে এবং সেইরূপ বাধ্য-বাধকতাও সাময়িক ও সকপট। কর্ম্মপথে সর্ব্বাঙ্গীন ও সার্ব্বকালিক আনুগত্য নাই; কিছু সময়ের জন্য দৈহিক আনুগত্য প্রকাশিত থাকিলেও মানসিক ও আন্তরিক আনুগত্যের যথেষ্ট অভাব আছে। কর্ম্মপথে নিম্ন কর্ম্মচারী উচ্চতর কর্ম্মচারীর দৈহিক আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াও অনেক সময় উর্দ্ধ্বতন কর্ম্মচারীর নানা প্রকার সমালোচনা করিয়া থাকে অর্থাৎ একমাত্র বাধ্যবাধকতা ব্যতীত স্বাভাবিক প্রীতির সহিত আনুগত্যের কোন লক্ষণই এই জগতের কর্ম্মপথে দেখিতে পাওয়া যায় না। এস্থানে প্রজা যে রাজার আনুগত্য করে, তাহাও অপস্বার্থযুক্ত। পৃথিবীর রাজভক্তি, মাতৃপিতৃভক্তি, ছাত্রের শিক্ষকের আনুগত্য সমস্তই অপস্বার্থপর।

বর্ত্তমান জগতে অনেকেই অভিমত প্রকাশ করেন ও লক্ষ্য করেন যে, জগৎ যতই তথা-কথিত সভ্যতা বা প্রগতির দিকে

প্রধাবিত হইতেছে, ততই ব্যক্তিত্বের প্রতি আনুগত্যের মনো-ভাবকে দাস-মনোভাবসুলভ দুর্ব্বলতা বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এমন কি, পরমেশ্বরের ব্যক্তিত্বের প্রতি আনুগত্যও দুর্ব্বল চিত্তেরই পরিচায়ক বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতেছে। ঐরূপ মনোভাব পরি-হারের জন্য রাজনীতি হইতে সমাজনীতি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র নানা-প্রকার বিদ্রোহ, বিপ্লব ও আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এখন আর কোন রাজার নিরঙ্কুশ ইচ্ছার নিকট প্রজাগণ আত্মসমর্পণ করিতে চাহে না। রাজা প্রজাবৃন্দের শাসক, সাধারণের মনো-ভাব তাহা স্বীকার করে না, বরং গণশক্তি বা প্রজাশক্তিই রাজার শাসক, রাজা প্রজাবৃন্দের সেবক-মাত্র, অথবা রাজার অস্তিত্বেরই কোন প্রয়োজন নাই, গণশক্তি নিজেরাই নিজেদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিধাতা,—এইরূপ মনোভাবের আদর দৃষ্ট হয়। এইরূপ মনো-ভাব হইতে প্রাচীনকালের Despotism Oligarchy, Fascism, Democracy, Communism, Socialism প্রভৃতি নানা মতবাদে অভিভূত হইয়াছে। বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী গণ-আন্দোলনসমূহ একচ্ছত্র ব্যক্তিত্বের আনুগত্যের প্রতি বিদ্রোহরূপে নানা আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। Dictatorship এর আনুগত্যও কতটা নিরঙ্কুশ, বা তাহা কতদিন স্থায়ী হইবে, তদ্বিষয়েও সন্দেহ আছে। এখন ছাত্রগণ শিক্ষকগণের শাসন ও আনুগত্যের বিরুদ্ধে দণ্ডধারণ ও বিদ্রোহ করিতে শিখিয়াছে, শিক্ষকগণের শাসনের সমীচীনতা লইয়া বিতর্ক উপস্থিত করিতেছে। পত্নী পতির অপ্রতিহত আনুগত্যের প্রতি বিতর্ক উপস্থিত করিয়াছে। তথাকথিত যুগে

এইরূপ নানাভাবে আনুগত্যের প্রাচীন দুর্গ আক্রান্ত ও বিপর্যাস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহা অচিরেই যে ধূলিসাৎ হইবে ও তাহাতে সমস্ত জগতে যে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইবে ও হইতেছে, তাহারও যথেষ্ট লক্ষণ দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বে পার্থিব রাজনীতি ও সমাজনীতির আনুগত্যের দুর্গে কপটরূপ সৈন্যসামন্ত ও অস্ত্র-শস্ত্র সজ্জিত ছিল; বর্ত্তমানে অন্য প্রকার অপস্বার্থপরতার বৈজ্ঞানিক সৈন্য গণশক্তির বর্ম্ম ধারণ করিয়া ঐ প্রাচীনপন্থী সৈন্যকে আক্রমণ করিয়াছে. ইহাই প্রাচীন ও অর্ব্বাচীনের মধ্যে পার্থক্য। বস্তুতঃ কর্ম্মপথের আনুগত্যের প্রাচীন আদর্শ ও বর্ত্তমানে উহার প্রতি বিদ্রোহ স্বরূপতঃ একই প্রকার। কারণ, উভয় বিচারই কপট ও অপস্বার্থপরতাযুক্ত।

কর্ম্মপথের ন্যায় জ্ঞান ও যোগপথাদির আনুগত্যের আদর্শও প্রতিহত হইবার যোগ্য ও সাময়িক। নির্ভেদ-জ্ঞানপথে বস্তুতঃ শিষ্য ও গুরু বলিয়া কোন শব্দই থাকিতে পারে না; কেবলমাত্র কোন স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে অর্থাৎ নিজেকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া জানিবার উদ্দেশ্য-মূলে তথাকথিত গুরু ও তথাকথিত শিষ্যের মধ্যে আনুগত্যের একটি সাময়িক চুক্তি করিয়া লওয়া হয়। নির্ভেদজ্ঞানপথে গুরু ও শিষ্য— কাহারও নিত্যত্ব নাই। সুতরাং আনুগত্যের নিত্যত্ব কিরূপে থাকিবে? জ্ঞানপথে গুরুর নিত্যত্ব না থাকায় সাময়িক তথাকথিত আনুগত্যও আন্তরিক হইতে পারে না; কারণ, যাহা নিত্য ও সত্য নহে, তাহা নিশ্চয়ই অবাস্তব ও কাল্পনিক। নির্ভেদজ্ঞানপথে

গুরুও সত্য নহে, শিষ্যও সত্য নহে ; অতএব তথাকথিত সাময়িক আনুগত্যও সত্য নহে। নির্ভেদজ্ঞানযোগের সহযোগী রাজযোগ ও হঠযোগেও গুরু ও শিষ্যের নিত্যত্ব না থাকায় আনুগত্যের নিত্যত্ব নাই। জ্ঞানপথে আনুগত্যকে অনেক সময় দুর্ব্বলতা বলিয়া কল্পনা করা হয়। আনুগত্য আবার কি? 'আমিই ব্রহ্ম', 'আমিই সেই' —আমি আবার কাহার আনুগত্য করিব? ইহাও কোন কোন ব্রহ্মবাদীর বিচার।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগপথে ঐশ্বর্য্যের নিকটই আনুগত্য প্রদর্শিত হয়। ঐশ্বর্য্যের বিরাট্ রূপে মুগ্ধ হইয়া ক্ষুদ্রতা ঐশ্বর্য্যের ভাগীদার হইবার জন্য সাময়িক আনুগত্য প্রদর্শন করে; কখনও বা শাসন, ভয়, কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রভৃতিহেতু আনুগত্য প্রদর্শন করিতে বাধ্য হয়। বস্তুতঃ শুদ্ধভক্তিপথের আনুগত্য এই জাতীয় নহে। কোন ব্যক্তিবিশেষ আমা অপেক্ষা অধিক পণ্ডিত, জ্ঞানী, মানী, কর্ম্মদক্ষ, যোগ্যতাসম্পন্ন,– এইরূপ মনোভাবের সহিত যদি কোন আনুগত্য কোথায়ও প্রকাশিত হয়, তবে তাহা শুদ্ধভক্তিপথের আনুগত্য নহে। শাসনের ভয়ে আনুগত্য ও ভক্তিপর আনুগত্য নহে। যদি কোন শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠানে বা সঙ্ঘে অবস্থানকারী কোন ব্যক্তির এইরূপ মনোভাব থাকে যে, যদি গুরুবর্গের শাসন না মানি, তাহা হইলে আমার এই প্রতিষ্ঠানে থাকা সম্ভব হইবে না, অথবা অমুক ব্যক্তি আমা অপেক্ষা অধিক পণ্ডিত, অতএব তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করা যাউক্, আমার নৈতিক চরিত্র

নাই, অমুক ব্যক্তি আমা অপেক্ষা অধিক চরিত্রবান্, অতএব তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করা যাউক্,—এই জাতীয় বিচার থাকিলেও শুদ্ধভক্তিপর আনুগত্য হইবে না। ঐরূপ আনুগত্য —হৈতুক, তাহা আবার অন্য হেতুর দ্বারা যে-কোন মুহূর্ত্তে অপগত হইতে পারে। ইহার দৃষ্টান্ত শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠান-পরিত্যাগ-কারী, আচার্য্যের আনুগত্যের ছলনা-প্রদর্শনকারীও কিছুকাল পরেই তাহা পরিত্যাগকারি-সম্প্রদায়ের আদর্শে দৃষ্ট হইয়াছে। অমুকের সহিত বিদ্যা-বুদ্ধিতে আমরা পারিয়া উঠিব না, কিংবা আনুগত্য না দেখাইলে আমরা মঠ-মন্দিরে বাস করিতে পারিব না, অথবা বহু লোকে যাহাকে সম্মান করিতেছে, তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই,—এই সকল হেতু বা মনো-ভাবের সহিত যে আনুগত্যের ছলনা প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা ষড়যন্ত্রের ঝাপ্‌টা বাতাসে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। ইহাকে শুদ্ধ-ভক্তিপথের আনুগত্য বলে না। কপটী, সমংসর বিড়ালব্রতী, পৈশুন্য-ধর্ম্মাশ্রিত, ক্রূর, বিশ্ববিদ্বেষী, মিছাভক্ত, নির্ব্বিশেষবাদী প্রভৃতি ব্যক্তিগণের মধ্যে এইরূপ আনুগত্যের যথেষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ইহারা আজ যাহাকে 'বাবা' বলে, কাল তাহাকে 'শালা' বলিতে পারে। ইহারা মাতৃভক্তি প্রদর্শন করিয়া যে-কোনমুহূর্ত্তে মাতাকে 'বামা' বা 'বারবনিতা' বলিতে পারে। ইহারা একই সময়ে দন্তে তৃণ ও হস্তে যষ্টি ধারণ করিয়া আনুগত্যের ছলনা প্রদর্শন করিতে পারে। ইহা আনুগত্য ত' নহে-ই, পরন্ত আনুগত্যের ছলনায় পৈশুন্য ও কৈতব।

আনুগত্যের প্রধান প্রতিবন্ধক মৎসর। সমৎসরের হৃদয়ে কখনও আনুগত্যধর্ম্ম প্রকাশিত হয় না। সরল, আত্মমঙ্গল-পিপাসু, সত্যানুসন্ধিৎসু, নিরভিমানী ব্যক্তির হৃদয়ে আনুগত্যধর্ম্ম প্রকাশিত হয়। যাহারা অধিক অভিনন্দনপত্র প্রদান বা জয়ধ্বনি করে, তাহাদেরই আনুগত্যধর্ম্ম আছে, তাহাও নহে। হৃদয়ে কপট ও মর্ত্ত্যবুদ্ধি থাকা-কাল-পর্য্যন্ত পূর্ণ আনুগত্যধর্ম্ম উদিত হইতে পারে না।

সর্তহীন, অহৈতুক আনুগত্য ও শরণাগতি একই বস্তু। শ্রীগুরুপাদপদ্মে, শ্রীবৈষ্ণবপাদপদ্মে অহৈতুক আনুগত্য না হইলে কেবল লোক দেখাইবার জন্য বা শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবকে বঞ্চনা করিবার জন্য দৈহিক ও বাচিক আনুগত্যের ছলনা দ্বারা কখনও শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পূর্ণ কৃপা পাওয়া যায় না। পূর্ণবস্তুর সন্ধান প্রাপ্ত হইতে হইলে অহৈতুক পূর্ণ আনুগত্য আবশ্যক।

অহৈতুক অপ্রাকৃত আনুগত্য ও প্রাকৃত ক্রীতদাস-মনোভাব এক নহে। প্রাকৃত দাস-মনোভাব জীবকে কাম-ক্রোধাদির দাস করিয়া দেয়। প্রাকৃত ক্রীতদাস-মনোভাব মানুষকে জঘন্যতম পশু করিয়া থাকে; আর শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে বিক্রীত পশুবৎ শরণাগতি বা আনুগত্য জীবকে শ্রীসচ্চিদানন্দবিগ্রহের পূর্ণ সন্ধান প্রদান করিয়া পূর্ণ চেতনের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেয়। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার শরণাগতিতে যে "সর্ব্বস্ব তোমার চরণে সঁপিয়া পড়েছি তোমার ঘরে" গান করিয়াছেন, তাহাই পূর্ণ আনুগত্যের আদর্শ। ইহা দুর্ব্বলতা নহে, ইহা অপেক্ষা বলিষ্ঠতা

আর কিছু নাই। যাহার বিন্দুমাত্রও হৃদয় দৌর্ব্বল্য আছে, সেই ব্যক্তি কিছুতেই ঐ আদর্শের অনুসরণ ও আচরণ করিতে পারিবে না।

কেহ কেহ বলেন যে, "পৃথিবীতে সদ্‌গুরু বা প্রকৃত বৈষ্ণব নাই, এজন্যই তাহারা আনুগত্যধর্ম্মের সদ্ব্যবহার করিতে পারে না। অপাত্রে উহার ব্যবহার করিলে হিতে বিপরীত ফল হইবে।" এইরূপ মনোভাব কপট ও জাড্যাশ্রিত। যাঁহার হৃদয়ে ভক্তি আছে, তিনি ভক্তির পাত্র ভগবানের সন্ধান পান না, ইহা বস্তুতঃ ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকাররূপই প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা। আনুগত্যধর্ম্মের আভাসও উদিত হইলে স্বয়ং কৃষ্ণই ঐরূপ সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তির নিকট প্রকৃত পাত্র প্রেরণ করেন। অসূয়া বা মাৎসর্য্য এবং মর্ত্ত্যবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবৎপ্রেরিত জনে আনুগত্যধর্ম যাজন করিতে করিতে জীব কৃতকৃতার্থ হন। প্রকৃত আনুগত্যধর্ম্মে আত্মবিজ্ঞাপন-প্রচারের অন্যাভিলাষ নাই।

"যেদিকে বাতাস' নীতি আনুগত্যধর্ম্মের আদর্শ নহে। উহা সুবিধাবাদের গোলামী। 'ধামাধরা" কার্য্য আনুগত্য নহে, উহা কপটতামাত্র। অনেক অন্যাভিলাষী ব্যক্তি আনুগত্য-প্রদর্শনের ছলনায় ভক্তিরাজ্যেও ঐরূপ নীতি প্রদর্শন করিয়া থাকে।

'অতিবাড়ী ভক্তি' (?) অর্থাৎ অন্তরে কপটতা রাখিয়া বাহিরে ভক্তির আতিশয্য প্রদর্শনও আনুগত্য নহে।

আনুগত্য অর্থে—সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তন। আন্বীক্ষিক বিদ্যা-বুদ্ধির দ্বারা যাহারা সাধুর আচরণ সমালোচনা করিয়া আনুগত্যের

ছলনা প্রদর্শন করে, তাহাদের আনুগত্য নাই। মহাপুরুষগণ লোক-কল্যাণের জন্য যে আচরণ প্রদর্শন করেন, তাঁহার পূর্ণানুগত্য করিলেই মঙ্গল হইবে, তাহাতে দোষ-দর্শন বা তাঁহার সমালোচনা করিলে ভক্তি-পথ হইতে পতন হয়। তবে কোনও শ্রেষ্ঠ মহাজনের নিকট হইতে পূব মহাজনের আচরণের সঙ্গতি ও তাৎপর্য্য পরিপ্রশ্নের দ্বারা জানিয়া লওয়া দোষাবহ নহে। তদ্দ্বারা পূর্ব্ব মহাজনের আনুগত্যে দৃঢ়তা ও শ্রদ্ধাই বর্দ্ধিত হয়। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামি-প্রভু সনোড়িয়া বিপ্রের গৃহে ভিক্ষা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে অন্য লোকের বিচার শ্রবণ না করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু মহাজনের আচরণের আনুগত্যের আদর্শই প্রকট করিয়াছেন। যখন সনোড়িয়া বিপ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐরূপ আচরণ-দর্শনে মূর্খ লোক তাঁহাকে নিন্দা করিবেন, তখন —

> "প্রভু কহে,—শ্রুতি, স্মৃতি, যত ঋষিগণ।
> সবে এক-মত নহে. ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ॥
> ধর্ম্ম-স্থাপন-হেতু সাধুর ব্যবহার।
> পুরী গোসাঞির যে আচরণ, সেই ধর্ম্ম সার ॥"
>
> (চৈঃ চঃ মঃ ১৭।১৮৪-১৮৫)

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীযোগপীঠে যে বিচার-ধারা ও ব্যবহার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা যদি আধ্যক্ষিক বিচারের তৌলদণ্ডে পরিমাপ করিয়া কেহ তাহাতে শুদ্ধভক্তির বিচারের অভাব লক্ষ্য করেন এবং নূতন বিচার ও ব্যবহার

প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন, তবে তাহা পাষণ্ড মত হইবে। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবর্ত্তিত যে-কিছু ব্যবহার, তাঁহার আনুগত্য করাই মঙ্গলজনক। স্বয়ম্ভু অর্চ্চাবতার শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের সেবকগণ বাহ্যদৃষ্টিতে শুদ্ধাচার বা সদাচার-সম্পন্ন না হইলেও শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ-নির্ম্মাল্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ও পূর্ব্ব-মহাজন-গণ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমরা বিনা বিচারে তাঁহাদের আনুগত্য করিব। কারণ, শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামী-প্রভু শ্রীভক্তি-সন্দর্ভে (২৮৪ অনুচ্ছেদে) শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্য (ভাঃ ৪।১৮।৩-৫) উদ্ধার করিয়া এই সিদ্ধান্তই স্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন,—

"অস্মিল্লোঁকেঽথবামুষ্মিন্ মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
দৃষ্টা যোগাঃ প্রযুক্তাশ্চ পুংসাং শ্রেয়ঃ প্রসিদ্ধয়ে॥
তানাতিষ্ঠতি যঃ সম্যগুপায়ান্ পূর্ব্বদর্শিতান্।
অবরঃ শ্রদ্ধয়োপেত উপেয়ান্ বিন্দতেঽঞ্জসা॥
তাননাদৃত্য যোঽবিদ্বানর্থানারভতে স্বয়ম্
তস্য ব্যভিচরন্ত্যর্থা আরব্ধাশ্চ পুনঃ পুনঃ।"

অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী মুনিগণ ইহলোক বা পরলোক বিষয়ে মানব-গণের পুরুষার্থ-সিদ্ধির জন্য উপায়-সমূহের দর্শন ও অনুষ্ঠান করিয়াছেন। পরবর্ত্তী যে-পুরুষ শ্রদ্ধা-সহকারে সেই পূর্ব্বজন-প্রদর্শিত উপায়-সমূহের সম্যক্ আচরণ করেন, তিনি সত্বর সেই সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বিদ্বান্ বা অবিদ্বান্ যে-পুরুষ ঐ সকল উপায়ের অনাদর-পূর্ব্বক স্বয়ং পুরুষার্থ-সমূহের অনুষ্ঠানে

প্রবৃত্ত হন, তাহার আরব্ধ পুরুষার্থ-সমূহও বারম্বার অসিদ্ধ হইয়া থাকে।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে পৃঃ ২।৪৬, স্কন্দবাক্যে উক্ত হইয়াছে,—

"স মৃগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থাঃ সন্তাপবর্জ্জিতঃ।
অনবাপ্তশ্রমং পূর্ব্বে যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে॥"

অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ সম্যগ্‌রূপে সন্তাপ-বর্জ্জিত ও শ্রেয়ঃসমূহের হেতুস্বরূপ যে পথ অবলম্বন করিয়া অনায়াসে স্বধামে প্রস্থান করিয়াছেন, সেই পথই অনুসরণীয়।

এইরূপ আনুগত্যানুশীলনের মধ্যে সুবুদ্ধি-যোগ অর্থাৎ সেবোন্মুখতা না থাকিলে আবার বিপদ উপস্থিত হয়। অন্ধ-আনুগত্যের ছলনার দ্বারা এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া ফেলিতে হয় ও তৎফলে জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত হয়। মহাজনের **আনুগত্যের নামে** তাঁহার **অনুকরণ** করিয়া বহু সাধক ফল্গুত্যাগী বা পৈশাচিক তামস-স্বভাব-বৈরাগী, কেহ কেহ বা অতিভোগী পাষণ্ডী হইয়া পড়িয়াছে। **অনুকরণ আনুগত্য নহে, সেবোন্মুখতার সহিত প্রকৃত অনুসরণই আনুগত্য।** সেবোন্মুখের হৃদয়ে কখনও সুবুদ্ধিযোগের অসদ্ভাব হয় না।

আনুগত্যকারীকেই বৈষ্ণব বা শ্রীগুরুদেব শক্তি সঞ্চার করেন। আনুগত্যহীন শ্রীগুরুদেবের শক্তি লাভ করিতে পারে না। কেবল শিষ্য-নামের ছাপ থাকিলেই তাহাকে অনুগত বলা যায় না। শিষ্যের-নামের ছাপ লইয়া বহু পাষণ্ডী জগতে বিচরণ করিতে পারে। রামচন্দ্রপুরী প্রেম-ভক্তিকল্পতরুর 'প্রথম

অঙ্কুর" জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী প্রভুর শিষ্যের অভিমান করিয়াও তাঁহার আনুগত্য না করায় সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্রপুরী নিজেকে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী প্রভুর শিষ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন, কিন্তু তাঁহার আনুগত্য করিতেন না; এজন্যই তিনি নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়িয়াছেন। আবার সদ্গুরুর প্রতি আনুগত্যের বাহ্য পরিচয় আছে, অথচ বাস্তব হরি-ভজনোন্মুখতা নাই, যদি এইরূপ হয়, তবে জানিতে হইবে তথায় কুটিলতা আছে, উহা আনুগত্য নহে। আনুগত্যের ফলে বাস্তব হরিভজন দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। শিষ্যের আনুগত্য-দর্শনে শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে আত্মসাৎ করিবেন—শিষ্যের সমস্ত চিত্তবৃত্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত এক তাৎপর্য্যপর হইবে।

মহাজনগণের পদাবলী বা সাহিত্য প্রভৃতির লিখনে লিপিকারের যে সকল ভ্রম দৃষ্ট হয়, উহাদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টাকে প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় মহাজনানুগত্য বলিয়া প্রচার করে। বস্তুতঃ লিপিকারের ভ্রম-প্রমাদাদি-সংরক্ষণে একগুয়েমি প্রদর্শন করাকে আনুগত্যের অপব্যবহারই বলা যায়। অসংসাম্প্রদায়িকতাও আনুগত্য নহে। বাস্তবসত্যে সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত যে স্বতঃসিদ্ধ সুবিশ্বাস ও সর্ব্বাত্মসমর্পণ, তাহাই আনুগত্য। তাহা অহৈতুক, অপ্রতিহত, নিত্য ও সেবোন্মুখতা-বর্দ্ধনকারী। হস্তিস্নানের ন্যায় সাময়িক আনুগত্যের ছলনা অহৈতুক আনুগত্য নহে। অহৈতুক আনুগত্যের দ্বারাই আত্মমঙ্গল লাভ হয়।

—•—

কপটতা

বিমুখবিমোহিনী মহামায়া সাধনরাজ্যে প্রবিষ্ট জীবের নিকট যে-সকল নাট্য বিস্তার করিয়া জীবকে কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে বিক্ষিপ্ত করিবার চেষ্টা করে, তন্মধ্যে কপটতার নাট্য অন্যতম। সাধক জীবনে মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে কপটতা একটি প্রধান কণ্টক। শ্রীরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু তাঁহার মনঃশিক্ষায় আমাদের জন্য এই উপদেশটি কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"অরে চেতঃ প্রোদ্যৎকপটকুটিনাটীভর-খর-
ক্ষরন্মূত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মানমপি মাম্।
সদা ত্বং গান্ধর্ব্বাগিরিধরপদপ্রেমবিলসৎ-
সুধাম্ভোধৌ স্নাত্বা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ সুখয় ॥"

(মনঃশিক্ষা ৬ষ্ঠ শ্লোক)

রে চিত্ত! তুমি কুটিনাটীভাবজনিত সুস্পষ্ট কপটতারূপ গর্দ্দভক্ষরিতমূত্রে স্নান করিয়া কি হেতু নিজেকে এবং আমাকে দগ্ধ করিতেছ? পরন্তু, তুমি সর্ব্বদা শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্ম-বিষয়ক প্রেমরূপ সুশোভন সুধাসমুদ্রে স্নান করিয়া নিজেকে এবং আমাকেও অতিশয় সুখ প্রদান কর।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন যে, কামক্রোধাদি ছয়টি রিপু বাহিরে শত্রুর কার্য্য করে এবং ঐ শত্রুগুলিকে

সহজেই ধরা যায় ; কিন্তু 'কপটতা' সর্ব্বাপেক্ষা গুপ্ত শত্রু। সেই কপটতারূপ গর্দ্দভের মূত্রে স্নান করিয়া যাহারা আপনাদিগকে পবিত্র মনে করে, তাহাদের কোনদিন মঙ্গল হয় না। 'কপটতা' না ছাড়িলে ভক্তিরস-সাগরে স্নানকেলি সম্ভব নহে—

"কাম, ক্রোধ আদি করি', বাহিরে সে সব অরি,
আছে এক গূঢ় শত্রু তব।
'কপটতা' নাম তা'র তা'রে কুটিনাটী ভার,
খরমূর্ত্তি পরম কিতব।।
ওরে মন গূঢ় কথা ধর।
সেই খরমূত্রে ভুলে, স্নান করি, কুতূহলে,
'পবিত্র' বলিয়া মনে কর॥
বনে বা গৃহে থাক, সেই খরে দূরে রাখ,
যার মূত্রে তুমি আমি জ্বলি।
ছাড়িয়া কাপট্যবশ, যুগলবিলাসরস-
সাগরে করহ স্নানকেলি॥"

(মনঃশিক্ষা, ৬৯ শ্লোক)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'কাপট্য'কে ধৃষ্টা প্রতিষ্ঠাশা চণ্ডালিনীর 'উপপতি' বলিয়াছেন। বেশ্যা প্রতিষ্ঠাশা কাপট্যউপপতির সঙ্গে বহু প্রকার জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত করে।

আমাদের হৃদয়ে কাপট্যের আবির্ভাব কেন হয়, ইহার মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, আমরা জড় প্রতিষ্ঠাশালাভের

আশায় অনেক সময়ই কপট হইয়া পড়ি। আমার মনে যে-সকল অনর্থ, অপরাধ বা অসুবিধা আছে, তাহা জানিলে পাছে আমার সম্মানের লাঘব হয়, এইজন্য আমি সেই সকল অসুবিধাকে গোপন করিয়া থাকি। এইরূপ গোপন করিবার চেষ্টা হইতেই 'কপটতা'র উদয় হয়। ভজনরাজ্যের প্রধান শত্রু কাপট্য ও প্রতিষ্ঠাশা সর্ব্বদাই এক সঙ্গে বাস করে। তাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর মনঃশিক্ষার পদ্যানুবাদে লিখিয়াছেন—

"কপটতা হইলে দূর, প্রবেশে প্রেমের পূর,
জীবের হৃদয় ধন্য করে।
অতএব বহু যত্নে, আনিবারে প্রেমরত্নে,
কাপট্য রাখহ অতি দূরে ॥
শুন মন! নিগূঢ় বচন।
প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টাধম, চণ্ডালিনী হৃদে মম,
তয কাল করিবে নর্ত্তন ॥
কাপট্য তত্নপপতি, না ছাড়িবে মম মতি,
শ্বপচিনী যাহে হয় দূর।
তদর্থে যতন করি', প্রভু-প্রেষ্ঠ-পদ ধরি',
সেবা তুমি করহ প্রচুর ॥"

(মনঃশিক্ষা, ৭ম শ্লোক)

যখন আমরা বাহিরের স্তুতি ও নিন্দার প্রতি ব্যস্ত হইয়া পড়ি অর্থাৎ লোকের স্তুতিতে উৎসাহিত ও নিন্দায় ম্লান হই,

তখনই জানিতে হইবে যে, প্রতিষ্ঠাশারূপিণী বেশ্যাচণ্ডালিনী আমাদের হৃদয়ে বাসস্থান গ্রহণ করিয়াছে। সেই বেশ্যা তখনই তাহার কাপট্যরূপ উপপতিকে তাহার গৃহে ডাকিয়া আনিবে। কাপট্যের সঙ্গ ব্যতীত কামুকী প্রতিষ্ঠাশা একমুহূর্ত্তও বাস করিতে পারে না। উভয়ের সঙ্গফলে বহু অনর্থ অবৈধ সন্তানের আবির্ভাব হয়।

সাধক যদি অন্যান্য শত শত অনর্থগ্রস্ত হইয়াও নিষ্কপট হন, তবে তাঁহার কোন-না-কোনদিন মঙ্গলের উদয় হয়। কেন না, নিষ্কপট সাধক সরলভাবে নিজের সমস্ত অনর্থ অন্তরের সহিত গুরুবৈষ্ণবের নিকট ব্যক্ত করিয়া মঙ্গলের পথে চলিবার উপদেশ লাভ করিতে পারেন। কপটতা থাকিলে হৃদয়ে কখনও অনুতাপ বা আর্ত্তির উদয় হয় না; হরিভজনের জন্য তীব্র জ্বালা বা অভাব বোধ থাকে না। কপট কেবল জড়প্রতিষ্ঠার আশায় অন্তরের গুপ্ত অনর্থগুলিকে বাহিরে 'চূণকাম' করিয়া লোকের নিকট গোপন করিবার চেষ্টা করে। প্রতিষ্ঠাশা লাভের অধ্যবসায় ও তজ্জন্য নানা-প্রকার অসৎ চেষ্টা কপটের হৃদয় জুড়িয়া বাস করে; কিন্তু সরল ব্যক্তি নিজেকে অত্যন্ত অধমাধম, অকিঞ্চিৎকর, অযোগ্যতম বলিয়া সর্ব্বক্ষণ অন্তরের সহিত উপলব্ধি এবং গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে সেবা করিতে করিতে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে সরলভাবে আর্ত্তি জ্ঞাপন করায় আত্মমঙ্গলানুসন্ধানেই তাঁহার অধ্যবসায় বর্দ্ধিত হয়।

কপট ব্যক্তি 'বড় আমি' হইবার জন্য অখিলচেষ্টাযুক্ত, আর

সরল ব্যক্তি 'ভাল আমি' হইবার জন্য হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার্থ অখিল-চেষ্টান্বিত। 'কাপট্য' প্রতিষ্ঠাশা-কাঙ্গাল, আর 'সারল্য' হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার আশায় সর্ব্বদা আশাবন্ধযুক্ত।

কপটের হৃদয়ে দৈন্য নাই, উহা শুষ্ক, পাষাণতুল্য ; তাহা দম্ভদৈত্যের রাজধানীস্বরূপ। দৈন্য-বৃত্তিটি প্রকৃত সরল ব্যক্তিরই অন্তরের সহজ বৃত্তি। সম্পূর্ণ সরল না হইলে হৃদয়ে কখনই দৈন্যের আবির্ভাবই হইতে পারে না ; কিন্তু কপট ব্যক্তিগণের মধ্যেই দৈন্যের অভিনয় অতিমাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। কপট ব্যক্তিগণ লোকের নিকট সম্মান লাভ ও দৈন্যের আবরণে স্ব-স্ব অনর্থ গোপন করিবার জন্য ঐরূপ অভিনয় করিয়া থাকে।

কপট ব্যক্তিগণ দৈন্যের অভিনয় করিয়া নিজদিগকে অত্যন্ত 'অপরাধী', 'জীবাধম', 'বিষয়বিষ্ঠার কীট প্রভৃতি অনেক কিছু মুখে বলিয়া থাকে ; কিন্তু কোন প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী বৈষ্ণব যদি ঐ কপট ব্যক্তিগণকে তাহাদের মঙ্গলের জন্য ঐ সকল কথা স্পষ্টভাবে বা কৌশলে বলিয়া দেন, তখনই কপট ব্যক্তিগণের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কপট ব্যক্তিগণ সেই শুভানুধ্যায়ী গুরুবৈষ্ণবকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। কপট ব্যক্তিগণের নিজস্ব অনর্থ দোষগুলিকে তাহারা আরও অধিকতর পল্লবিত করিয়া শুভানুধ্যায়ী শিক্ষকবর্গের প্রতি আরোপ করিবার চেষ্টা করে। ইহা প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে যে, আমরা অনেক সময় গুরুবৈষ্ণবের নিকট দৈন্যের অভিনয় করিয়া তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিয়াছি ; কিন্তু যখন সেই

গুরুবৈষ্ণব অকৈতবে কৃপা করিবার উদ্দেশ্যে 'গৌড়ীয়ে' বা 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশে' কিংবা তাঁহাদের হরিকথার মধ্যে আমাদের অনর্থগুলিকে কৌশলে জানাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, আমাদের কাপট্যগুলিকে 'চোখে আঙ্গুল দিয়া' দেখাইয়া দিবার যত্ন করিয়াছেন, তখনই আমরা গুরুবৈষ্ণবকে মৎসর ভাবিয়া আমাদের প্রতিষ্ঠার লাঘব হইতেছে দেখিতে পাইয়া গুরু, বৈষ্ণব, 'গৌড়ীয়', 'নদীয়া-প্রকাশ' বা তাঁহাদের বাণীর চিরবিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছি। নিজের অনর্থ বা দোষগুলির কথা নিজের মুখে বলিলে তাহা অনেক সময়ই 'দৈন্যোক্তি' বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা আমার প্রতিষ্ঠাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু শুভানুধ্যায়ী গুরুবৈষ্ণব আমার দোষগুলি ধরিয়া দিলে তাঁহাদের মঙ্গলবাণী আর "আমার দৈন্যোক্তি" বলিয়া বাজারে বিকায় না এবং তদ্দ্বারা আমার প্রতিষ্ঠাও খর্ব্ব হইয়া পড়ে।

কপটতা-রাক্ষসী যে কত প্রকার 'বহুরূপিণী' হইয়া আমাদিগকে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা হইতে বঞ্চিত করিতেছে, তাঁহার ইয়ত্তা নাই। কখনও সুনীতি, কখনও পবিত্রতা, কখনও সংযম, কখনও সন্ন্যাস, কখনও সাধুর বেশ, কখনও উৎকট বিষয়-বৈরাগ্য, কখনও অত্যদ্ভুত ভাব-প্রবণতা প্রভৃতি আকার লইয়া আমাদের হৃদয়ে কাপট্য তাহার নাট্য বিস্তার করিতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম্মের লক্ষণ এই যে, তাহা সকল প্রকার কপটতা-লক্ষণ হইতে বিমুক্ত—ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভিক

শ্লোকে কীর্ত্তিত হইয়াছে। জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামী ও অন্যান্য আচার্য্য-গণও শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্মের এই লক্ষণ বলিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে ও সকল বৈষ্ণবাচার্য্যই তাঁহাদের সিদ্ধান্তবাণীতে 'নির্ব্বিশেষবাদকে'ই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর কাপট্য বা কৈতব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—

"তা'র মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥"

—(চৈঃ চঃ আদি ১ম পঃ)

'নির্ব্বিশেষবাদে'র ন্যায় আত্মঘাতী কাপট্য আর কিছুই নাই। নির্ব্বিশেষবাদ' উৎকট বিষয়-বৈরাগ্য ও সুনীতির আবরণে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের বিদ্বেষে আত্মনিয়োগ করে। বৌদ্ধ, জৈন ও কেবলাদ্বৈতবাদিগণের সমস্ত শাস্ত্র ইহার উৎকৃষ্ট সাক্ষ্যস্বরূপ। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু এবং সকল বৈষ্ণবাচার্য্য এইজন্যই নির্ব্বিশেষ-বাদকে কোন প্রকারেই আদর করেন নাই।

কপটতা একমাত্র স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের একচেটিয়া সম্পত্তি। শ্রীকৃষ্ণই অদ্বিতীয় 'শঠ' ও 'কপট'। জীব তাঁহার অনুকরণ করিতে গেলে নিজের মুদ্রাদ্বারাই নিজে দণ্ডিত হইয়া থাকে।

কপটতার প্রতীকস্বরূপ পূতনা বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সহিত কপটতা করিয়া 'ধাত্র্যুচিত গতি' লাভ করিয়াছিলেন। এই উদাহরণ দেখাইয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় অনেক সময়

কপটতার আশ্রয় করিয়া থাকে; কিন্তু এখানে একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বিষয়বিগ্রহের সহিত কপটতা করিয়া সেবার আভাসে কাহারও কাহারও মঙ্গল হইতে দেখা গেলেও আশ্রয়বিগ্রহগণের সহিত কপটতা করিলে তাহার আর রক্ষা নাই। রাবণ ত্রিদণ্ডীর বেশ ধারণ করিয়া কপটতাপূর্ব্বক আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীসীতাদেবীকে ভোগ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তৎফলে তাহার 'নির্ব্বিশেষ গতি' লাভ হইয়াছে। কপটতার প্রধানতম দণ্ডই 'নির্ব্বিশেষগতি' বা 'আত্মহত্যা'।

শ্রীকৃষ্ণ জটিলা, কুটিলা, অভিমন্যু প্রভৃতি বহির্ম্মুখগণের সহিত কপটতা করিয়াছেন। শ্রীবৃষভানুনন্দিনী ও তাঁহার গণ সকলেই বহির্ম্মুখগণের সহিত কপটতা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছেন। রাগমার্গীয় ভজনে 'কপটতা' একটি প্রধান কৌশল; তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে—

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতধৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোক্ত শ্লোকঃ)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ প্রভৃতি মহাজনগণ বহির্ম্মুখ ও বিজাতীয় লোকগণের সহিত কপটতা করিয়া যে-সকল হরি-ভজনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা জগতের বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ ধরিতে পারে নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কপট-সন্ন্যাসলীলা,

শ্রীরায় রামানন্দের বিষয়ীর ন্যায় অবস্থানপূর্ব্বক বহির্ম্মুখ-লোক বঞ্চনা নির্ব্বিশেষবাদী কপট ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারে না।

পরম নিষ্কপট অপ্রাকৃত বৈষ্ণবগণ বহির্ম্মুখ লোকের সহিত কপটতা করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট হরিভজনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহারা কখনও হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সহিত কপটতা করেন নাই। গুরু-বৈষ্ণবের সহিত কপটতা করিলে তাহার আর রক্ষা নাই। বিশেষতঃ দক্ষতম যোদ্ধা বা সেনাপতি অস্ত্র-প্রয়োগের যে-সকল কৌশলে অভ্যস্ত, সেই সকল কৌশল যদি নবীন শিক্ষানবীশগণ প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে নিজের অস্ত্রে নিজেই আত্মবিনাশ লাভ করে।

কপটের আর একটি লক্ষণ এই যে, সে কিছুতেই আনুগত্যময় জীবন যাপন করিতে পারে না। 'কাপট্য' ও 'আনুগত্য' —দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম। কপট "হাম্ বড়া" ভাব লইয়া সর্ব্বদা কপট-শিরোমণি বিষয়বিগ্রহের ন্যায় সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতাকামী; এজন্য গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি আনুগত্য-ধর্ম্ম তাহাতে নাই।

অনেক সময় আমরা গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি অন্তরে মর্ত্ত্যবুদ্ধি পোষণ করিয়া লোক-দেখান শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করি। ঐরূপ কপটতার মধ্যে ভক্তির লেশ নাই, পরন্তু আমাদের প্রতিষ্ঠা-কাঙ্ক্ষারই পূতিগন্ধ পাওয়া যায়। কেহ কেহ গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি কপটতা করিয়া এতটা ভক্তির অভিনয় ও ভাব-প্রবণতা প্রকাশ করে যে, ক'এক দিনের মধ্যেই ঐ কপটতা ধরা পড়িয়া যায়। তাহারা অচিরেই গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি সংশয়াত্মা ও ভিতরে

ভিতরে ছিদ্রানুসন্ধিৎসু হইয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধী ও নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়ে। এইরূপ কপটতাময় আনুগত্যের অভিনয় যাহাদের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে, তাহারা কোনও কালে মঙ্গল লাভ করিতে পারে না।

যেই জন কৃষ্ণ ভজে, সে বড় চতুর"—এই বাক্যেতে বৈষ্ণবতার লক্ষণ 'চতুরতা' বলিয়া একটি কথা আছে। সেই 'চতুরতা' অর্থে ধূর্ত্ততা বা কাপট্য নহে। যিনি যতটা সরল নিষ্কপট ও গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি একান্ত আনুগত্যযুক্ত, তিনি ততটা কৃষ্ণভজনকারী প্রকৃত চতুর। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন সুবিমল হেম,
এই ফল নৃলোকে দুর্ল্লভ।
কৈতবে বঞ্চনা মাত্র, হও আগে যোগ্য পাত্র,
তবে প্রেম হইবে সুলভ॥"

কপট সর্ব্বদাই মিথ্যাবাদী; তাহার মন ও মুখ সর্ব্বদা পৃথক্। কপটের হৃদয় হইতে অতি সুকোমলা আত্মবৃত্তি আত্মগোপন করিয়া বহু দূরে অবস্থান করে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সরল ও নিষ্কপট ব্যক্তিগণকেই 'সৎসঙ্গ' বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"যাঁহারা সরল ও নিষ্কপট, তাঁহারাই 'সৎসঙ্গ।"—(আঃ বিঃ ভাঃ টিঃ)

এই কপটতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে অতি সরল ও নিষ্কপট ব্যক্তিগণের সঙ্গ ও আশ্রয়-বিগ্রহগণের একান্ত আনুগত্য ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। তাই শ্রীল ঠাকুর

ভক্তিবিনোদের বাণী পুনরায় অনুকীর্ত্তন করিয়া আমরা দুষ্ট মনকে বলিতেছি—

"কাপট্য তত্নপপতি, না ছাড়িবে মম মতি,
শ্বপচিনী যাহে হয় দূর।
তদর্থে যতন করি', প্রভু প্রেষ্ঠ-পদ ধরি,
সেবা তুমি করহ প্রচুর ॥
তেঁহ প্রভু সেনাপতি, বিক্রম করিয়া অতি,
শ্বপচিনী-সঙ্গ ছাড়াইয়া।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমধনে, দিবে কবে অকিঞ্চনে,
বলে ভক্তিবিনোদ কাঁদিয়া ॥"

* * *

"অবিদ্যা-বিলাসবশে ছিলে তুমি জড়রসে,
দুষ্টতা হৃদয়ে পাইল স্থান।
হ'লে তুমি শঠরাজ, ভুলিলে আপন কাজ,
হৃদয়ে বরিলে অভিমান ॥
এবে উপদেশ শুন, গাইয়া যুগল গুণ,
গোষ্ঠে গোষ্ঠে করহ রোদন।
দয়া করি' গিরিধর, শুনিয়া কাকুতি-স্বর,
তবে দোষ করিবে শোধন ॥"

—(মনঃশিক্ষা ৭ম ও ৮ম শ্লোক)

—০—

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও রাধাদাস্য

"শ্রীবার্ষভানবীদেবী-দয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥"

বক্তব্যবিষয়টি গুরু হইতেও গুরুতর, গুরুতর হইতেও গুরুতম। অনর্থযুক্ত কামক্রোধাসক্ত বদ্ধজীবের 'ছোট মুখে' শ্রীল প্রভুপাদের রাধাদাস্যের 'বড়কথা' শুনিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবগণ উপহাস করিবেন, সন্দেহ নাই; তবে শ্রীল প্রভুপাদের বহুদিন পূর্ব্বের একটি আশীর্ব্বাদের কথা এ প্রসঙ্গে মনে হইতেছে, একথাটি স্বয়ং শ্রীল আচার্য্যদেবও জানেন। একবার ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান কালে বার্ষিক উৎসবের সময় শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভুর তিথিতে শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে, তাঁহার সভাপতিত্বে শ্রীল দাস গোস্বামি-প্রভুর সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। সেই বক্তৃতা শুনিয়া শ্রীল প্রভুপাদ এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, সাক্ষাদ্‌ভাবে বহুজন-সমক্ষে আমাকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—'যতদিন পর্য্যন্ত না আপনি একলক্ষ লোককে এইসকল কথা শুনাইতে পারিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত আপনার মুক্তি নাই। আবার মুক্ত হইয়াও আপনাকে এইসকল কথাই কীর্ত্তন করিতে হইবে, কৃষ্ণ-কীর্ত্তনই আপনার নিত্যধর্ম্ম জানিবেন।'

আমি একজন অতি বদ্ধ জীব হইলেও শ্রীল প্রভুপাদের অপরিসীম আশীর্ব্বাদে ও শ্রীল আচার্য্যদেবের অবিচ্ছিন্ন কৃপায়

মুক্তকুলের উচ্ছিষ্ট মহামহাপ্রসাদের চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া মায়া জয় করিবার জন্য নিত্য সৌভাগ্য পাইয়াছি ও সেই সাহসেই এখানে দাঁড়াইয়াছি।

"উচ্ছিষ্ট-ভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি" ॥

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরিত্রটি শ্রীরাধাদাস্যের পরিপূর্ণ আদর্শ। তাঁহার যাবতীয় স্বেচ্ছাসমূহকে রাধাদাস্যরূপে অবগত না হইলে তাঁহার চরিত্রে সূরিগণও মোহপ্রাপ্ত হইবেন, তাঁহার চরিত্রের কার্য্যাবলী, আচার-প্রচারসমূহ অসামঞ্জস্যকর ও অসঙ্গতিপূর্ণ বলিয়া মনে হইবে। নিজেশ্বরী শ্রীবার্ষভানবীর সেবার জন্য—রাধামাধবের নিত্যমিলন-সঙ্ঘটন-সেবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ গণমতের নিকট এক বিপ্লববাদের প্রচারক সাজিয়াছিলেন, লোকগঞ্জনা ও নানা-প্রকার কলঙ্কের ডালি বরণ করিয়াছিলেন এবং শিষ্যনামধারিগণের নিকটও তাঁহার আচার ও প্রচারকে অসামঞ্জস্যকর পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া ধারণা করাইয়াছিলেন—এই সকলই তাঁহার রাধাদাস্যের উদাহরণ।

তিনি তাঁহার কোনও বিশেষ অন্তরঙ্গাভিমানী শিষ্যের প্রসঙ্গে শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ১৩৪১ বঙ্গাব্দের ১৮ই শ্রাবণ এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"লোকগঞ্জনার ভয়ে শ্রীবার্ষভানবী দেবী কৃষ্ণ-সেবা পরিত্যাগ করেন না। আমাদের সহিত বিরোধ করিয়া যে **অরিষ্টবৃষ** উলুইচণ্ডীসেবা আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতেও আমাদের নৈরাশ্যের

কারণ নাই। শ্রীমান্ * * যদি অভিমন্যুর অনুগমনে অভিযান করে, তাহা হইলে আমরা কেবল দুঃখিত হইব।”

—(পত্রাবলী ৩য় খণ্ড, ২৫ পৃঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের এই কথার মধ্যে তাঁহার ঐকান্তিক রাধা-দাস্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সুদীর্ঘকাল যাবৎ শ্রীল প্রভুপাদপদ্ম-সেবার অভিনয়কারী অন্তরঙ্গাভিমানী ব্যক্তি যখন স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিলেন, তখন পৃথিবীর অবুঝলোক ইহা দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে নানা গঞ্জনার ভাগী করিবেন; এমন কি শ্রীল প্রভু-পাদের অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যত্বে, শিক্ষা দীক্ষার প্রণালীতে সন্দিহান হইবেন। সেই সকল গঞ্জনার ভয়ে শ্রীল প্রভুপাদ কি শ্রীরাধা-গোবিন্দ-মিলিত-তনু-শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞময়ী সেবা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন? তিনি কি তাঁহার গোষ্ঠ্যানন্দিত্ব পরিত্যাগ করিয়া বিবিক্তানন্দী বা নির্জ্জনভজনানন্দী হইয়া জগতের প্রতি নিষ্ঠুর হইয়াছিলেন ও আশ্রয়বিগ্রহের নিত্য সেবাধিকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন? অরিষ্টবৃষ যদি কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রতাচরণের অভিনয়ে চিদ্‌বিরাগী বা চিদ্‌বিলাসী শ্রীল প্রভুপাদকে জড়বিলাসী মনে করিয়া শ্রীবার্ষভানবীর ছায়াশক্তির আরাধনা করেন, তবে কি তাহা শ্রীরাধাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীভক্তিবিনোদের সেবা হইবে? কাজেই সেইরূপ আনুকরণিক প্রতিযোগিতা দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও নৈরাশ্যের উদয় হইতে পারে না। শ্রীবার্ষভান-বীকে বা শ্রীভক্তিবিনোদকে অরিষ্টবৃষ ভোগবুদ্ধি করায় কৃষ্ণ-হস্তেই নিহত হইয়াছিল বা হইবে। স্বরূপ-শক্তিকে কেহ ভোগ করিতে পারে না—গুরুদেবকে কেহ ভোগ করিতে পারে না।

শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গশিষ্য অভিমান করিয়াও আমরা **'অভিমন্যুর অনুগমনে অভিযান"** করিতে পারি, ইহা শ্রীল প্রভুপাদ স্বলেখনীতে জানাইয়াছেন। অভিমন্যু শ্রীরাধার পতি বা ভোক্তা বলিয়া নিজেকে অভিমান করে, বস্তুতঃ সে পতি নহে। গোলোকেও এই অভিমান শ্রীবার্ষভানবীর কৃষ্ণসেবার সৌন্দর্য্যের পুষ্টি বিধান করে। অভিমন্যুর শ্রীরাধার পত্যভিমান তাহাকে একচেটিয়া অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের কামসরোবরের অদ্বিতীয়া কমলিনী কোমলা শ্রীরাধার প্রতি যে জড়কামের উদ্ভব করায়, সেই জড়কাম কখনও স্বরূপ-শক্তিতে প্রযুক্ত হইতে পারে না বলিয়া কামের বাধাপ্রাপ্তিতে প্রতিনিয়তই অভিমন্যুর অন্তরে ক্রোধের উৎপত্তি করায়। 'মন্যু' শব্দের অর্থ ক্রোধ; 'অভি' উপসর্গের দ্বারা অভিমন্যুকে 'সর্ব্বতোভাবে ক্রোধের মূর্ত্তি' ইহাই বুঝাইতেছে। অভিমন্যু—অতৃপ্ত প্রাকৃত কামুক মর্ত্ত্যজীব, তাই অন্তরে তাহার ক্রোধের আগ্নেয়গিরি অনুক্ষণ প্রজ্বলিত। অভিমন্যু বাহিরে অনেক সময় প্রশান্ত মূর্ত্তি, লোকরঞ্জক হাস্য-লাস্য-বিভূষিত থাকিলেও অতৃপ্ত কামের প্রজ্বলিত আগ্নেয় পর্ব্বত তাহার অন্তরে গুপ্ত রহিয়াছে। অভিমন্যু জটিলার পুত্র। জটিল বুদ্ধি জগতে তীক্ষ্ণধী বা বণিক বুদ্ধি। চলিত কথায় "পাটোয়ারী বুদ্ধি" বলিয়া প্রচারিত, তাহা হইতেই অভিমন্যুর জন্ম। এজন্য অনেক সময়েই বৃন্দাদেবী অভিমন্যু-জননী জটিলা ও চন্দ্রাবলীর প্রবৃত্তি জানিবার জন্য সূক্ষ্মবুদ্ধি ও শোভা নাম্নী শারিকা-দ্বয়কে নিয়োগ করিতেন।

পতি (?) বঞ্চনা, আর্য্যজন বঞ্চনা করিয়া কৃষ্ণসেবা করাই শ্রীরাধারাণীর কৃত্য। শ্রীরাধার সখী ও দাসী মঞ্জরীগণ শ্রীরাধার সেই পতি (?)-বঞ্চনা-কার্য্যেই সহায়তা করিয়া শ্রীরাধাদাস্য করেন। অভিন্ন-শ্রীবার্ষভানবী শ্রীল প্রভুপাদের চরিত্রের প্রতি-ছত্রে-ছত্রে এই বঞ্চনালীলা রূপানুগগণের আনুগত্যময় সেবানেত্রে অনু-ধাবন করা যায়। শ্রীল প্রভুপাদ ইহা স্বমুখে বহুবার বিশেষ বিশেষ স্থলে বলিয়াছেন। কএক বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৩৩৫ বঙ্গা-ব্দের ৩১শে আশ্বিন শ্রীল প্রভুপাদ স্বমুখে এই কথা বলিয়াছিলেন। সেই কথা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইবার পর গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীগুরুদেবের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—

"আমার গুরুদেব আশ্চর্য্য বস্তু ছিলেন। তাঁহার বিচার আমাদের মস্তিষ্কে তাঁহার কৃপায় কিছু কিছু প্রবেশ করিয়াছে। তিনি সহর নবদ্বীপের ধর্ম্মশালার Public Latrine এ (সাধারণের পায়খানায়) যেখানে সকলের পুরীষ পরিত্যক্ত হয়, সেইস্থানে বাস করিয়াছিলেন—'ভোগী মনুষ্যজাতি আমার উপর পুরীষ পরিত্যাগ করুক'—এই বিচারে। **তিনি আমাকে বহুবার বলিয়াছেন,—লোককে ভোগা দিয়া আপনি হরিভজন করুন।** আমাদের এরকম মহান্ গুরুদেবের পাদপদ্মের নিকটে বসিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।"

(শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ—১২৫ পৃঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে এ দীনজনও বলিবার সাহস

করে—আমার ন্যায় নরকের কীটেরও এইরূপ মহান্ গুরুদেবের পাদপদ্ম-ভৃঙ্গগণের পশ্চাতে বসিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। আমাদের অদ্বিতীয় অতিমর্ত্ত্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম অভিন্ন-শ্রীবার্ষভানবীর ন্যায় পত্যভিমানকারী অর্থাৎ গুরুতে ভোগবুদ্ধিকারী- দ্রবিণ আদায়কারী - পাটোয়ারীবুদ্ধিবিশিষ্ট—শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় বলিতে গেলে 'commercial interest' যুক্ত শিষ্যাভিমানী ব্যক্তিগণকে বঞ্চনা করিয়া হরিভজন অর্থাৎ শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলন-সেবায় নিত্য ব্যাপৃত ছিলেন।

গত বর্ষের (১৯৩৭) ১০ই জানুয়ারী একব্যক্তি তীব্র কটাক্ষের সহিত বলিয়াছিলেন—'ইহারা বলেন, শ্রীল প্রভুপাদ একজন মস্ত ঠক ছিলেন, তিনি ঠকামি করিবার জন্যই জগতে আসিয়াছিলেন। আমাদিগের সহিত বঞ্চনা করিয়াই গিয়াছেন।'

আমরা তাঁহাদিগকে সসম্মানে বলি, শ্রীল প্রভুপাদের স্বমুখোক্তিই তাহার প্রমাণ। অন্যাভিলাষীকে কৃষ্ণ বঞ্চনাই করেন, আমিই হই আর যে-ই হউন, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।'—

"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেন, রাখেন লুকাইয়া॥"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ 'অন্যাভিলাষ' শীর্ষক একটি স্বরচিত-প্রবন্ধে বহু বৎসর পূর্ব্বে "নিবেদন" পত্রে (১১ই ডিসেম্বর ১৯০০ খৃষ্টাব্দ) লিখিয়াছিলেন,—"**অন্যাভিলাষিতা থাকিলে অপ্রাকৃত পারমার্থিক, কপট অভিলাষীকে নিজস্বরূপ দেখান না।**"

পূর্ব্বাচার্য্যগণেরও বঞ্চনা লীলার বহু দৃষ্টান্ত আছে। শ্রীল প্রভুপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল গৌরকিশোরের এবং মহাত্মা শ্রীল বংশীদাসের অনেক বঞ্চনালীলার উদাহরণ প্রতিনিয়তই কীর্ত্তন করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরের অতুলনীয় চরিত্র-সম্বন্ধে "আমার প্রভুর কথা"-শীর্ষক স্বরচিত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"অনেকগুলি প্রাকৃত লোক কিছু না বুঝিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং আপনাদিগকে তাদৃশ সাধুর স্নেহপাত্র জ্ঞান করিয়া কুবিষয়ে প্রমত্ত ছিল। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে দূরে ত্যাগ করেন নাই। আবার তাহাদিগকে কোন প্রকারে গ্রহণও করেন নাই। তাদৃশ ভক্তিবিরোধী কপটিগণ গৃহীত হইলে তাহাদের অপ্রাকৃত ভাগবত-ধর্ম দেখিয়া আমরা ধন্য হইতাম। ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের লিখিত 'অমায়ায় দয়া' পাইলে বাস্তবিক তাঁহাদেরও প্রকৃত মঙ্গল হইত, বিষয় বিচ্ছিন্ন হইত, কৃষ্ণ প্রেমলাভ হইত।"

(সজ্জন-তোষণী ১২শ খণ্ড. ৫ম সং ১৮৩ পৃষ্ঠা)

শ্রীল প্রভুপাদ যখন কীর্ত্তনাখ্য গোদ্রুম দ্বীপে স্বানন্দসুখদ-কুঞ্জে শ্রীল গৌরকিশোরের প্রথম দর্শন পাইয়াছিলেন। তখন শ্রীগুরুমুখপদ্ম হইতে শ্রীরাধাদাস্যময়ী একটি বিপ্রলম্ভময়ী গীতি শ্রবণ করেন এবং সেই গীতিটি শ্রীল প্রভুপাদের প্রাণের স্বভাব-সিদ্ধ আকাঙ্ক্ষার সহিত সখিত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি উহা স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় ঐ গীতিটি

আমরা 'শ্রীগৌরকিশোর' গ্রন্থে ও শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম বার্ষিক বিরহ-সংখ্যা গৌড়ীয়ে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু যখন শ্রীল প্রভুপাদকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতে বিলম্ব করিবার অভিনয় করিতেছিলেন, তখন একদিন শ্রীল প্রভুপাদ অভিমানভরে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে বলিয়াছিলেন,—"আপনার অভীষ্টদেব শঠ, কপট ও বঞ্চক। তাঁহার সেবা করিতে গিয়া আপনাতেও সেই সকল গুণ সঞ্চারিত হইয়াছে।" শ্রীল প্রভুপাদের এই অভিমানপূর্ণউক্তির মধ্যেও তাঁহার শ্রীরাধাদাস্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর ন্যায় বঞ্চনা-বিদ্যায় পারদর্শী আর কেহই নাই। কেন না, তিনি বঞ্চক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণেরও মনোমোহিনী।

"বড় আমি ও ভাল আমি" (১৪ বর্ষ 'গৌড়ীয়' প্রবন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ 'রাধারাণী ও মাপারাণীর' পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীরাধারাণীর দাস্যরূপ স্বভজন-বিতরণের জন্য শ্রীল প্রভুপাদের অবতার। কিন্তু যাহারা তাঁহার নিকট অন্যাভিলাষ-পূরণের চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা মহম্মদ তোঘলকের মত নিজকৃত মুদ্রাতেই নিজেরা লাভবান্ অর্থাৎ বঞ্চিত হইয়া মাপারাণীর—কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা পিশাচীর দাস্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ গৌরবনে রাধাবন দর্শন করিয়া, আবার রাধাবনে গৌরবন দর্শন করিয়া শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের সেবায় অসামান্য ব্যাকুলতা ও উৎসাহ প্রদর্শন করিতেন। অন্যাভিলাষী বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ ভাবিতেন,—বুঝি শ্রীল প্রভুপাদ নদীয়া

জেলার কোন গ্রামবিশেষে বা স্থানবিশেষে ডাকঘর, স্কুল, পথ-ঘাট, বৈদ্যুতিক আলো, টিউবওয়েল প্রভৃতি সংস্থাপন করিয়া পল্লী-উন্নয়নকার্য্য করিতেছেন, বা পিতৃপূজা, মাতৃপূজা প্রদর্শন করিতে-ছেন।'

শ্রীল প্রভুপাদ বিভিন্ন মঠের শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহের নামকরণ করিয়াছিলেন, যথা শ্রীচৈতন্যমঠে 'শ্রীবিনোদপ্রাণ', কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে—'শ্রীবিনোদানন্দ', শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে—'শ্রীবিনোদকান্ত', নৈমিষারণ্য পরমহংসমঠে—'শ্রীবিনোদবিলাস', কটক-সচ্চিদানন্দমঠে— 'শ্রীবিনোদরমণ', পুরুষোত্তম-মঠে—'শ্রীবিনোদমাধব', কাশী শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে—'শ্রীবিনোদ-বিনোদ' ইত্যাদি। ইংরাজী ১৯৩০ সালে যখন শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা বাগবাজারে শ্রীগৌড়ীয়মঠের নবনির্মিত শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলাম, তখন কতিপয় আধ্যক্ষিক ব্যক্তি কলিকাতার এক দৈনিক গ্রাম্যবার্ত্তাবহে শ্রীল প্রভুপাদের সম্বন্ধে লিখিল,—"ইনি একজন পিতৃভক্ত পুত্র বটে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহের নামকরণ ভক্তিবিনোদের নামের অনুকরণে করিয়া-ছেন!" এরূপ বিচার বাহিরের লোক কেন, 'অনেক ভিতরের লোক' অভিমানকারীর মধ্যেও ন্যূনাধিক আছে। শ্রীল প্রভুপাদ "বড় আমি ও ভাল আমি" প্রবন্ধে তাহার সমাধান করিয়াছেন। মাংসদৃক্ হইয়া বা দ্রষ্টা সাজিয়া শ্রীভক্তিবিনোদকে দর্শন করিলে **'বাবা' বা 'বাধা' দর্শন**, আর নামদৃক্ হইয়া অর্থাৎ শ্রীভক্তি-বিনোদের দৃশ্য-বিচারে শ্রীভক্তিবিনোদের যে দর্শন, তাহাতে

গোলোকোপরি দর্শন। নামদৃকের গৃহেতে 'গোলোক ভায়'। যখন শ্রীরাধাকে গোলোক হইতে অপসারিত করিবার প্রযত্ন করা হয়, তখন 'ব' এর নীচে যে গোলক-চিহ্ন (•) অর্থাৎ 'র', তাহা আর থাকে না, গোলক অপসারিত (?) করিয়া দেখিলে তাহা 'বাধা' হইয়া যায়; আবার 'ধ' এর আঁকশিটিও যখন মুছিয়া ফেলা হয়, তখন **'বাবা'**র স্থূলদর্শন আসিয়া যায়। কিন্তু শ্রীল **প্রভুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদের** শ্রীঅঙ্গে **শ্রীবার্ষভানবীর সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেন**। তাই 'বিনোদপ্রাণ', 'বিনোদানন্দ' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা তিনি 'রাধার প্রাণনাথ', 'রাধার আনন্দবিধায়ক' অর্থাৎ আশ্রয়বিগ্রহ-সমাশ্লিষ্ট বিষয়বিগ্রহকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এক সময় কোন এক ব্যক্তি 'গৌড়ীয়ের বিজ্ঞাপনে—যেখানে শ্রীমঠ ও শ্রীবিগ্রহের নামসমূহের তালিকা থাকে, তথায় 'বিনোদ-প্রাণ', 'বিনোদানন্দ', 'বিনোদমাধব' প্রভৃতি শব্দসমূহের পূর্ব্বে 'রাধাবিনোদপ্রাণ', 'রাধাবিনোদানন্দ', 'রাধাবিনোদমাধব' প্রভৃতি শব্দ বসাইয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত ক্রোধ-লীলা প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"ইহা কেন করা হইল ?" তখন শ্রীলপ্রভুপাদকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি ইহার কোনকারণ উল্লেখ করিলেন না। তারপর শ্রীল আচার্য্যদেবকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, –'বিনোদ-প্রাণ' 'বিনোদানন্দ' প্রভৃতি শব্দে যে 'বিনোদ' আছে, তাহাই শ্রীমতী রাধা, আবার পৃথক্ করিয়া 'রাধা' বসাইবার চেষ্টা সিদ্ধান্তে অজ্ঞতা।

অতএব শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যেকটি কার্য্য—রাধাদাস্যময়।

পাঞ্চরাত্রিক অর্চ্চনীয় শ্রীমূর্ত্তিতেও তিনি তাঁহার নিত্যভাবসেবা বা যুগল ভজনের বিচার ব্যতীত অন্য বিচারের আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। কনিষ্ঠাধিকারী বা অন্যাভিলাষীর দৃষ্টি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীরাধাদাস্যময় বিচার ও আচার ধারণা করিতে পারে নাই।

শ্রীল প্রভুপাদ দুই একটি মঠ, আশ্রম বা উদ্যানের নামকরণ কোন কোন বিশেষ নামের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া কোন কোন লোকের এরূপও বিচার হইয়াছে যে, শ্রীল প্রভুপাদ ব্যক্তিবিশেষের বা তাহার শৌক্রবংশজাত অধস্তনগণের নামের সহিত ঐ সকল মঠ ও আশ্রমের নামের সংযোগ করিয়াছেন! ইহাও শ্রীল প্রভুপাদের লোকবঞ্চনাময় তাঁহার শ্রীরাধা-দাস্যের আদর্শ।

দার্জ্জিলিং, শিলং, মসৌরী, উত্‌কামণ্ড প্রভৃতি শৈলাবাসে শ্রীল প্রভুপাদ সময় সময় গমন করিয়াছেন। অন্যাভিলাষী ও বঞ্চিত ব্যক্তিগণ হয় ত' তাহা দেখিয়া মনে করিয়া থাকিবেন— শ্রীল প্রভুপাদ ভোগী ও বিলাসী ব্যক্তিগণের ন্যায় বায়ুপরিবর্ত্তনার্থ শৈলাবাসে গমন করিয়া থাকেন।

শত চেষ্টা করিয়াও কেহ শ্রীল প্রভুপাদকে যেসকল স্থানের সমীরণ উপভোগ বা তথা হইতে স্বাস্থ্য-সংগ্রহের কোন চেষ্টায় মুহূর্ত্তের জন্য নিযুক্ত করাইতে পারে নাই, সেই সকল স্থানে শ্রীল প্রভুপাদ অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনের বন্যা প্রবাহিত করাইয়াছেন এবং সর্ব্বদা গোবর্দ্ধন-স্মৃতিতে বিভাবিত থাকিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার অপ্রকট লীলাবিষ্কারের দুইমাস পূর্ব্বেও

শ্রীল প্রভুপাদ পুরীর চটক পর্ব্বতে অবস্থান করিয়া কেবল অনুক্ষণ 'নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বং" এই কথাই উচ্চারণ করিতেন। একদিন চটক পর্ব্বতে শ্রীল আচার্য্যদেব আমাকে বলিলেন,—"এখানে 'নিকট' শব্দের অর্থ বুঝিয়াছেন কি? শ্রীল প্রভুপাদ কেন ইহা বলেন? 'নিকট' বলিতে 'শ্রীরাধাকুণ্ড'।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অন্তরঙ্গ নিজজন শ্রীল আচার্য্যদেবকে সঙ্গে লইয়া যখন কুমারিকা অন্তরীপে গমন করেন, তখন শ্রীল প্রভুপাদ কুমারিকার অধিষ্ঠাত্রী কুমারী দুর্গাকে দেখিয়া নিজ-রাধা-দাস্য-স্মৃতিরই পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা শ্রীল প্রভুপাদ মাদ্রাজ হইতে প্রেরিত ব্যাসপূজার অভিভাষণে জানাইয়াছেন,—

'গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের' বিলাস-বৈচিত্র্য দাক্ষিণাত্যের অন্তিম প্রান্তে যে বিপ্রলম্ভরসকাতরা রত্নাকর-সম্ভবা দুর্গা, তাঁহাকে কেন **অনূঢ়া কৃষ্ণপ্রেয়সী বিপ্রলম্ভরসোন্মেষি-মহাভাগবতরূপে দর্শন** না করিয়া দধির আদর্শ মহাকালের অনূঢ়া বিরহ-কাতরা কান্তারূপে দেখিতে যাই? ওঃ! **পার্থিব রাজ্যে বিকৃত প্রতিফলিত দৃষ্টিতে কি প্রকার বিবর্ত্তবাদাশ্রয়!** এই অনূঢ়া গোপীকে দর্শন দিবার জন্য গোপীজনবল্লভ অনূঢ়া গোপীর ভাবের সহিত শিক্ষয়িত্রী পরোঢ়া গোপীর ভাব লইয়া তাঁহাকে কৃপা করিবার জন্যই কুমারিকা-অন্তরীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গরুড়স্তম্ভের মর্য্যাদাবাদ, রুচিপ্রধানপথের রাগানুগ-চেষ্টা কি আবার শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যমিলন দেখাইবার জন্য কুমারিকা-অন্তরীপে শ্রীগৌরসুন্দরের ও শ্রীগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর অর্চ্চাবতাররূপে প্রকটিত হইবেন না?"

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলার রহস্যের মধ্যেও তাঁহার অত্যদ্ভুত রাধা-দাস্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নিশান্ত-লীলায় প্রবেশ বা নিশান্ত-লীলার সেবাটি কি? উহা পতি বঞ্চনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ-বিধান। রাধানাথ বামে চন্দ্রাবলীর পরিজনদিগকে, সম্মুখে ঘোষপল্লীর প্রাচীন ব্যক্তিগণকে ও পশ্চাদ্ভাগে অভিমন্যু-জননী জটিলাকে আসিতে দেখিয়া গোপনে গোষ্ঠে গমন করিতেছেন। শ্রীরাধাও পশ্চাদ্ভাগে জটিলা আসিতেছেন দেখিয়া অত্যন্ত ভীত চিত্তে ব্রজে গোপনে পলায়ন করিতেছেন, আর শ্রীরূপ-মঞ্জরী ও রতিমঞ্জরী ভীতা শ্রীবার্ষভানবীর অনুগমন করিতেছেন। এইরূপভাবে বিজাতীয় লোক ও আর্যাজন বঞ্চনা করিয়া শ্রীরাধা ও শ্রীগোবিন্দ নিজ নিজ স্থানে গমন পূর্ব্বক কপট নিদ্রায় অবস্থান করেন। জটিলা প্রভৃতি ইহার রহস্য কিছুই জানিতে পারে না।

কুন্দলতা প্রভৃতি সখীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া যে গণেশ ও শিবের পূজা, পঞ্চদেবতার পূজা, নবগ্রহের পূজা প্রভৃতি করাইয়া থাকেন, তন্মূলে বিজাতীয় লোকবঞ্চনা ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ইন্দ্রিয়তর্পণ-যজ্ঞোৎসব বিধান করিয়া সজাতীয়াশয় সজ্জনগণের তোষণ হয়। শ্রীবার্ষভানবীর সূর্য্যপূজা ব্যাপারটি গুরুভোগিগণকে বঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীল প্রভুপাদ সেইরূপ সূর্য্যপূজা করিয়া রাধাদাস্যের পরাকাষ্ঠা ও পাটোয়ারী বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে অর্থাৎ গুরুভোগীসম্প্রদায়কে বঞ্চনা করিয়াছেন। ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষীগণ সূর্য্যপূজা করেন। Commercial interest বা বণিক্স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিগণ

কৃষ্ণকে দিয়া সূর্য্যপূজা অর্থাৎ হরি-গুরু-বৈষ্ণবের দ্বারা ধর্ম্ম অর্থাৎ অপস্বার্থ সাধন করাইয়া লইতে চাহে, ইহারই নাম 'বাণিয়া বুদ্ধি'। কিন্তু কৃষ্ণ সর্বদা দুই আঙ্গুল উর্দ্ধে থাকেন। কৃষ্ণ ভোগবুদ্ধি-কারীকে ভোগ দিয়া অর্থাৎ তাহারই অপস্বার্থ সাধনের পৌরোহিত্য করিবার বাহ্য অভিনয় দেখাইয়া নিজ স্বার্থ সাধন করিয়া লন অর্থাৎ শ্রীরাধার সহিত মিলিত হন। শ্রীরাধার সখীগণও শ্রীরাধাকে কৃষ্ণের সহিত মিলিত করান।

কৃষ্ণের দ্বারা সূর্য্যপূজার পৌরোহিত্য করাইবার পর নিজের বণিগ্‌বৃত্ত্যুচিত স্বার্থ সিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া অভিমন্যু-জননী জটিলা কৃষ্ণকে ভোজন অর্থাৎ প্রতিগ্রহ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পুরোহিতরূপী কৃষ্ণ জানাইলেন যে, তিনি গর্গাচার্য্যের শিষ্য ও ব্রাহ্মণ, সুতরাং অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন না। এদিকে কুন্দলতা জটিলা-বঞ্চনার আর একটি ছল অবলম্বন করিলেন। তিনি যেন জটিলারই পক্ষের উকিল হইয়া কৃষ্ণকে বলিলেন,—"জটিলা আপনাকে তাঁহার পুত্রবধূর হস্তরেখা পরীক্ষা করিয়া তাঁহার পুত্রের পরমায়ু বলিতে অনুরোধ করিতেছেন; কারণ আপনি গর্গাচার্য্যের শিষ্য, সুতরাং অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্।"

এখানে কুন্দলতা শ্রীরাধা-গোবিন্দের মিলনের জন্য জটিল বুদ্ধি বা পাটোয়ারীবুদ্ধি জটিলার নিকট যে 'বাণিয়া স্বার্থে'র টোপ ফেলিলেন, তাহা জটিলা ধরিতে পারিল না; জটিলা মনে করিল,—কুন্দলতা তাহারই অপস্বার্থের পূজা করিতেছে। সেই ছলে শ্রীকৃষ্ণও প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"আমি

পরস্ত্রীর হস্ত স্পর্শ করিতে পারি না। তবে তোমাদের অনুরোধ ও সুখের জন্য জটিলার পুত্রবধূর ভাগ্যরেখা পরীক্ষা করিতেছি।” কুন্দলতার সাধ পূর্ণ হইল, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ হইল—শ্রীরাধা-গোবিন্দের মিলন হইল। জটিলাকে এইরূপ ‘কমারসিয়্যাল ইন্‌টারেষ্ট’এর লোভে লুব্ধ না করিলে কিছুতেই সে রাধাকে কৃষ্ণের সম্মুখে আসিতে দিত না। জটিলার বিচারে—তাহার পুত্রই রাধার ধর্ম্মপতি, কৃষ্ণ একটা বাহিরের লোক, পরপুরুষ!

শ্রীল প্রভুপাদও তাঁহার সমগ্র চরিত্রে ‘বাণিয়া স্বার্থের’ নানাপ্রকার টোপ ফেলিয়া তাঁহার মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ অর্থাৎ সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে শ্রীরাধা গোবিন্দের অপ্রাকৃত যুগলমিলন করাইয়াছেন। বিলাতে নিজ-প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের কথা—শ্রীভক্তিবিনোদের কথা প্রচারের কালে শ্রীল প্রভুপাদ ঐরূপ ‘বাণিয়া স্বার্থে’র টোপ ফেলিয়াই তাঁহার নিজ-স্বার্থসিদ্ধি বা রাধাদাস্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বমুখে বলিয়াছেন,—‘নতুবা প্রচারে বাধা দিবে, এত অর্থ ব্যয় করিতে দিবে না, যদি সঙ্গে ‘বাণিয়াস্বার্থ’ যুক্ত না থাকে ”

শ্রীল প্রভুপাদ অতৃপ্ত-প্রতিষ্ঠাকাঙ্খী আমাকে কতভাবে প্রতিষ্ঠা দিয়া, আমাকে সরকারী খেতাবে ভূষিত করিবার জন্য অন্য বৈষ্ণবগণের রক্ত-জলকরা অর্থ ব্যয় করিয়া, আমার জড়বিদ্যার্জ্জনের প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারগণের নিকট পর্য্যন্ত স্বয়ং সুপারিশ করিয়া, আমাকে কত শাল, আলোয়ান, কনক (টাকা), কশিপু (শয্যা)—নিজ শয্যা পর্য্যন্ত ‘কমারসিয়্যাল ইন্‌টারেষ্ট’এ প্রলুব্ধ করিয়া নিজ-রাধা-দাস্য করিয়া গিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়িল। প্রায় পনেরো বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে শ্রীগৌড়ীয়মঠ। পণ্ডিত শ্রীমদ্ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কিছু সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িবার অনুমতি লাভের জন্য শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আবেদন জানাইলেন। পণ্ডিত শ্রীগৌরদাসের ইচ্ছা—তিনি হরিনামামৃত ব্যাকরণে পারঙ্গতি লাভ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীগৌরদাসকে এবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা দূরে থাকুক্, হরিভজন করিতে আসিয়া ঐরূপ ব্যাকরণ পড়িতে গেলে নানাপ্রকার দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হইতে পারে, এইরূপ উপদেশ দিলেন। কোন একব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর নিকট হরিভজনার্থ আসিবার অভিনয় করিয়া ব্যাকরণ অধ্যয়নে রুচিবিশিষ্ট হওয়ায় পরে ভাড়াটিয়া কথক হইয়া হরিভজন হইতে পতিত ও বৈষ্ণবাপরাধী হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাও শ্রীল প্রভুপাদ জানাইলেন। বরং ব্যাকরণ পড়িবার পরিবর্ত্তে গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসে সেবার কার্য্য করিলে অধিক মঙ্গল হইবে, ইহা জানাইলেন। আমরা শ্রীল প্রভুপাদের এইরূপ উপদেশ ও সিদ্ধান্তে তাঁহার অবঞ্চক স্বরূপ ও শিষ্যকে শাসনযোগ্য বিচারে **অমায়ায় কৃপা** করিবার আদর্শ দেখিতে পাই। আবার সেই শ্রীল প্রভুপাদই যখন তাঁহার বঞ্চনার মূর্ত্তি প্রকাশ করিতেন, তখন শিষ্যাভিমানী ব্যক্তির জড়বিদ্যা ও জড়প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের ইন্ধনও স্বহস্তে যোগাইয়া দিতেন ইহাও দেখা গিয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেবের সম্বন্ধে একটি কথা আমি জানি। এক-

বার 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্' হইতে শ্রীমান্ কৃষ্ণদাস প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইন্টারমিডিয়েট পড়িবার জন্য কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে বাসস্থান ও দুইবেলা প্রসাদ প্রার্থনা করে। তাহাতে শ্রীল আচার্য্যদেব বলেন—'ভক্তসজ্ঘারাম মঠ ঐ উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয় নাই।' ইহা শুনিয়া অত্যন্ত অভিমান-ভরে শ্রীমান্ কৃষ্ণদাস বলে যে,—'অমুক, অমুক ছেলে এখানে উত্তম ভোজন, উত্তম বাসস্থান, এমনকি তাহাদের গৃহশিক্ষকবর্গের জন্য পর্যান্ত বাসস্থান ও আহারাদির সংস্থান লাভ করিয়াছে, আর আমার আত্মীয়বর্গ এখানে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া মিশনের কত সেবা করিতেছেন, আমি কি দুইবেলা দুই মুষ্টি প্রসাদও পাইতে পারি না? কত বাহিরের লোকে কত প্রসাদ নিত্য পাইয়া থাকে।'

এই কথা শুনিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমানের প্রতি যে ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। আচার্য্য-দেব বলিয়াছিলেন,—'আমরা শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে কিছু আদায় করিবার জন্য এখানে আসি নাই, 'স্বকর্ম্ম-ফলভুক্ পুমান্'—অন্যের দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা চলিব না। শ্রীল প্রভুপাদের ষোল-আনা ইন্দ্রিয়তর্পণ বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের দ্বারা কিছু আদায় করিবার বিন্দুমাত্র অনুরোধ ও উপরোধ যাহারা করিবে, তাহাদিগের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই; তুই চিরকাল মূর্খ হইয়া থাকিলে, এমন কি অধঃপাতে চলিয়া গেলেও আমি শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা—কৃষ্ণের প্রিয়তম বিগ্রহের দ্বারা তোর সেবা করাইব না'।

এখানেই শ্রীল প্রভুপাদের বঞ্চনা-লীলার সেবক ও শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী-সেবকের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীল প্রভুপাদ 'ভাড়াটিয়া-ভক্ত নহে' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—**কৃষ্ণানুশীলনের নামে নিজত্বকে জড়ের নিকট ভাড়া দিলে গৌরসেবা হয় না। দেহে আত্মজ্ঞান হইলে জড়ের সুখ মূল্য ভাড়া আদায় করিতে হয়'।**

—(সজ্জনতোষণী ২০শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীতে শুনিতে পাই—

"দাস করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ২০।৩৭)

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের বাণীতেও শুনিতে পাই—

"যস্ত আশিষ এব আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্।"

শ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময়ই 'পদ্মানীতি' শব্দটি ব্যবহার করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের এই সকল সিদ্ধান্তে তাঁহার অবঞ্চক-স্বরূপ প্রকাশিত, অথচ শ্রীল প্রভুপাদই আবার যখন অপরকে পদ্মানীতিতে প্রলুব্ধ, পাটোয়ারী বুদ্ধিতে নিযুক্ত, দ্রবিণাদি-দ্বারা বঞ্চিত করিতেন, তখন তাহা শ্রীল প্রভুপাদের বঞ্চনালীলা ব্যতীত আর কি? তবে যে শ্রীল প্রভুপাদ বঞ্চিত ব্যক্তিগণকেও লোক-ব্যবহারে অত্যন্ত আদর, অত্যন্ত সম্মান, অভূতপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠাপ্রদান ও তাহাদের প্রশস্তিগানে পঞ্চমুখ হইতেন, তাহাদের বিরুদ্ধবাদি-গণের মুখ নিরস্ত করিতেন, ইহার মূলে কি রহস্য আছে?

এই কথার উত্তর সেই এক কথায়ই দেওয়া যায়, ইহাও তাঁহার রাধাদাস্যেরই রহস্য। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

'অচিন্ত্য ভেদাভেদ কথার সান্নিধ্য লাভ ঘটিলে ব্যক্তিবিশেষের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য তাঁহার শুশ্রূষা করাই আবশ্যক, অন্য কোন কার্য্য আমাদের নাই, কেন না আমরা রাই কানুর স্নেহবন্ধনে নিত্য শৃঙ্খলবদ্ধ।'

যাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের রাধাদাস্যময়ী সিদ্ধান্তবাণী ধরিতে পারেন নাই, তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদকে অনেক সময় একদেশদর্শী বা একচক্ষু মনে করিয়া বিভ্রান্ত ও শ্রীল প্রভুপাদের স্নেহ ও কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। শ্রীবার্ষভানবীর জটিলার প্রতি যে গৌরববুদ্ধি, সম্মান, আদর, পরিচর্য্যা, শুশ্রূষা এবং শ্রীবার্ষভানবীর অভিমন্যুর প্রতি যে গৌরবজ্ঞান, প্রিয়জ্ঞান বা প্রেষ্ঠজ্ঞানের অভিনয়, উহাকে শ্রীবার্ষভানবীর বঞ্চনালীলা জানিয়া শ্রীবার্ষভানবীর অনুকূল পথে চলাই অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন। শ্রীবার্ষভানবীর বঞ্চনালীলার প্রতিকূল আচরণ করিলে শ্রীবার্ষভানবীর সুখ কামনা করা হয় না। শ্রীল প্রভুপাদের রাধাদাস্যের অনুগমন করাই আমাদের নিত্য ধর্ম্ম।

শ্রীল প্রভুপাদ গাহিয়াছেন,—

"রাধাদাস্যে রহি', ছাড় ভোগ অহি।
প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তন-গৌরব॥"

শ্রীল প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাকামিগণকে উচ্চতম প্রতিষ্ঠা প্রদান করিয়া, অন্যাভিলাষিগণকে জড়ের অভিলাষের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ

সামগ্রী প্রদান করিয়া যে রাধাদাস্যের পূর্ণতম আদর্শ প্রকট করিয়াছেন, তৎপ্রতি মৎসর হইলে আমাদের কুবিষয় ও জড়প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠা ভোজন করিতে হইলে; রাধা-নিত্যজন শ্রীল প্রভুপাদের সেবা হইবে না. অপরে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা আদায় করিয়া "কৃতকৃতার্থোঽস্মি" বলিয়া নৃত্য করিতে থাকুন, কিন্তু আমরা কিছুতেই তাঁহাদিগের প্রতি মৎসরতা অবলম্বন করিব না, আমরা শ্রীল প্রভুপাদের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর শ্রীচরণ-নখার্চ্চনের জন্যই বৈষ্ণবগণের নিত্যকৃপা যাচঞা করিব।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধাকুণ্ডে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সঙ্কীর্ত্তনমুখে কার্ত্তিকেশ্বরীর যে সেবাদর্শ সংস্থাপন করিয়াছেন, শ্রীকুণ্ডতটে শ্রীরূপের যে উপদেশামৃত বিতরণ করিয়াছেন, শ্রীল প্রভুপাদের সেইসকল রাধা-দাস্যের আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া আমরা পুষ্টিমার্গীয়গণের আরাধ্য রাধাদাস্য বিরোধী বিচারে ধাবিত হইব না। রাগানুগপথ ও পুষ্টিমার্গ দেখিতে ও শুনিতে একই জাতীয় হইলেও সেখানে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তকে ধামাচাপা দিয়া চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের আহ্বান করিব না। গর্ভোদকশায়ীর সেবা অপেক্ষা জটিলা-বঞ্চনাময় রাধা-দাস্যকে অধিকতর জটিল মনে হইলেও তাহা শ্রীরূপানুগগণের অপ্রাকৃত সহজ ধর্ম্ম।

শ্রীল প্রভুপাদ সেই রূপানুগগণের শিরোমণি।

—•—

ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

আচার্য্যের নামোচ্চারণের সময় তাঁহার নামের পূর্ব্বে 'প্রণব', 'শ্রী' ও 'বিষ্ণুপাদ' শব্দের উচ্চারণ এবং তৎসঙ্গে প্রণতি ও কৃতাঞ্জলি করিবার আদেশ শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে প্রদত্ত হইয়াছে,—

"যথা তথা যত্র তত্র ন গৃহ্লীয়াচ্চ কেবলং।
অভক্ত্যা ন গুরোর্নাম গৃহ্লীয়াচ্চ যতাত্মবান্॥
প্রণবঃ শ্রীস্ততো নাম বিষ্ণুশব্দাদনন্তরং।
পাদশব্দসমেতঞ্চ নতমূর্দ্ধাঞ্জলিযুতঃ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিঃ ৬০ সংখ্যাধৃত নারদপঞ্চরাত্র-বাক্য)

যতাত্মা ব্যক্তি যথায় তথায় যে-সে-প্রকারে অভক্তি-সহকারে আচার্য্যের নাম উচ্চারণ করিবে না। মস্তক অবনত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে 'প্রণব', 'শ্রী'অমুক এবং তৎপরে 'বিষ্ণুপাদ' সমন্বিত করিয়া নাম উচ্চারণ করিবে, অর্থাৎ "ওঁ শ্রীঅমুক বিষ্ণুপাদ"— এইরূপ বলিবে।

এখানে শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভু টীকায় 'গৃহ্লীয়াৎ' শব্দের দ্বারা এরূপ আচারের অবশ্য কর্ত্তব্যতা জানাইয়াছেন।

আচার্য্যকে "**বিষ্ণুপাদ**" বলিবার কারণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীউদ্ধব-গীতায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

(ভাঃ ১১।১৭।২৭)

ভগবান্ উদ্ধবকে বলিলেন,—হে উদ্ধব, আচার্য্যকে মৎস্বরূপ জানিবে, আচার্য্যকে কখনও অবমাননা করিবে না, তাঁহাকে নরবুদ্ধিতে অসূয়া অর্থাৎ হিংসা করিবে না। আচার্য্য—সর্ব্বদেবময়।

ভগবানের ঐ বাণী হইতে আরও জানা যায়,—'আচার্য্য' বা 'গুরু, পর্য্যায় শব্দ অর্থাৎ যিনি আচার্য্য, তিনিই গুরু; যিনি গুরু, তিনিই আচার্য্য।

কিরূপ লক্ষণান্বিত মহাপুরুষ ভগবৎপ্রকাশতত্ত্ব বলিয়া বৃত হইবেন, শ্রীল প্রভুপাদ অনুভাষ্যে তাহা এইরূপ বলিয়াছেন,—

"আচার্য্যের অনন্যভজনই তাঁহার ভগবৎ-প্রকাশত্বের পরিচায়ক। ভোগে অসন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণগণ আচার্য্যের সুষ্ঠু আচরণেও ঈর্ষা করেন। আচার্য্যদেব সেব্যের অভিন্নাঙ্গ, সুতরাং তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিলে ভগবান্ ও তৎপরিকর-কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া জীবের দুর্গতি হয়।"

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ", "সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ" অর্থাৎ আচার্য্য ভগবৎস্বরূপ এবং সমস্ত শাস্ত্রেই আচার্য্য সাক্ষাৎ হরি বলিয়া কথিত এবং সাধুগণও আচার্য্যকে তাহাই জানেন—এই সকল শাস্ত্র ও মহাজনের উক্তিই আচার্য্যকে "ওঁ বিষ্ণুপাদ' বলিবার সার্থকতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আচার্য্য ওঁ 'বিষ্ণুপাদ' অর্থাৎ 'বিষ্ণুচরণ' 'ভগবচ্চরণ' বা 'সাক্ষাৎ হরি' হইলেও 'অষ্টোত্তরশতশ্রী' বিশেষণে বিশেষান্বিত অর্থাৎ শক্তিতত্ত্ব, শক্তিমত্তত্ত্ব বা বিষয়-

বিগ্রহ নহেন; তিনি সেব্য ভগবান্ নহেন,—সেবক ভগবান্। এইজন্যই "গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর", 'শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহ অভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে", কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্" ইত্যাদি উক্তি তাঁহার বিষ্ণুপাদত্বের সহিত শ্রীত্ব অর্থাৎ শক্তিত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। তিনি বিষ্ণু হইয়াও সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণবতত্ত্ব —তিনি ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহ হইয়াও ভগবদ্দাস—

"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥"
(চৈঃ চঃ আ ১।৪৪)

শ্রীচৈতন্যের প্রকাশবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ—ভগবত্তত্ত্ব বা বিষ্ণুতত্ত্ব। আচার্য্য সেই বিষ্ণুতত্ত্ব হইয়াও শ্রীচৈতন্যের দাস অর্থাৎ বৈষ্ণবতত্ত্ব। বিষ্ণু ও বৈষ্ণবতত্ত্বের যুগপৎ আবির্ভাব আচার্য্যত্বে প্রকাশিত। এইজন্যই ভগবান্ সতর্ক করিয়াছেন,—মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যের প্রতি মৎসরতা করিও না।

শ্রীল প্রভুপাদ কটক-সচ্চিদানন্দমঠে বঙ্গাব্দ—১৩৩৪, ২৫শে আষাঢ় তারিখের এক বক্তৃতায় আচার্য্যের স্বরূপ ও আচার্য্য-সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন :—

"সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার করবে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার ক'র্‌বে, কোন অংশে কম মনে ক'র্‌বে না। সাধু সকল—পণ্ডিত সকল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকলের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে—ভগবানের ন্যায় গুরুদেবকে জানা—পূজা করা—সেবা করা।

যদি তা' না করেন, তবে শিষ্যস্থান হ'তে ভ্রষ্ট হ'য়ে যাবেন। মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন— ভগবানের প্রকাশ-মূর্ত্তি না জানলে কোনদিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না। তা'র একটা প্রমাণ আছে শ্রুতিতে—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

তিনিই শ্রুতির মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারেন—যাঁ'র গুরু ও ভগবানে অভিন্নবুদ্ধি আছে।

"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।"

"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥"

সচ্চিদানন্দ ভগবানের গায়ে হাত আছে, সেই হাত দিয়ে তিনি যেন তাঁ'র গা' চুল্‌কুচ্ছেন। ভগবানের হাতও তাঁ'র দেহ-ই—ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা ক'চ্ছেন। ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন।"—(শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ৪র্থ খণ্ড ২২ পৃষ্ঠা)

শ্রীল প্রভুপাদ ১৩৪১ বঙ্গাব্দের ১লা আশ্বিন তারিখের একটি পত্রে লিখিয়াছেন,—'তটস্থাশক্তিপ্রকটিত জীব অনিত্য সংসারে ভোগী হয়, তখন সে শ্রীগুরুপাদপদ্মে ভেদ দর্শন করে। গুরুদেব চিচ্ছক্তিতে নিত্য-অবস্থিত হইয়া তটস্থশক্তিতে বহু জীবের নিকট পরিদৃষ্ট হন। ভজন-পরিপক্বতায় অনঙ্গমঞ্জরীকে তাঁহার সেব্যা বার্ষভানবীর সহিত অভেদতত্ত্ব বলিয়া জানা যায়। মুক্ত-

জীব ভেদাভেদ প্রকাশ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মধুর রতিতে স্বয়ং প্রকাশ বলিবার পরিবর্ত্তে স্বয়ংরূপা ও স্বয়ংপ্রকাশার বিচার পর পর দর্শন করেন। 'গুরুরূপা সখী বামে' বাক্যে জানা যায়—সখী শ্রীবার্ষভানবীরই কায়ব্যূহ এবং তাঁহা হইতে অভিন্না।"
—(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ৩য় খণ্ড ৩১ পৃষ্ঠা)

আচার্য্যে বিষ্ণুত্ব ও বিষ্ণুসেবকত্ব যুগপৎ প্রকাশিত। বিষ্ণুই বিষ্ণুকে দিতে পারেন। তবে আচার্য্য "বিষ্ণুপাদ" বলিয়া লক্ষ্মীর ভোক্তা বিষ্ণু নহেন বা তিনি গোপীনাথও নহেন। স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব বলদেব ও নিত্যানন্দের রাস শ্রীমদ্ ভাগবতে কথিত আছে; কিন্তু আচার্য্যে সেইরূপ বিচার নাই। আচার্য্য নির্ব্বিশেষবাদী বাউল বা অহংগ্রহোপাসক নহেন।

অষ্টোত্তরশতশ্রী অর্থাৎ অষ্ট মুখ্যা (শ্রী) গোপীকে পুরোবর্ত্তিনী করিয়া শত (শ্রী) লক্ষ্মী অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-বিধানকারিগণের যূথের স্বরূপ যে আশ্রয়বিগ্রহে বর্ত্তমান, সেই শক্তিতত্ত্বই আচার্য্যতত্ত্ব।

আচার্য্য কখনও আচার্য্যব্রুব নহেন। যে আচার্য্য-নামধারী আপনাকে বিষ্ণুসজ্জায় সজ্জিত করিতে চাহে বা নিজেকে বিষয়-জাতীয় অভিমান—করে, পদদেশে তুলসীমঞ্জরী গ্রহণ (?) করে, সে পাষণ্ডী।

'বিষ্ণুপাদ', 'বিষ্ণুচরণ', 'প্রভুপাদ' বা 'প্রভুচরণ' প্রভৃতি শব্দ আচার্য্যোচিত ভক্তি ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপক। সম্মানার্থ 'চরণ' শব্দের প্রয়োগ। যেমন অনেক সময় বলা হয়—"স্বামিচরণ বলিয়াছেন।"

কখনও বা আমরা বলিয়া থাকি—"আমাদের গুরুপাদপদ্ম ইহা বলিয়াছেন" অর্থাৎ আচার্য্যদেব প্রভু বা নিয়ামক বলিয়া পাদপদ্ম স্বরূপ, আর আমরা বশ্য বা শিষ্য বলিয়া সেই পাদপদ্মের পরাগ বা ধূলি। যাঁহারা আনুগত্য-ধর্ম্মে নিত্য অধিষ্ঠিত থাকিতে চাহেন, তাঁহারা সকল সময়ই আপনাদের স্বরূপ 'গুরু ও বৈষ্ণবের পদধূলি' বলিয়াই জ্ঞান করেন। এইজন্যই আচার্য্যকে প্রভুপাদ, বিষ্ণুপাদ, ভগবচ্চরণ প্রভৃতি বলা হয়। 'বৈষ্ণব'-দর্শনে 'শ্রীপাদ' ও আচার্য্য-দর্শনে 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' শব্দের প্রয়োগ; কিন্তু প্রকৃত আচার্য্য ও প্রকৃত বৈষ্ণব নিজেকে কখনও 'বিষ্ণুপাদ' অর্থাৎ 'আমি বিষ্ণু হইতে অভিন্ন লোক-গুরু' কিংবা 'শ্রীপাদ' অর্থাৎ 'আমি বৈষ্ণব'—এইরূপ বিচার করেন না।

অতত্ত্বজ্ঞ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—"আচার্য্যকে 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' বলিলে যিনি উহা বলেন ও যিনি উহা স্বীকার করেন, উভয়েই 'নির্ব্বিশেষবাদী পাষণ্ড' হইয়া পড়েন! ইহাতে মায়াবাদ-দোষ উপস্থিত হয়!" বস্তুত এইরূপ বিচার সম্পূর্ণ ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ; কারণ, আমরা শ্রীল প্রভুপাদের সংরক্ষিত সম্প্রদায়ে দেখিতে পাই যে, এক বৈষ্ণব আর এক বৈষ্ণবকে 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করেন, এমন কি, স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদও তাঁহার যে কোন শিষ্যকে 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং শিষ্যগণও প্রভুপাদের সেই আহ্বানে উত্তর এবং এক বৈষ্ণব আর এক বৈষ্ণবের আহ্বানে উত্তর প্রদান করিয়াছেন ও করেন। ইহার রহস্য কি? যখন শিষ্যকে শ্রীল প্রভুপাদ 'প্রভু' বলিয়া ডাকিতেন,

আর যখন এক বৈষ্ণব আর এক বৈষ্ণবকে 'প্রভু' বলিয়া ডাকেন, তখন কি তাঁহারা শ্রীগুরুদেবের ও বৈষ্ণবগণের 'প্রভু' হইয়াছেন মনে করেন ? শ্রীগুরু ও বৈষ্ণবগণের প্রভু ত' তাঁহাদের গুরুদেব অর্থাৎ ওঁ বিষ্ণুপাদ-তত্ত্ব বা বিষয়বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান অথবা প্রভু-তত্ত্ব ত' নিত্যানন্দ বা অদ্বৈত-তত্ত্ব অর্থাৎ বিষ্ণুতত্ত্ব—

"এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুই জন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ।।"

(চৈঃ চঃ আ ৭।১৪)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই বাক্য অনুসরণ করিলে গুরু ও বৈষ্ণবগণ যখন শিষ্যকে ও অপর বৈষ্ণবকে 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করেন এবং তাঁহারা যখন প্রত্যুত্তর প্রদান করেন, তখন আহ্বান-কারী ও উত্তরপ্রদানকারী উভয় সম্প্রদায়ই কি মায়াবাদে পতিত হন ? বস্তুতঃ সেখানে 'প্রভু' শব্দে আহ্বানকারী গুরুদেব ও বৈষ্ণব-গণ জানেন,—ইহারা সকলেই আমার গুরুদেবের বৈভবপ্রকাশ। আর উত্তরপ্রদানকারীও জানেন—আমি গুরু বা প্রভু নহি ; কারণ, "আমি ত' বৈষ্ণব—এ বুদ্ধি হইলে অমানী না হ'ব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে, হইব নিরয়গামী ॥" আমি আমার নিত্যপ্রভুর পাদপদ্মের ধূলি। 'প্রভু' শব্দে একমাত্র শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম—"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।" শ্রীগুরুদেব আমাকে 'প্রভু' বলিয়া আহ্বান করিলে আমি যদি আমাকে 'আমার প্রভুর (গুরুদেবের) প্রভু' বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে আমি কি আমাকে বিষয়তত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দর মনে করিয়া পাষণ্ড

নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়িলাম না ? অতএব শ্রীগুরুদেব বা বৈষ্ণবগণ কাহাকেও 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করিলে তদুত্তর-প্রদানকারীর যদি গুরু-বৈষ্ণবের পদধূলি বলিয়া আত্মাভিমান না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার ঐ 'প্রভু' শব্দ শ্রবণ করিবার বা উহার উত্তর দিবার আদৌ অধিকার নাই। গুরু ও বৈষ্ণবের প্রভুবিচারে উত্তর প্রদান করিলে উত্তরপ্রদান-কারীর মায়াবাদ ও পাষণ্ডতা-অপরাধ উপস্থিত হইবে। তদ্রূপ আচার্য্যকে যখন তদনুগত সম্প্রদায় 'বিষ্ণুপাদ' বলেন, তখন যদি তিনি মনে করেন (ইহা মনে করিলে তিনি আচার্য্যই নহেন)— 'আমি বিষ্ণু, আমি নিত্যানন্দ প্রভু', তাহা হইলে তাঁহাতে পাষণ্ডতা ও মায়াবাদ উপস্থিত হইবে। কিন্তু আচার্য্য নিজের সম্বন্ধে এইরূপ বিচার করেন—আমি সকল শুদ্ধ গুরুদাসের—শ্রীরূপানুগ-গণের পদধূলি। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের বৈভবপ্রকাশগণ আমার গুরুদেবকেই বিষ্ণুপাদ', বলিতেছেন দস্যু ও বাটপাড়ের ন্যায় মধ্যপথে আমি ইহা অপহরণ করিতে পারি না।" আচার্য্য জগতে ভক্তির সদাচার ও আনুগত্যধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্যই ঐ সকল শাস্ত্রোক্ত বিধির মর্য্যাদা প্রচলন ও সংরক্ষণ করেন। নিজে প্রতিষ্ঠা-শৌকরীবিষ্ঠা ভোগ করিবার জন্য ঐসকল বিচার গ্রহণ করেন না। তিনি ঐ সদাচার প্রবর্ত্তিত না রাখিলে জীবের ভক্তি-শক্তি বিলুপ্ত হইত।

এই জন্যই শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

"নাচ্‌তে বসে ঘোমটা টানলে হ'বে না।" আমি গুরুর

র্যা ক'র্‌ছি ; কিন্তু যদি 'আমার জয় দিতে হ'বে না'—এ কথা প্রচার করি অর্থাৎ একটু ঘুরিয়ে অন্যভাবে বলি 'বেশী ক'রে আমার 'জয়' দাও', তা' হ'লে সেটা 'কপটতা' ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমি মূর্খসম্প্রদায়ের—হিংসা-পরায়ণ-সম্প্রদায়ের কোনও কথা শুনে গুরুর অবজ্ঞা ক'র্‌ব না। যখন শ্রীগৌরসুন্দর আমাকে আজ্ঞা ক'রেছেন—"আমার আজ্ঞায় 'গুরু' হঞা তার এই দেশ।" আমার গুরুদেবের কাছে এই আজ্ঞা পৌঁছেছে—গুরুদেব আবার আমাকে সেই আজ্ঞা ব'লেছেন—আমি সেই আজ্ঞা পালন ক'র্‌তে কপটতা ক'র্‌ব না—মূর্খ-সম্প্রদায়ের—কপট-সম্প্রদায়ের—ফল্গুত্যাগী সম্প্রদায়ের আদর্শ নেবো না—আমি কপটতা শিখ্‌বো না। বিষয়িগণ—মৎসরগণ—ফল্গু-ত্যাগিগণ স্বার্থপরগণ বুঝতে পারে না—ভগবানের ভক্তগণ কিরূপ জগতের সর্ব্ববিষয়ে পদাঘাত ক'রে ভগবানের আজ্ঞায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে লব মাত্রও ভগবানের নিষ্কপট সেবা হ'তে বিচ্যুত হন না।

কপট সম্প্রদায়—বৈষ্ণবব্রুব-সম্প্রদায় 'অন্তরে জড় প্রতিষ্ঠাকামী সম্প্রদায় মনে ক'র্‌ছেন—"গুরুর আসনে ব'সে শিষ্যগণের স্তুতি শুন্‌ছে কিরূপ! প্রত্যেক বৈষ্ণব প্রত্যেক বৈষ্ণবকে 'শ্রেষ্ঠ' জ্ঞান করেন। শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়ে 'অমানী-মানদ'-ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে র'য়েছে ; যারা তা'তে বৈষম্য দর্শন করে, তা'রা

দিবান্ধ পেচক সদৃশ—অপরাধী।”—(বক্তৃতাবলী ৪র্থ খণ্ড ২৪-২৫ পৃষ্ঠা)।

কোন কোন ব্যক্তি বলেন,—“আমরা দীক্ষাগুরুদেবকে ‘বিষ্ণুপাদ’ বলিব, কিন্তু শিক্ষাগুরুকে সেইরূপ সম্মান প্রদান করিলে কিংবা সতীর্থ ভ্রাতাকে ‘বিষ্ণুপাদ’-ভূষণে ভূষিত করিলে দীক্ষাগুরুদেবের প্রতি অমর্য্যাদা-প্রদর্শন অর্থাৎ দীক্ষাগুরুদেবকে শিক্ষাগুরুর সহিত সমান বা তাঁহার শিষ্যের সহিত সমান বিচার করায় পাষণ্ডতা, মায়াবাদ ও গুর্ব্বপরাধ উপস্থিত হইবে।”

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু ও আমাদের শ্রীল প্রভুপাদ এ বিষয়ের সুষ্ঠু বিচার করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন—

‘শিক্ষাগুরুকে ত’ জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।’

(চৈঃ চঃ আ ১।৪৭)

দীক্ষাগুরুর ন্যায় শিক্ষাগুরুও কৃষ্ণের স্বরূপ, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের “আচার্য্য-চৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি”—(ভাঃ ১১।২৯।৬) পদেও উক্ত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ অনুভাষ্যে বলিয়াছেন,—“আশ্রয়বিগ্রহ শিক্ষাগুরু অভিধেয়বিগ্রহ, সুতরাং ঐ আশ্রয়বিগ্রহ সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরু হইতে পৃথক্ বস্তু নহেন, উভয়েই শ্রীগুরুদেব। তাঁহাদের প্রতি উচ্চাবচ-ভাব-প্রদর্শন বা উপলব্ধি অপরাধ আনয়ন করে। ‘কৃষ্ণরূপে’ ও ‘স্বরূপে’ ভাষাগত বৈষম্য নাই।” (চৈঃ চঃ আ ১।৪৭)

দীক্ষাগুরু সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা শ্রীসনাতন প্রভুর অভিন্ন-বিগ্রহ,

আর শিক্ষাগুরুগণ অভিধেয়-দাতা শ্রীরূপের অভিন্ন-বিগ্রহ। শ্রীসনাতন শ্রীরূপের গুরুদেব বলিয়া শ্রীসনাতন হইতে শ্রীরূপ ছোট—এইরূপ রবিচা শুদ্ধভাগবতগণের নাই, উহা অর্ব্বাচীন প্রাকৃত-সহজিয়াগণের বিচার। যাঁহাকে বা যাঁহাদিগকে আমরা নিষ্কপটে শিক্ষাগুরু বলি, তিনি বা তাঁহারা আমাদের দীক্ষা-গুরুপাদপদ্ম হইতে পৃথক্ তত্ত্ব—এইরূপ নহেন, উভয়ের মধ্যে লীলাবৈচিত্র্যমাত্র বর্ত্তমান। কতকগুলি লোক গুরুসেবকগণকে 'শিক্ষাগুরু' বলিয়া আবার তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিবার ধৃষ্টতা করিয়া থাকে! শিক্ষাগুরুকে কিরূপে শিক্ষা দেওয়া যায়? অত-এব ইহাদের কপটতা ও অসূয়া সহজেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ ইহাদের দীক্ষাগুরুতেও সম্পূর্ণ মর্ত্ত্যবুদ্ধি আছে। কেবল নিজেকে পাষণ্ডপদবী হইতে বাঁচাইবার জন্য মুখে দীক্ষাগুরুর প্রতি অতিমর্ত্ত্য-বুদ্ধির ছলনা প্রকাশ করিয়া থাকে। যদি ইহা-দের দীক্ষাগুরুতে অতিমর্ত্ত্য-বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে তদভিন্ন-তত্ত্ব শিক্ষাগুরুতেও প্রাকৃতবুদ্ধি বা ভেদজ্ঞান থাকিত না।

দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুগণের অপ্রাকৃত-বৈষ্ণবের চরণে বিন্দু-মাত্রও অপরাধ নাই। যেখানে প্রকৃত-বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ দৃষ্ট হয়, সেখানে "বৈষ্ণব-বিদ্বেষী চেৎ পরিত্যাজ্য এব" আচার্য্য-বাক্যানুসারে দীক্ষাগুরুত্ব ও শিক্ষাগুরুত্ব স্বীকৃত হইবে না। যেখানে দীক্ষাগুরুর সহিত শিক্ষাগুরুগণের চিত্তবৃত্তি এক-তাৎপর্য্যপর, সেখানেই শিক্ষাগুরুত্ব। সেইরূপ দীক্ষাগুরুর স্বযূথাশ্রিত ও সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট কোন যোগ্যতম শিক্ষাগুরু যদি আমাদের দীক্ষাগুরুর প্রতিভূরূপে জগতে গুরুগোষ্ঠী বা

গুরুগোত্রবর্দ্ধনরূপ সেবাকার্য্য করেন, তাহা হইলে তিনি আমাদের দীক্ষাগুরু না হইলেও অভিধেয়-বিগ্রহ শিক্ষাগুরু শ্রীরূপের আনুগত্যময়ী সেবা শিক্ষা দেওয়ায় দীক্ষাগুরু শ্রীসনাতনের ভৃত্য-সূত্রে তাঁহাকেও আমরা 'ওঁ বিষ্ণুপাদ-অষ্টোত্তরশতশ্রী' প্রভৃতি ভূষণে ভূষিত করিতে পারি। তিনি সম্বন্ধবিগ্রহ শ্রীসনাতন প্রভুর অভিন্ন-তত্ত্ব দীক্ষাগুরুদেবের কৈঙ্কর্য্য করায় শ্রীসনাতন-শিষ্য শ্রীরূপেরই অভিন্ন-বিগ্রহ সেবাশিক্ষাগুরু। অতএব দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুর অভিন্নত্ব-বিচারে তাঁহাকেও 'বিষ্ণুপাদ' বলা যাইবে।

দীক্ষাগুরুতে ঈশ্বরত্ব অধিক প্রকটিত, আর শিক্ষাগুরুতে সেবকত্বের উজ্জ্বলতার দ্বারা সেব্যত্ব আচ্ছাদিত। গোপীগণ, নন্দ ও যশোদা, সুদাম-শ্রীদাম, রক্তক-পত্রক-চিত্রক—ইঁহারা শিক্ষা-গুরু। ইঁহাদিগকে কৃষ্ণও বলা যাইতে পারে; কিন্তু ইঁহারা কৃষ্ণত্বকে সেবার বিলাসে আচ্ছাদিত করিয়াছেন। ইঁহারা কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণশক্তি। ইঁহাদিগকে 'বিষ্ণুপাদ' লিখিলে মায়াবাদ হয় না। কিন্তু অপরআশ্রয়বিগ্রহগণ যদি আপনাকে নন্দ-যশোদা, শ্রীদাম-সুদাম বা রক্তক-পত্রক-চিত্রক প্রভৃতি আশ্রয়বিগ্রহ মনে করেন, তাহা হইলে অহংগ্রহোপাসনারূপ মায়াবাদ-অপরাধ উপস্থিত হয়। নিজেকে মূল-আশ্রয়-বিগ্রহ বা বিষয়-বিগ্রহ উভয়-প্রকার অভিমানই মায়াবাদ। নন্দ-যশোদা কিংবা শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীজীব. শ্রীল কবিরাজ, শ্রীল নরোত্তম, শ্রীল বিশ্বনাথ, শ্রীল বলদেব, শ্রীল জগন্নাথ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদকে, 'ওঁ বিষ্ণু-পাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী', 'ভাগবত পরমহংস', প্রভুপাদ প্রভৃতি

বলা হয় বলিয়া আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের প্রতি ঐ সকল শব্দই প্রয়োগ করিলে তিনি কি তাহাতে আপত্তি করিতেন? বা ঐ সকল শব্দ তাঁহার প্রতি প্রয়োগ করা মায়াবাদ ও ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ হইয়াছে,—ইহা বলিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতেন? নিত্যসিদ্ধ পূর্ব্বগুরুগণ 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' প্রভৃতি যে-সকল শব্দের দ্বারা স্তুত হইয়াছেন, সেইসকল শব্দ যখন শিষ্যবর্গ তাঁহার সম্মুখে তাঁহারই প্রতি প্রয়োগ করিতেন, গ্রন্থে, অভিনন্দনে, সাময়িক পত্রে প্রচার করিতেন, তখন সেইগুলি ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও মায়াবাদ হইলে বা তদ্দ্বারা গুরুর আসন, গুরুর বিশেষণ আত্মসাৎ করিবার কোন অভক্তিপর অভিসন্ধি থাকিলে শ্রীল প্রভুপাদ ঐ আদর্শকে মায়াবাদ বা গুর্ব্ববজ্ঞা বলেন নাই কেন? বরং উহাকে ভক্তিসিদ্ধান্তই বলিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদই বিরুদ্ধবাদিগণের মতবাদ গৌড়ীয়ে, দৈনিক নদীয়াপ্রকাশে, বক্তৃতায়, প্রবন্ধে শত শত বার নিরাস করিয়াছেন। যাহা মায়াবাদ ও সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ, তাহা শ্রীল প্রভুপাদ কেন স্বীকার করিবেন? আচার্য্যগণ প্রত্যেকেই নিজ-গুরুপাদপদ্মে ভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশেষণসমূহ পৌঁছাইয়া দিয়া ঐ সকল বিশেষণের দ্বারা গুরুদেবেরই সেবা করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীব্যাসপূজার 'প্রতি-নিবেদনে' বলিয়াছিলেন— "শ্রীব্যাসের অনুগ-সম্প্রদায় তাঁহার আনুগত্যের পরিচয়ে আবহমানকাল আম্নায়-পারম্পর্য্যে শ্রীব্যাসাসনে উপবিষ্ট হইয়া

শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। প্রাপঞ্চিক-বিচারে নিজ-অযোগ্যতার বিচার আসিয়া অধিরোহণ-কার্য্যে বাধা দেয় বটে, কিন্তু শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা-লঙ্ঘনরূপ দুষ্প্রবৃত্তিবশে আমাদিগকে যেন কোনদিন গুরুপাদপদ্ম-সেবাবিমুখ না হইতে হয়—ইহাই শ্রীব্যাসদেবের শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের শ্রীচরণে আমাদের বিজ্ঞপ্তি।"

শ্রীল প্রভুপাদ আরও বলিয়াছেন,—"যে-সকল বাক্য **আমার উদ্দেশ্যে কথিত হইয়াছে, তাহাতে প্রাপঞ্চিক-বিচারে আমার কোন যোগ্যতা নাই বলিয়া ঐসকল উক্তিই শ্রীগুরু-দাস সূত্রে আমার পূর্ব্বগুরুগণের প্রাপ্য বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদের শ্রীচরণকমলে সমর্পণ করিতেছি।** বহিঃপ্রজ্ঞা চালিত হইয়া ঐ বাণীসমূহ আত্মসাৎ করিতে আমার কোন সামর্থ্য নাই, যেহেতু **প্রভুর আদেশে "তৃণাদপি-সুনীচ" ক্ষীণশরীরী আমি এতাদৃশ গুরুভারবহনে অনিপুণ, সুতরাং এইসকল কথা শ্রীমদ্‌গুরুতত্ত্বের উদ্দেশে প্রেরণ করা ব্যতীত আমার আর গত্যন্তর নাই।**

"ভবতা মহতা সমর্পিতং ন হি ধর্ত্তুং প্রভবামি বৈভবম্।
উচিতং গুরবেঽহং অদ্য তং সুবরাকঃ প্রণয়াৎ সমর্পয়ে॥"

—(বক্তৃতাবলী ৪র্থ খণ্ড 'প্রতিনিবেদন')

ইহাই আচার্য্যত্বের রহস্য যে, আচার্য্য পূর্ব্বগুরুবর্গের মর্য্যাদা, শিষ্যের কর্ত্তব্য-শিক্ষাদান ও আম্নায়ধারা সংরক্ষণকল্পে সকল উপায়ন ও বিশেষণ গুরুবর্গের নিকট পৌঁছাইয়া দেন, নিজে মধ্যপথে

ডাকাতি করেন না। কেহ 'বিষ্ণুপাদ', 'পরমহংস' বা 'ভগবচ্চরণ' বলিতে উদ্যত হইলে দৈন্যের ছলনায় কপটতা করিয়া 'ঐসকল বলিও না' বলিয়া নিজেকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবা হইতে বঞ্চিত ও ভক্তিবিধানকারীকে তাঁহার সেবা-বৃত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া নির্ব্বিশেষবাদী হন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যখন কোন কোন ব্যক্তি নির্ব্বিশেষবাদীগণের বিচারে সন্ন্যাসী দেখিয়া "জঙ্গম-নারায়ণ" প্রভৃতি বলিয়াছেন, তখন মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—

"—'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু' ইহা না কহিবা!
জীবাধমে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান কভু না করিবা!
সন্ন্যাসী— চিৎকণ জীব, কিরণ-কণ-সম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম॥
যেই মূঢ় কহে,—জীব ঈশ্বর হয় 'সম'।
সেই ত' 'পাষণ্ডী' হয়, দণ্ডে তারে যম॥"

—(চৈঃ চঃ ম ১৮।১১১, ১১২, ১১৫)

সেই মহাপ্রভুই আবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ও শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে আচার্য্যকে ভগবৎপ্রকাশ-বিগ্রহ ও তাঁহার নামের পূর্ব্বে 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' বলিবার আদেশ প্রদান করিলেন। ইহা-দ্বারা আচার্য্য দর্শনে জীব-দর্শন নাই,—ইহাই প্রমাণিত হইল। আশ্রয়বিগ্রহ-সমাশ্লিষ্ট বিষয়-বিগ্রহ-দর্শনই—গৌড়ীয়-দর্শন, আর আচার্য্যে জীব-দর্শন—কল্মষপাদ (রাক্ষস)-দর্শন। আচার্য্য—অভিন্নকৃষ্ণ, তিনি বিষ্ণুপাদ, কিন্তু তাঁহাতে কৃষ্ণকোটিত্ব বা বিষ্ণু-

কোটিত্বের বিচার নাই। শিক্ষাগুরুও কৃষ্ণকোটি নহেন,—সেবক-কোটি। সর্ব্বদেবময়ত্ব আচার্য্যত্বের অন্তর্ভুক্ত। আচার্য্য বলিব, অথচ 'বিষ্ণুপাদ' বলিব না—এইরূপ বিচার আচার্য্যের পদের (officeএর) প্রতি অপরাধ—ভক্তিসিদ্ধান্তের নিকট অপরাধ। "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াং"—এই উক্তির দ্বারা কি শ্রীমদ্ভাগবত ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ য়্যাপথিওসিস্ বা জীবে ঈশ্বরকল্পনারূপ অপরাধের প্রশ্রয় দিয়াছেন?

আচার্য্যতত্ত্বটি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য; মন্ত্রদীক্ষারূপ অনুগ্রহের প্রকাশ, বা দিব্যজ্ঞান-প্রদান, শক্তিসঞ্চার—ইহা বিষ্ণুর কার্য্য। আচার্য্য ঐসকল কার্য্য করিয়া বিষ্ণুর সেবা করেন। দীক্ষাদাতা আচার্য্য 'বিষ্ণুপাদ' বলিয়াই একজনের বহু দীক্ষাদাতা হন না; কারণ, বিষ্ণু বহু হইতে পারেন না। বিষ্ণুর নাম-বৈচিত্র্য, রূপ-বৈচিত্র্য, গুণ-লীলা-বৈচিত্র্য হইতে পারে; কিন্তু বিষ্ণুতত্ত্ব বহু হন না। অতএব 'যার যার গুরু, তার তার কাছে, যার যার গৌর, তার তার কাছে" কিংবা "যার যার ইষ্ট, তার তার কাছে মিষ্ট" প্রভৃতি প্রাকৃত-সাহজিক-বিচার সম্পূর্ণ অভক্তিপর। আচার্য্য-তত্ত্ব এক অদ্বিতীয় অখণ্ড বলিয়া বর্ত্তমান আচার্য্যকে পূর্ব্বাচার্য্যগণের ন্যায়ই 'বিষ্ণুপাদ' বলা হইবে, নতুবা আচার্য্যত্ব-স্বীকার কপটতা মাত্র। অসূয়া বা মৎসরতা ঐ কপটতাকে অনতিবিলম্বেই প্রকাশ করিয়া দেয়। আচার্য্য বৈকুণ্ঠবস্তু। বৈকুণ্ঠবস্তুতে অদ্বয়জ্ঞানেতর ভেদ নাই।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম হইতে

দীক্ষালব্ধ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদকে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ হইতে অভিন্ন-বিচারে ও আচার্য্য-দর্শনে 'বিষ্ণুপাদ', 'পরমহংস', 'প্রভুপাদ' প্রভৃতি শব্দের দ্বারাই ভূষিত করিয়া থাকেন। শ্রীল ভক্তি-বিনোদের অনুগ শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীল গৌরকিশোরের অনুগ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর। অতএব শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর সতীর্থেরও এক পুরুষ নিম্নে—এরূপ প্রাকৃত-বিচার পূজনীয় শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের হৃদয়ে স্থান পায় নাই। কাজেই কোন সতীর্থ শ্রীগুরুপাদপদ্মের যোগ্যতম অধস্তন হইলেও আমরা যে কেবল তাঁহাকে আমাদের সহিত সমান বা কিঞ্চিৎ উন্নত বিচার করিয়া আমাদিগের সখা, বয়স্য বা আমরা তাঁহার পাল্লাদার-বিচারে একজগদ্‌গুরুবাদ-স্বীকারকারী সিমাইট্‌দের অভক্তিপর বিচারের সংক্রামক ব্যাধিতে পীড়িত হইয়া তথাকথিত ব্রাদারহুড্ (Brotherhood) স্থাপন করিব ও একজনের নিকট মাথা বিকাইয়াছি" মুখে বলিয়া কার্য্যতঃ যথেচ্ছাচারী ও স্বতন্ত্র হইবার অভিসন্ধিতে আনুগত্য-ধর্ম্মকে চুলায় দিব—এইরূপ উদ্দেশ্য নির্বিশেষবাদ ও নাস্তিকতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

—০—

"মন যে পাগল মোর"

সাধকমাত্রেই মনের 'পাগলামি' ন্যূনাধিক অনুভব করিয়া থাকেন। পরদুঃখদুঃখী শ্রীগৌরনিজজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'কল্যাণকল্পতরু'র 'শ্রীগোপীনাথের প্রতি বিজ্ঞপ্তি'র মধ্যে সাধকজীবের চিত্তের অবস্থার কথা জানাইয়াছেন,—

"গোপীনাথ! মন যে পাগল মোর।
না মানে শাসন, সদা অচেতন,
বিষয়ে র'য়েছে ঘোর॥"

একদিন শ্রীঅর্জ্জুন জীবশিক্ষার জন্য শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ! প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥"

(শ্রীগীঃ ৬।৩৪)

হে কৃষ্ণ! যেহেতু মন স্বভাবতঃ চঞ্চল ও প্রমাথি অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়-ক্ষোভকারক, বলবান্ ও দৃঢ়, সেইহেতু আমি বায়ুর নিরোধের ন্যায় মনের নিরোধ দুষ্কর মনে করি।

শ্রীউদ্ধব-গীতায়ও উক্ত হইয়াছে,—

"মনোবশেঽন্যে হ্যভবন্ স্ম দেবা
মনশ্চ নান্যস্য বশং সমেতি।
ভীষ্মো হি দেবঃ সহসঃ সহীয়ান্
যুঞ্জ্যাদ্বশে তং স হি দেবদেবঃ॥"

তং দুর্জ্জয়ং শত্রুমসহ্যবেগম্
অরুন্তুদং তন্ন বিজিত্য কেচিৎ॥
কুর্ব্বন্ত্যসদ্বিগ্রহমত্র মর্ত্ত্যৈ-
র্মিত্রাণ্যুদাসীনরিপূন্ বিমূঢ়াঃ॥"

(শ্রীভাঃ ১১।২৩।৪৭-৪৮)

অন্য দেবগণ এই মনের বশীভূত, কিন্তু মন কাহারও বশীভূত হয় না; যেহেতু এই মন বলবান্ হইতেও মহাবলশালী এবং যোগিগণেরও ভয়ঙ্কর; অতএব যিনি মনকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিজয়ী হইয়া থাকেন। অতএব যাহারা অসহনীয় রাগাদি-বেগযুক্ত, মর্ম্মপীড়ক মনোরূপ দুর্জ্জয় শত্রুকে পরাজিত না করিয়া তন্নিমিত্ত কোন কোন পুরুষের সহিত বৃথা কলহে প্রবৃত্ত হইয়া সে-বিষয়ে উদাসীন রিপুগণকে মিত্ররূপে গণ্য করেন, তাহারা অতিশয় মূর্খ।

শ্রীভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন—

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥"

(শ্রীগী: ৬।৩৫)

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে মহাবাহো অর্জ্জুন! মন দুর্ব্বিনীত ও চঞ্চল, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু হে কুন্তীনন্দন! পরমাত্ম-সেবার অভ্যাস ও বিষয়বৈরাগ্যদ্বারা তাহা নিগৃহীত হয়।

শ্রীভগবান্ অভ্যাসযোগ ও বৈরাগ্যযোগের দ্বারা ক্রমশঃ মনোনিগ্রহের উপদেশ কীর্ত্তন করিয়া উপসংহারে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠযোগের কথা নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥"

(শ্রীগী ৬।৪৭)

যিনি আমাতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া মদ্গতচিত্তে আমাকে ভজন করেন, তিনি সকলপ্রকার যোগিগণের মধ্যে যুক্ততম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার মত।

শ্রীউদ্ধব গীতায় শ্রীল উদ্ধব মহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—

"প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ।
বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্রহকর্শিতাঃ ॥"

(শ্রীভাঃ ১১।২৯।২)

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! প্রায়ই দেখা যায় যে, যে-সকল যোগী যোগমার্গে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা মনোনিগ্রহ-বিষয়ে ব্যাকুল হইয়া ক্লেশই পাইয়া থাকেন; বস্তুতঃ তদ্দ্বারা তাঁহাদের মনোনিগ্রহ হয় না।

ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধব মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া জগজ্জীবের দুর্জ্জয় মন বা সংসার-জয়ের প্রকৃষ্ট উপায় কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"হন্ত তে কথয়িষ্যামি মম ধর্ম্মান্ সুমঙ্গলান্।
যান্ শ্রদ্ধয়াচরন্ মর্ত্ত্যো মৃত্যুং জয়তি দুর্জ্জয়ম্ ॥"

কুর্য্যাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মদর্থং শনকৈঃ স্মরন্।
ময্যর্পিতমনশ্চিত্তো মদ্ধর্ম্মাত্মমনোরতিঃ ॥
দেশান্ পুণ্যানাশ্রয়েত মদ্ভক্তৈঃ সাধুভিঃ শ্রিতান্।
দেবাসুরমনুষ্যেষু মদ্ভক্তাচরিতানি চ ॥
পৃথক্ সত্রেণ বা মহ্যং পর্ব্বযাত্রা মহোৎসবান্।
কারয়েদ্গীত-নৃত্যাদ্যৈর্ম্মহারাজবিভূতিভিঃ ॥
নরেষ্বভীক্ষ্ণং মদ্ভাবং পুংসো ভাবয়তোঽচিরাৎ।
স্পর্দ্ধাসূয়াতিরস্কারাঃ সাহঙ্কারা বিয়ন্তি হি ॥
বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্ ॥
যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে।
তাবদেবমুপাসীত বাঙ্মনঃকায়বৃত্তিভিঃ ॥
অয়ং হি সর্ব্বকল্পানাং সধ্রীচীনো মতো মম।
মদ্ভাবঃ সর্ব্বভুতেষু মনোবাক্কায়বৃত্তিভিঃ ॥"

(শ্রীভাঃ ১১।২৯।৮-১১, ১৫-১৭,১৯)

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে উদ্ধব! মর্ত্তপুরুষ শ্রদ্ধা-সহকারে যে-সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে দুর্জ্জয় সংসার জয় করিতে পারেন, আমি তোমার নিকট মদীয় সেই সুমঙ্গল ধর্ম্মসমূহ বর্ণন করিতেছি। আমার প্রতি মনঃ ও চিত্ত সমর্পণ করিয়া মদীয় ধর্ম্মসমূহে আত্ম-মনোরতিযুক্ত পুরুষ আমার স্মরণ-সহকারে আড়ম্বর-রহিত হইয়া মদীয় প্রীতির জন্য নিত্য-নৈমিত্তিকাদি যাবতীয় ধর্ম্মের অনুশীলন করিবেন। মদ্ভক্ত সাধুপুরুষগণের আশ্রিত পুণ্য-দেশসমূহে

(শ্রীমাদিতে) অবস্থান এবং দেব, অসুর এবং মনুষ্য মধ্যে যাঁহারা আমার ভক্ত, তাঁহাদের আচরণের অনুসরণ করিবেন। একাকী অথবা বহুলোক একত্র হইয়া নৃত্যগীত প্রভৃতি মহারাজ-বৈভব সমূহদ্বারা আমার পর্ব্ব, যাত্রা ও মহোৎসবাদি সম্পাদন করিবেন। যিনি মানবগণের মধ্যে সর্ব্বদা আমার অবস্থান চিন্তা করেন, সেরূপ ব্যক্তির অহঙ্কার, স্পর্দ্ধা, অসূয়া ও তিরস্কারাদি দুর্গুণ অচিরেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। উপহাসকারী সহচরগণ দেহবিষয়ে উচ্চনীচ দৃষ্টি এবং লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক কুক্কুর, চণ্ডাল, গো, গর্দ্দভ পর্য্যন্ত যাবতীয় জীবের দর্শনেই ভূমিতে দণ্ডবৎ-প্রণত হইবে। যে-কাল পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে মদ্ভাবদর্শন উৎপন্ন না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কায়মনোবাক্যবৃত্তিদ্বারা এইরূপ উপাসনা করিবে। সর্ব্বপ্রকার উপায়ের মধ্যে কায়মনোবাক্যবৃত্তিদ্বারা সর্ব্বভূতে মদ্ভাবদর্শনই সমীচীন উপায় বলিয়া আমার সম্মত জানিবে।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর করুণার জন্য চিত্ত আর্ত্ত হইলে মনের সংসার-বাসনা বিনষ্ট হয় ও মন বিষয় ছাড়িয়া শুদ্ধ হয়। তখনই শ্রীধামের দর্শন এবং শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের শ্রীপাদপদ্মে আকুতি ও শ্রীযুগলপ্রীতির তাৎপর্য্য উপলব্ধি হয়।

দুর্দ্দান্ত মনের এমনই স্বভাব যে, সে বৈরাগ্য-যোগ বা অভ্যাস-যোগের নিয়ামকত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। মন প্রথম-মুখেই বিদ্রোহীর ন্যায় নিগ্রহের সর্ব্বপ্রকার উপায়-সমূহের বিরুদ্ধে অভিযান আনয়ন করে। এইজন্যই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অনর্থযুক্ত জীবের মনের অবস্থা-সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি করিয়াছেন,—

"গোপীনাথ ! হার যে মেনেছি আমি ।
অনেক যতন, হইল বিফল,
এখন ভরসা তুমি ॥"

নিজের শত শত চেষ্টাদ্বারা দুষ্ট মনকে বশীভূত করা যায় না। জীব যখন ঐরূপ চেষ্টা ও যত্ন করিতে করিতে 'হার মানিয়া' "এখন ভরসা তুমি' – এই বিচারে একমাত্র শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করেন, অর্থাৎ শরণাপত্তিমূলক ভক্তিযোগ আশ্রয় করেন, তখনই তাঁহার চিত্ত আনুষঙ্গিক ও স্বাভাবিক-ভাবে দমিত হয় এবং মনের মনন-ধর্ম্ম বিদূরিত হইয়া তাহা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বিচরণযোগ্য ক্ষেত্র-রূপে প্রকাশিত হয়। ইহাই—

"অন্যের হৃদয় – মন, 'মোর মন—বৃন্দাবন,
'মনে' 'বনে' এক করি' জানি ॥"

শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীভগবন্নাম-কৌমুদী ও শ্রীসহস্রনামভাষ্যোক্ত পুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়া জানাইয়াছেন, –

"নক্তং দিবা চ গতভীর্জিতনিদ্র একো
নির্ব্বিণ্ণ ঈক্ষিতপথো মিতভুক্ প্রশান্তঃ।
যদ্যচ্যুতে ভগবতি স মনো ন সজ্জে-
ন্নামানি তদ্রতিকরাণি পঠেদ্বিলজ্জঃ ॥" ইতি

অত্র গতভীরিত্যাদয়ো গুণা নামৈকতৎপরতা-সম্পাদনার্থা ন তু কীর্ত্তনাঙ্গভূতাঃ।

যদি শ্রীভগবানে মন আসক্ত না হয়, তাহা হইলে পুরুষ নির্ভয়,

জিতনিদ্র, একাকী, নির্ব্বেদযুক্ত, যথার্থ-মার্গদর্শী, মিতাহারী, প্রশান্ত ও নির্লজ্জ হইয়া অহর্নিশ শ্রীভগবদ্বিষয়ে রতিজনক শ্রীনাম-সমূহ পাঠ করিবে।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে—নির্ভয়ত্ব, জিতনিদ্রত্ব প্রভৃতি গুণসমূহ কি শ্রীনামকীর্ত্তনের অঙ্গ? তদুত্তরে শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু বলিতেছেন যে, এস্থলে ঐসকল গুণ শ্রীনামকীর্ত্তনের অঙ্গস্বরূপে উক্ত হয় নাই; পরন্তু একমাত্র নাম-বিষয়ে তৎপরত্ব-সম্পাদকরূপেই উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রীনামকীর্ত্তন নির্ভয়ত্ব, জিতনিদ্রত্ব প্রভৃতি গুণের অপেক্ষা করে না; শ্রীনামকীর্ত্তন সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বনিরপেক্ষ। এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু 'বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে'র এক ক্ষত্রবন্ধুর উপাখ্যান উদ্ধার করিয়াছেন। এমন কোন অতিপাপ ও মহাপাপ নাই, যাহা সেই ব্যক্তি না করিয়া-ছিল। এক উপদেষ্টা ব্রাহ্মণ উক্ত ক্ষত্রবন্ধুকে, তাহার পাপপ্রবণ মনকে দমন করিবার জন্য বহুবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু ঐসকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান সমস্তই উক্ত ক্ষত্রবন্ধুর পক্ষে অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইল। ইহাতে ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"যদি তুমি পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমর্থ না হও, তাহা হইলে তোমাকে একটী স্বল্প অনুষ্ঠান বলিতে পারি, যদি তুমি আমার সেই উপদেশ পালন কর।" ইহাতে ক্ষত্রবন্ধু বলিল,—

"অশক্যমুক্তং ভবতা চঞ্চলত্বাদ্ধি চেতসঃ।
বাক্শরীরবিনিষ্পাদ্যং যচ্ছক্যং তদুদীরয়॥"

হে ব্রাহ্মণ! আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল, অতএব আপনার

পূর্ব্বোপদিষ্ট সমস্ত অনুষ্ঠানেই অসমর্থ। বাক্য ও দেহের দ্বারা সম্পাদন করা যায়, এরূপ কোন অনুষ্ঠানের উপদেশ করুন, যাহা আমার পক্ষে সাধ্য হয়। তখন উপদেষ্টা ব্রাহ্মণ বলিলেন,—

"উত্তিষ্ঠতা প্রস্বপতা প্রস্থিতেন গমিষ্যতা।
গোবিন্দেতি সদা বাচ্যং ক্ষুত্তৃট্‌প্রস্খলিতাদিষু॥"

(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৬৩ অনুচ্ছেদ)

তুমি উত্থান, নিদ্রা, প্রস্থান ও ভাবিগমন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যে এবং ক্ষুধাতৃষ্ণা-প্রস্খলনাদি যে-কোন অবস্থায় 'গোবিন্দ' এই নাম উচ্চারণ করিবে। কারণ,—

"ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈর্ব্রহ্মবাদিভি-
স্তথা বিশুধ্যত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ।
যথা হরের্নামপদৈরুদাহৃতৈ-
স্তদুত্তমঃশ্লোকগুণোপলম্ভকম্॥"

(শ্রীভাঃ ৬।২।১১)

পাপ-পরায়ণ ব্যক্তির চিত্ত শ্রীহরিনামের উচ্চারণের দ্বারা যেইরূপ বিশুদ্ধ হয়, মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণের উপদিষ্ট ব্রতাদি-অনুষ্ঠানরূপ প্রায়শ্চিত্তাদিদ্বারা সেইরূপ বিশুদ্ধ হয় না। বিশেষতঃ শ্রীহরিনামের উচ্চারণ কেবলমাত্র পাপবিনাশ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, পরন্তু শ্রীহরির গুণ-সমূহের অনুভবজনকও হইয়া থাকে।

'শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'য় শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় জীব-শিক্ষার জন্য গাহিয়াছেন,—

"দেহে বৈসে রিপুগণ, যতেক ইন্দ্রিয়গণ,
কেহ কা'র বাধ্য নাহি হয়।

শুনিলে না শুনে কান, জানিলে না জানে প্রাণ,
দঢ়াইতে না পারে নিশ্চয়॥

• • *

আপনি পলা'বে সব, শুনিয়া 'গোবিন্দ'-রব,
সিংহরবে যেন করিগণ।
সকল বিপত্তি যা'বে, মহানন্দ সুখ পা'বে,
যা'র হয় একান্ত ভজন॥"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময় বলিতেন,—পাগল মন যতটা ইচ্ছা পাগলামি করুক্ না কেন, তাহা লইয়া ব্যস্ত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনে নিযুক্ত থাকিতে হইবে ; তাহা হইতে একমুহূর্ত্ত বিরাম দিলেই মায়া প্রবেশ করিবে। মনের চাঞ্চল্যকে সেবাচাঞ্চল্যে নিযুক্ত করিয়া দাও। মনের দিকে দৃষ্টি রাখিবে না, সেবার দিকে দৃষ্টি রাখিবে ; দেখিবে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর কৃপায় তাহা শ্রীকৃষ্ণের বিচরণস্থান হইয়াছে। দুষ্ট মনের চাঞ্চল্যে ভীত হইয়া যাহারা সাধুসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্জ্জনতার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদিগের উপরই দুষ্ট মন আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে। যাঁহারা সাধুসঙ্গে থাকিয়া অনুক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের মনের চঞ্চলতা কোন প্রতিকূল আচরণ করিতে পারে না, তদনুকূলই হইয়া পড়ে।

শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু 'শ্রীপদ্যাবলী'তে কোন প্রাচীন মহাজনের একটী শ্লোক উদ্ধার করিয়া এই সিদ্ধান্তটী সুদৃঢ়ভাবে হৃদয়ে অবধারণ করিবার ইঙ্গিত করিয়াছেন,—

"দেবকীতনয়সেবকীভবন্
যো ভবানি স ভবানি কিন্ততঃ।
উৎপথেষ্বচন সৎপথে অপি বা
মানসং ব্রজতু দৈবদেশিতম্ ॥"
(শ্রীপদ্যাবলী—৮১)

আমি শ্রীদেবকীনন্দনের সেবক হইয়া যে হই সে হই না কেন, আমার মন দৈবপ্রেরিত হইয়া কখনও বিপথে, কখনও বা সৎপথেই গমন করুক্, তাহাতে আমার কি হইবে ? অর্থাৎ মনোধর্ম্মের ভাল-মন্দ— মনের চাঞ্চল্য। এইসকল লইয়া আমার মাথা ঘামাইবার বা সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। আমি শ্রীনন্দনন্দনের আনুগত্যে সর্ব্বক্ষণ নববিধা ভক্তির অনুশীলন করিব। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

"সংসার-বাটোয়ারে, কাম-ফাঁসে বান্ধি' মারে,
ফুকারি' কহয়ে হরিদাস।
করহ ভকতসঙ্গ, প্রেমকথা-রসরঙ্গ,
তবে হ'বে বিপদ্ বিনাশ ॥"

শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর 'মনঃশিক্ষা', শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের মনঃশিক্ষা সূচক পদাবলী প্রভৃতিতে সকলেই একবাক্যে মনকে সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে থাকিয়া শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগতিই শিক্ষা দিয়াছেন।

"মন ! তুমি ধর বাক্য মোর।
এই সব বাটপাড়, অতিশয় দুর্নিবার,
যখন ঘিরিয়া করে জোর ॥
আর কিছু না করিয়া বৈষ্ণবের নাম লঞা,
ফুকারিয়া ডাক উচ্চরায়।
বকশত্রু-সেনাগণে, কৃপা করি' নিজজনে,
যা'তে করে উদ্ধার তোমায় ॥"

* * *

"সাধুসঙ্গ বিনা আর-কোথা তব ইষ্ট।
বৈষ্ণব চরণে মজ ঘুচিবে অনিষ্ট ॥"

—০—

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও ভক্তিসিদ্ধান্ত

"নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্ত-হারিণে ॥"

পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেব, পরম পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দ ও শ্রদ্ধেয় শ্রোতৃমণ্ডলি ! আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব প্রভু "শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও জনমত" সম্বন্ধে বক্ত,তায় শ্রীল

প্রভুপাদের লিখিত 'বঙ্গে সামাজিকতা' গ্রন্থ হইতে বিভিন্ন মতবাদ ও শ্রীল প্রভুপাদের খণ্ডন ও সমালোচনার আলোচনা করিয়াছেন। 'বাদ' শব্দটি 'সিদ্ধান্ত' শব্দের বিপরীত শব্দ। যাহা তর্কের দ্বারা কিংবা প্রমাণান্তরের দ্বারা খণ্ডিত হইবার যোগ্য, তাহাই 'বাদ' আর যাহাকে কোন প্রকার দ্বিতীয় প্রমাণ খণ্ডন করিতে পারে না—যাহা নিত্যসিদ্ধ সত্য, স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণরূপে প্রতিষ্ঠিত, তাহাই 'সিদ্ধান্ত'। 'বাদ' অমীমাংসিত ব্যাপার আর 'সিদ্ধান্ত' নিত্য মীমাংসিত সত্য।

শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিকে আধ্যক্ষিক-মতবাদিসম্প্রদায়ের ন্যায় কোনদিনই বাদের অন্তর্গত বিচার করেন নাই। **শ্রীল প্রভুপাদ কোনদিনই "ভক্তিবাদ" এই শব্দটি ব্যবহার করিতে দেন নাই।** তিনি "ভক্তিসিদ্ধান্ত" এই শব্দ-ব্যতীত অন্য কোন শব্দই শুনিতে পারিতেন না। প্রায় সতের বৎসর পূর্ব্বের কথা বলি, একবার শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' এই শব্দটি উচ্চারণ করিয়াছিলাম। শ্রীল প্রভুপাদ ইহা শুনিয়া আমাকে বলিলেন—অচিন্ত্যভেদাভেদ-"বাদ" না বলিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ-"সিদ্ধান্ত" বলাই ভাল। কারণ উহাই বেদান্তের নিত্য প্রতিষ্ঠিত ও নিত্যসিদ্ধ অখণ্ডযোগ্য একমাত্র সত্য ও মীমাংসা।

শ্রীল প্রভুপাদের নাম শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী। তাঁহার 'নাম' ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী, তাঁহার 'রূপ' ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী—শ্রীরূপের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী, তাঁহার 'গুণ'—সিদ্ধান্তবাণী, তাঁহার 'পরিকর-বৈশিষ্ট্য'—ভক্তিসিদ্ধান্ত; তাঁহার নিজজনগণকে চিনিবার একমাত্র কষ্টিপাথর—তাঁহাদের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীতে কতটা উপলব্ধি তাহা

শুনিয়া—তাঁহার 'লীলা'—ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-প্রচার। এই যে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত মঠ, মন্দির, প্রদর্শনী, ইহাদের মূল উদ্দেশ্য কেবল ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর আচার ও প্রচার। 'তিনি কতটা অনুস্বার বিসর্গে পণ্ডিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের কতটা উচ্চতম উপাধিধারী, কতটা জাগতিক ঐশ্বর্য্য ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, তিনি ব্রহ্মচারী না সন্ন্যাসী,' ইহা দেখিয়া তাঁহার কোন আত্মমঙ্গলকামী সত্যানুসন্ধিৎসু দাস, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আকৃষ্ট হন নাই। অনেক অনুস্বার-বিসর্গ-ওয়ালা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত থাকিতে পারেন, মায়াবাদি-সম্প্রদায়ে অনেক বৃহদ্‌ব্রতী ও কামিনীকাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসী থাকিতে পারেন, হিট্‌লার, মুসোলিনী, ডি ভ্যালেরা প্রভৃতির ন্যায় ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন রাষ্ট্রনায়ক বা ভারতবর্ষীয় অনেক জননায়ক থাকিতে পারেন; কিন্তু সেইরূপ ব্যক্তিত্বের মধ্যেও আমরা দেহাত্মবাদ বা নানাপ্রকার অভক্তিমতবাদই লক্ষ্য করি। **কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদে ভক্তিসিদ্ধান্তই তাঁহার নিত্যসিদ্ধ ব্যক্তিত্বরূপে প্রকাশিত। ভক্তিসিদ্ধান্ত হইতে তাঁহার ব্যক্তিত্বকে পৃথক্ করিলে আমরা শ্রীল প্রভুপাদকে পাই না।** সেখানে আমাদের প্রভু 'বাদ' অর্থাৎ বিযুক্ত হইয়া পড়েন। **ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিযুক্ত প্রভুপাদ বা প্রভুপাদের ব্যক্তিত্ব মায়া বা তাঁহার বঞ্চনা।**

আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থসমূহে শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব প্রভৃতি আচার্য্যগণ অপেক্ষা শ্রীব্যাসের চরণ-বন্দন-প্রণামাদির অভিনয় কিছু কম করেন নাই। আচার্য্য শঙ্করের পাণ্ডিত্য-প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব-প্রতিভা কোনটীই কম নহে। মায়াবাদিসম্প্রদায়ও

নিজদিগকে ব্যাসানুগসম্প্রদায় বলিয়া থাকেন। কিন্তু একমাত্র ভক্তিসিদ্ধান্তের দ্বারাই তাঁহাদের সেই ব্যাসানুগত্যের অভিনয়, স্তবস্তুতিবন্দনা সকলই যে মায়াবাদ, তাহা প্রমাণিত হয়। পৃথিবীর চক্ষে যাঁহারা অভ্রান্ত অসমোর্দ্ধ বা অদ্বিতীয়, ধার্ম্মিকতার ব্যক্তিত্ব বলিয়া সর্ব্বজনস্বীকৃত হইয়াছিলেন, শ্রীল প্রভুপাদ একমাত্র ভক্তিসিদ্ধান্ত-অস্ত্রের দ্বারা তাহা খণ্ডবিখণ্ডিত করিয়াছেন। 'বঙ্গে সামাজিকতা' গ্রন্থে বা পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিভিন্ন মনীষীর সহিত সংলাপমুখে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের যে সকল মনোধর্ম্ম বা মতবাদ নিরাস ও খণ্ডন করিয়া অকৈতব বাস্তবসত্যের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, উহার একমাত্র সুদর্শন-অস্ত্র—ভক্তিসিদ্ধান্ত।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকায় শ্রীগৌরসুন্দর কর্ত্তৃক নানা-মতবাদ-গ্রাহ-গ্রস্ত দাক্ষিণাত্য-জনহস্তীকে উদ্ধারের যে একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—'যাঁহারা হরিসেবা-বিমুখ হইয়া কুসিদ্ধান্তকে ভক্তি-সিদ্ধান্তের সহিত সমপর্য্যায়ে গণনা করে, তাহাদের সঙ্গ হইতে জীবকুলকে সেবোন্মুখ করিবার জন্যই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রপঞ্চে লীলা-প্রকটন। শ্রীচৈতন্য-কৃপা-বঞ্চিত জনগণের দুঃসঙ্গরূপ কু-সিদ্ধান্তের হস্ত হইতে একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত জনগণই মুক্ত হইতে সমর্থ। **শ্রীচৈতন্য-কৃপা-বঞ্চিত জনগণ কুসিদ্ধান্ত-গর্ত্তে কূপমণ্ডূকবিচারে প্রাপঞ্চিক দর্শনে আবদ্ধ থাকিবেন।** তাহারা কোনকালেই অধোক্ষজসেবায় নিযুক্ত হইবার অধিকার পাইবেন না।"

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা যে-সকল বাদের কথা উল্লেখ করিয়া ঐগুলিকে জগতের মঙ্গলের পথের প্রতিবন্ধক বলিয়াছেন, ঐ সকল মতবাদ পৃথিবীর শতকরা নিরানব্বই দশমিক নয় পৌনঃপুনিক সংখ্যক লোক লুফিয়া লইয়াছে। যে চিজ্জড়-সমন্বয়বাদকে এক-মাত্র গৌড়ীয় মঠ নিন্দা করিতেছেন, তাহা পৃথিবীর প্রায় সকল লোকই সকল সমস্যার একমাত্র সমাধান বা শেষ কথা বলিয়া বরণ করিয়াছেন এবং 'এই মতবাদ প্রচারের দ্বারা বর্ত্তমান যুগ পাঁচশত বৎসর অগ্রগামী হইয়া পড়িয়াছেন' এইরূপ কথাও অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। পৃথিবীর শতকরা প্রায় শতজন লোকের এইরূপ বিচার বা মতবাদকে কে খুব জোরে ধাক্কা দিতে পারিয়াছেন ?—চিজ্জড়-সমন্বয়-বাদের আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের বিরাট্‌রূপকে কে ম্লান করিতে পারিয়াছেন? যিনি শ্রীরূপানুগবিরুদ্ধ অপসিদ্ধান্ত অন্ধকারের বিনাশক— ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ, একমাত্র সেই শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী শ্রীল প্রভুপাদ। তিনি চিজ্জড়সমন্বয়বাদের অধিনায়কের ন্যায় বিশ্বপূজিত বলিয়া গৃহীত না হইতে পারেন সাধারণ সংবাদপত্রের স্তম্ভে তাঁহার নাম অধিক প্রকাশিত হইতে না পারে. কিন্তু একমাত্র ভক্তি-সিদ্ধান্তের দ্বারাই তিনি বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ বা শ্রীসনাতন-রূপ-রঘুনাথের অভিন্ন-বিগ্রহরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন।

তাই শ্রীল প্রভুপাদের পরিকর-বৈশিষ্ট্য কোথায়, শ্রীল প্রভু-পাদের মর্ম্মজ্ঞ অন্তরঙ্গ কে, তাঁহার অধস্তন কে, ভক্তিবিনোদ-গৌর-কিশোর-সরস্বতী-ধারার সংরক্ষক কে, যখন অনুসন্ধান করা যায়,

তখন ভক্তিসিদ্ধান্তের কষ্টিপাথরেই তাহার স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ প্রকাশিত হয়। একথা শ্রীল প্রভুপাদ কোটি-কোটিবার বলিয়াছেন এবং গৌড়ীয় মিশনের প্রত্যেক ব্যক্তি চিরদিনই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, শ্রীল অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর ন্যায় শ্রীল প্রভুপাদের ভক্তিসিদ্ধান্ত আর কেহই সমগ্ররূপে বা সুষ্ঠুভাবে ধারণ করিতে পারেন নাই। রজস্তমোগুণতাড়িত হইয়া গায়ের জোরে বা গলাবাজির দ্বারা অথবা কাপট্য-কুটিনাটিমূলে ভক্তিসিদ্ধান্তে অভিজ্ঞান বা শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার করা যায় না। প্রতিযোগিতা ও অনুকরণমূলে, গায়ের জোরে ও টাকার গরমে গ্রাম্যবার্ত্তাবহকে রূপানুগ বার্ত্তাবহ বলিয়া প্রচার করিলেই তাহা শ্রীরূপের ভক্তিসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। দুই একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত বলি।

একবার দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের একজন লেখকম্মন্য ব্যক্তি বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন যে ভক্তিসিদ্ধান্ত Intellectualism বা বুদ্ধির কসরৎ বিশেষ! সেইরূপ প্রচ্ছন্ন দম্ভ লইয়া সেই ব্যক্তি নদীয়া-প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ রূপ লীলাকে কল্পনা-বলে ঐশ্বর্য্যময়ী লীলা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন! আধ্যক্ষিকতার বিচারে সিদ্ধান্ত হইল—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে বিরাট্ গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত ধারণ করিয়া যখন ইন্দ্রের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন, তখন গোবর্দ্ধন-ধারণ-লীলাটি নিশ্চয়ই ঐশ্বর্য্যময়ী লীলা! নদীয়া-প্রকাশে ইহা মুদ্রিত হইয়া গেল! তখন শ্রীল প্রভুপাদ প্রকট ছিলেন। সকলেই ন্যূনাধিক ঐ প্রবন্ধ পাঠ

করিলেন ; কিন্তু কাহারও নিকট ঐ প্রবন্ধ সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু এক জনের দৃষ্টি তাহা অতিক্রম করিতে পারিল না। শ্রীল বাসুদেব প্রভু ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াই 'শ্রীমদ্ভাগবত', শ্রীল রঘুনাথের 'স্তবাবলী', শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা', শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের "মাধুর্য্যকাদম্বিনী" প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বহু প্রমাণ উদ্ধার করিয়া আমার নিকট এক পত্রে ঐ প্রবন্ধের সিদ্ধান্ত বিরোধি মতবাদ কিরূপে সংশোধিত করিতে হইবে, তাহা জানাইলেন। "গৌড়ীয়ে" লোক-মঙ্গলের জন্য দৈনিক নদীয়া প্রকাশের উক্ত লেখকের ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধিমতকে শাস্ত্র যুক্তিমূলে প্রদর্শিত হইল। শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয়ের সেই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—আমি নদীয়া-প্রকাশের প্রবন্ধ তত ভাল করিয়া দেখি নাই, কিন্তু বাসুদেবের দৃষ্টি সর্ব্বত্র আছে ; সে কখনও ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধ সহ্য করিতে পারে না। এই খণ্ডন খুব ঠিক হইয়াছে।

আর একবার 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে'র সম্পাদক অভিমানী অর্থাৎ কেবলমাত্র স্মার্ত্ত উপাধির Show bottle স্বরূপ নামমাত্র সম্পাদক (প্রকৃত শ্রৌত-ভক্তিসিদ্ধান্তের লেখক নহেন) একব্যক্তিকে 'গৌড়ীয়ে'র প্রচ্ছদপটের একটি ব্লকের পরিকল্পনা করিতে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি সুদীর্ঘকাল গবেষণা ও পরিকল্পনার পর বহু অর্থব্যয়ে 'গৌড়ীয়ে'র দুইটি ইলেক্ট্রো ব্লক প্রস্তুত করিয়া গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত করিলে শ্রীল আচার্য্যদেব তাহা দেখিয়া বলিলেন—এইরূপ ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ চিত্র 'গৌড়ীয়ে' কিছুতেই

প্রকাশিত হইতে পারে না। যতই অর্থ এই জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে থাকুক্, কিন্তু ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধ কিছুতেই সহ্য করা যাইবে না। তাহাতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্রাট শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপ-রঘুনাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর চরণে অপরাধ ও তাঁহাদের অসন্তোষ হইবে। ঐ ব্লক দুইটি এখনও অব্যবহৃতভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। ঐ ব্লকটিতে 'গৌড়ীয়' অক্ষর ছিল এবং 'গৌড়ীয়' শব্দের দুইপার্শ্বে গরুড় যুক্তকরে গৌড়ীয়কে স্তব করিতেছেন এইরূপ চিত্র ছিল। ইহা দেখিয়াই শ্রীল আচার্য্যদেব (শ্রীল বাসুদেব প্রভু) ঐ চিত্রের ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ভাব জানাইয়াছিলেন। 'গৌড়ীয়' শব্দের অর্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আশ্রিত বৈষ্ণব, আবার শ্রীগরুড় ও বৈকুণ্ঠের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। কিন্তু এক বৈষ্ণবকে দিয়া আর এক বৈষ্ণবের বন্দনা করাইবার চিত্র প্রকাশ ও প্রচার—ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কার্য্য। শ্রীমতী রাধারাণী মূল আশ্রয়-বিগ্রহ হইলেও তৎপাদপদ্মে কোন অর্চ্চকই তুলসীদেবীকে অর্পণ করিতে পারেন না—ইহা আমরা শ্রীল প্রভুপাদের ভক্তিসিদ্ধান্ত হইতে শ্রবণ করিয়াছি। কোন গুরুসেবক বৈষ্ণবকে যদি কেহ নিজপাদমূলে উপবেশন করাইয়া ঐরূপ আলেখ্য প্রচার করেন, তবে তদ্দ্বারা শ্রীল প্রভু-পাদের আসনে আরোহণ করিবার পাষণ্ডতা হয়। বৈষ্ণবকে স্বীয় পাদমূলে সংরক্ষণ করিয়া অন্তরে গৌরববোধ কখনও কোন-রূপেই ভক্তিসিদ্ধান্ত সম্মত নহে—ইহা শ্রীল প্রভুপাদও 'আলেখ্য' প্রসঙ্গে অনেকবার বলিয়াছিলেন; কিন্তু অসামান্য অতৃপ্ত-প্রতিষ্ঠা-কাঙ্ক্ষীকে প্রতিষ্ঠা-দ্বারা চিরবঞ্চনা করিয়া প্রভুপাদ আত্মমঙ্গল-

কামিগণকে চিরদিন ভক্তিসিদ্ধান্ত শিক্ষা দিয়াছেন। অভিন্নবার্ষভানবী শ্রীল প্রভুপাদের অভিমন্যু-বঞ্চন কার্য্যের আনুকূল্য করিবার জন্যই কেহ কেহ "গৌড়ীয়ে" ঐরূপ প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষীর আগ্রহে ঐরূপ ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ আলেখ্যাদি প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অবঞ্চক-স্বরূপ আমরা তাঁহার ভক্তিসিদ্ধান্তের মধ্যেই পাই। এরূপও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, তিনি চোরকে আরও অধিক চুরি করিবার সুযোগ দানের জন্য চোরের হস্তে বহুমূল্য রত্নাদি নিজহস্তে তুলিয়া দিয়াছেন। ইহা মহাপুরুষগণের একটি বৈশিষ্ট্য। শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীল বংশীদাস প্রভৃতি অতিমর্ত্ত্য পরমহংসশিরোমণিগণের চরিত্রেও এইরূপ আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর নিকট লোকে যে সকল অর্থ দিতেন, শাল, বনাত উপহার দিতেন, তিনি ঐসকল দ্রব্য চোর, দস্যু, ব্যভিচারী, প্রাকৃত-সহজিয়াগণকে দিয়া দিতেন—যাহাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিতেন, তাহাদিগকে মাধুকরী ভিক্ষার শুষ্ক তণ্ডুলমাত্র খাওয়াইয়া নিষ্কপট হরিভজনের উপদেশ দিতেন। একবার শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু অনেকগুলি টাকা জমাইয়া তাহা শ্রীল প্রভুপাদের নিকট গচ্ছিত রাখেন। শ্রীল প্রভুপাদ ঐ টাকা ব্যাঙ্কে রাখিয়া দেন। অকস্মাৎ একদিন শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের নিকট সমস্ত টাকা চাহিয়া বসিলেন। সেদিন ব্যাঙ্ক বন্ধ। সকল কথা বলা হইলেও শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু কিছুতেই তাহা শুনিলেন না বা মানিলেন না। অবশেষে শ্রীল ভক্তিবিনোদ

ঠাকুর তাঁহার ব্যক্তিগত তহবিল হইতে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে সমস্ত টাকা দিয়া দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ সহজিয়াগণের জন্য ঐ টাকা সহজিয়া-সম্প্রদায়ের এক অধিনায়কের নিকট বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কার চুরি করাইবার প্রলোভন উৎপাদন করিয়া-দস্যুবঞ্চনা করেন। শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ বস্তু হইয়াও চোর, দস্যু, কালাপাহাড় প্রভৃতির চিত্ত-বৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের চৌর্য্যকার্য্যের সহায়তাকল্পে তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া অসমর্থের ন্যায় প্রতিভাত হন। শ্রীল প্রভুপাদের চরিত্রেও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, তিনি অনেক অসদ্‌ব্যক্তিকে নানাপ্রকার পারিতোষিক প্রদান করিয়া বঞ্চনা করিয়াছেন। কিন্তু যখন শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিতেন, তখন সেই সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন বঞ্চনা থাকিত না। এইজন্যই ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর কীর্ত্তনকারিরূপেই আমরা শ্রীল প্রভুপাদের নিজস্ব অবঞ্চক-স্বরূপ প্রাপ্ত হই।"

এক সময়ে কৃষ্ণনগরে কুঞ্জকুটীরে যখন শ্রীল প্রভুপাদের পাদ-পদ্মে শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীপাদ মহানন্দ প্রভুসহ এ অযোগ্য পতিতাধম অবস্থান করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিল (বড় দিনের সময়), তখন শ্রীল প্রভুপাদের নিকট একটি সংবাদ আসিল যে, শ্রীল প্রভুপাদের প্রেষ্ঠাভিমানী জনৈক ব্যক্তির প্রিয়তমপাত্র নয়ন-মনোনন্দন-কুলপ্রদীপ একটি বিশেষ অবৈধ কার্য্য করিয়াছে। কতিপয় অকাট্য প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও তীব্রতম তিরস্কারের পরিবর্ত্তে,

নানা দ্রব্য সম্ভার পুরস্কার তাহার ভাগ্যে ঘটিল। সেই ব্যক্তি তখন মনে করিল—শ্রীল প্রভুপাদ তাহার অবৈধ আচার ধরিতে পারেন নাই, প্রভুপাদ অন্তর্যামী নহেন, প্রভুপাদকে ভোগা দিয়া যে-কোন অন্যায় কার্য্য করা যায় এবং 'নির্দ্দোষ' বলিয়া আত্মগোপন করা যায়! শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রেষ্ঠাভিমানীর নিকট ইহার একরূপ কৈফিয়ৎ দিলেন; আবার ইহাও কঠোর সত্য যে, "গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি", তাই যাঁহারা একমাত্র সত্যের অনু-সন্ধিৎসু, তাঁহাদিগের বাস্তব নিত্যমঙ্গললাভ ইচ্ছা করিয়া বলি-লেন,—"আপনারা যে জন্য আসিয়াছেন, ইহারা সেজন্য আমার নিকট আসে নাই—ইহা জানিয়া আপনারা অকৈতবে হরিভজন করুন।"

দম্ভ ও মাৎসর্য্যবশে শ্রীল প্রভুপাদের ভক্তিসিদ্ধান্ত স্বীকার না করিয়া অবৈধ যোষিৎসঙ্গী কৈতবাশ্রিত প্রাকৃত সহজিয়াগণ তাঁহার বা সপরিকর শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া নিরয়যাত্রী হইয়া পড়ে। প্রকৃত প্রস্তাবে—বাস্তবিকপক্ষে ভগবৎ-পার্ষদ মহাপুরুষগণের ক্রিয়া-মুদ্রা তাঁহাদের কৃপায় উন্মীলিত শ্রৌত-প্রজ্ঞা-চক্ষুর্দ্বারা- শরণাগত নেত্রে দর্শন করিলেই তবে তাঁহাদের মহিমা-রহস্য উপলব্ধি করা যায়। **আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের বা শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের বিন্দুমাত্রও দোষ থাকিতে পারে না, আচার-প্রচারে অসামঞ্জস্য থাকিতে পারে না, শ্রীব্যাস-দেব—অভ্রান্ত,**—"বৈষ্ণবঠাকুর অপ্রাকৃত সদা নির্দ্দোষ আনন্দ-ময়। কৃষ্ণনামে প্রীত, জড়ে উদাসীন, জীবেতে দয়ার্দ্র হয়।"—

প্রভৃতি মহাজন-বাক্যের সত্যতার উপলব্ধি বহু সৌভাগ্যফলে জীবের সংসারক্ষয়োন্মুখ হইলেই তবে উপলব্ধির বিষয় হয়। মায়াবাদাচার্য্য শঙ্করের বা বুদ্ধের নিজের অসুরমোহন-লীলায় পর্য্যন্ত যখন কোন দোষ নাই, তখন ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য জগদ্‌গুরুর সম্বন্ধে কা কথা। মায়াবাদাচার্য্যের বা ভগবান্ বুদ্ধের দোষ না থাকিলেও সাত্বত-শাস্ত্র, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ **মায়াবাদাচার্য্যের ও বুদ্ধদেবের অসুরমোহন-লীলাই** সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং শ্রীমুখে তাঁহার শ্রীগুরুদেবের আদেশ আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

"তিনি (আমার গুরুদেব) আমাকে বহুবার বলিয়াছেন, লোককে ভোগা দিয়া আপনি হরিভজন করুন। আমাদের এরকম মহান্ গুরুদেবের পাদপদ্মের নিকট বসিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।"

—(শ্রীল প্রভুপাদের স্বমুখোক্তি—"এজ্ হিল", শিলং; ৩১শে আশ্বিন, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ।)

এই ভক্তিসিদ্ধান্তের সহিত সংযোগ না করিলে শ্রীল প্রভুপাদের কার্য্যাবলী ও আচার-প্রচার-কার্য্য অসামঞ্জস্যকর এবং একদেশদর্শী বলিয়া মনে হইবে, যাহা মনে করিয়া অনেক কৈতবগ্রস্ত অবৈধ যোষিৎসঙ্গী মোহগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

এইজন্যই বলিতেছিলাম,—শ্রীল প্রভুপাদের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা সকলই ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ। ভক্তিসিদ্ধান্তকে ছাড়িয়া তাঁহার নাম রূপ, গুণ পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা—কোনটিই বুঝা যাইবে না

——

বৈরাগ্য—যুক্ত ও ফল্গু

কোন একটি বিষয়ে মন অভিনিবিষ্ট হইলে তাহার বিপরীত বস্তুতে আপনা হইতেই একটা বিতৃষ্ণার ভাব উপস্থিত হয়। একই সময়ে দুইটি বিপরীত বস্তুতে চিত্ত নিবিষ্ট করা যায় না। সাধারণ জীবগণ জাগতিক ব্যাপারে রুচি বিশিষ্ট; এইজন্য তাহারা জড়বিপরীত অপ্রাকৃত বস্তুসম্বন্ধে উদাসীন থাকে। আবার যাঁহারা ভগবদুন্মুখ, তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণেতর বিষয় রুচিকর হয় না। ঐ সকল বস্তু তাঁহাদের স্বাভাবিক বিরাগের পাত্র হয়।

'বৈরাগ্য' বলিতে বিষয়সুখভোগে বিতৃষ্ণা বুঝায়। যাঁহাদের হৃদয়ে তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তাঁহারা জাগতিক সুখভোগ-সমূহ অমঙ্গলজনক জানিয়া উহা ত্যাগ করেন। আজ পর্য্যন্ত জীবের চরম-কল্যাণ-লাভের উপায়-স্বরূপে বহুবিধ মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রুতি যে পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সত্য ও সনাতন। অন্যান্য অশ্রৌত পন্থা-গুলির কতক শ্রুতির বিকৃত ব্যাখ্যামূলে এবং কতক শ্রুতির অপৌরুষেয়তা অস্বীকার পূর্ব্বক নাস্তিকতাকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত মত-গুলিতেই বৈরাগ্য বা ভোগত্যাগকে বহুমানন করা হইয়াছে। শ্রুতিসার শ্রীমদ্ভাগবত প্রপত্তিশীল ব্যক্তির প্রপত্তি-অনুসারে ভক্তি, পরেশানুভব ও বিরক্তি একসঙ্গেই হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে বলিয়া জানাইয়াছেন। কিন্তু অবৈদিক পন্থাসমূহে বৈরাগ্যকে

যে অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা হইতে ভাগবত উপদিষ্ট বৈরাগ্যের কিছু পার্থক্য আছে।

প্রকৃত অশ্রৌতপর পন্থাগুলির মধ্যে অনেকগুলিতেই, বিশেষ করিয়া যাহাতে কর্ম্ম, যোগ বা জ্ঞানের বহুমানন করা হইয়াছে, এইরূপ বিচার দেখা যায় যে, এই জগৎটা যদিও আমাদের ভোগ্যরূপেই সৃষ্ট এবং আমরা ইহার ভোক্তা, তথাপি নিরবচ্ছিন্ন ভোগ এখানে করা যায় না। জীবনের পথে চলিতে গেলে প্রতিপদেই বাধা আসিয়া গতি রোধ করে এবং তাহাতে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখই লাভ হয়। সুতরাং অপরিচ্ছিন্ন সুখ লাভ করিতে হইলে একটু কষ্ট স্বীকার অর্থাৎ ইহজগতের সুখভোগের ইচ্ছাটা আপাততঃ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। এইরূপ বিচার করিয়া তাঁহারা এই জগৎকে কাকবিষ্ঠাবৎ অসার মনে করিয়া উহা হইতে নির্ম্মুক্ত হইবার চেষ্টা করেন এবং যাহাতে সেইদিকে চিত্ত আকৃষ্ট হইতে না পারে, তজ্জন্য ইন্দ্রিয়নিগ্রহমূলক নানা অনুষ্ঠানের আবাহন করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীমদ্ভাগবত কিন্তু ঐরূপ ভোগত্যাগের চেষ্টাকে আদর করেন নাই। উহা প্রকৃতপক্ষে বৈরাগ্য নহে, অভিনয় মাত্র। ফল্গু নদীকে বহির্দ্দর্শনে জলশূন্য মনে হয়; কিন্তু ঈষৎ পরিমাণে বালুকা খনন করিলেই উহার নীচে জল দেখিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ অশ্রৌতপন্থিগণ বাহিরে ভোগত্যাগের অভিনয় করিলেও অন্তরে তাহাদের ভোক্তৃ অভিমান ও ভোগস্পৃহা পূর্ণ মাত্রাতেই থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে যুক্ত-বৈরাগ্যের কথা বলিয়াছেন, তাহাতে মায়াবাদীর ত্যাগবিচার স্থান পায় নাই।

অন্তরে ভোক্তৃ-অভিমান প্রবল রাখিয়া বাহিরে যে বৈরাগ্যের ছলনা করা যায়, তাহা লোকচক্ষে প্রশংসার বস্তু বা আত্মপ্রসাদ-লাভের উপায় হইতে পারে ; কিন্তু নিত্যমঙ্গল তাহাতে নাই। সম্বন্ধ জ্ঞান অর্থাৎ আপনার নিত্যস্বরূপ, নিত্যস্বভাব ও নিত্য-ক্রিয়ার সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত নিত্যমঙ্গল-লাভের যে চেষ্টা, তাহা অন্ধকারে "বস্তু হাত্ড়ান" মাত্র। পরবস্তুর সন্ধানতৃষ্ণা হৃদয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে জাগ্রত হইলেই মন আপনা হইতেই বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইতে থাকে, তাহার জন্য স্বতন্ত্র কোন চেষ্টার আবশ্যকতা নাই। বিষয়-ভোগ হইতে মন পরাঙ্মুখ হইলে বিষয়-ভোগে বা কৃষ্ণেতর বিষয়ে সহজ বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে জানিতে হইবে। বৈরাগ্য কখনও ভক্তির উপায় নহে। নশ্বর সুখভোগ হইতে নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগে উপনীত হইবার মাঝখানে ভোগের ক্ষণিক বিরতি মাত্রই নিত্য-স্থিরবৈরাগ্য নহে—উহা ফল্গু বৈরাগ্য। ভক্তি, ভগবৎ-সাক্ষাৎকার, বিরক্তি একত্র অবস্থিতি করে। সাধন ভক্তির বিচারে ভক্তিকে উপায় স্বরূপে জানিলেও উহাই পরিস্ফুট অবস্থায় একমাত্র উপেয়। ভক্তি—আত্মার নির্ম্মল সহজ ধর্ম্ম। যে পরিমাণে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তির উন্মেষ হয়, সেই পরিমাণে কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরাগ লক্ষিত হয়। কৃত্রিম চেষ্টাদ্বারা তাহা লাভ করা যায় না।

বৈধভক্তিমার্গের অনুসরণকারী ক্রমোন্নতির মধ্য দিয়া অগ্র-সর হন। চিত্তের মলিনতা যে পরিমাণে দূর হয়, সেই পরিমাণে যুক্তবৈরাগ্যের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ ও নির্ম্মল পরিস্ফূটভাব তাহার

মধ্যে দৃষ্ট হয়। কনিষ্ঠ অধিকারী সদ্‌গুরুর চরণ আশ্রয় করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইতেছেন মাত্র। ভক্তিসিদ্ধান্ত বিষয়ে অনভিজ্ঞ হওয়ায় তিনি ভগবান্ অপেক্ষাও ভক্তের পূজার শ্রেষ্ঠত্ব সম্যক্ অবগত নহেন বলিয়া ভক্তপূজায় ঔদাসীন্য প্রদর্শন পূর্ব্বক অর্চ্চনাদি-তেই অধিক আদর বিশিষ্ট হন। কিন্তু তত্ত্ববস্তুর স্বরূপোপলব্ধি না হওয়ায় শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহের অপ্রাকৃতত্ত্বও তাঁহার অনুভূতির বিষয় হন না। পঞ্চোপাসক ও শুদ্ধভক্তিপথের কনিষ্ঠাধিকারীর মধ্যে পার্থক্য এই যে পঞ্চোপাসকগণ সাধনকালে চিত্তশুদ্ধির উপায়রূপে শ্রীবিগ্রহকে কাষ্ঠ, প্রস্তর বা মাটীর বিকার বলিয়া জানিয়াও তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতীকরূপে কল্পনা করেন, পরে সিদ্ধিকালে স্বয়ং ব্রহ্ম বলিয়া অভিমান হয়। কিন্তু কনিষ্ঠাধিকারী ভক্ত শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হইতে অর্চ্চাবতার-তত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়া শ্রীবিগ্রহকে জড়বস্তু মনে না করিলেও শ্রদ্ধা দৃঢ় না হওয়ায় তাঁহাতে সর্ব্বদ্রষ্টা সাক্ষাদ্ ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্ফূর্ত্তিও তাঁহার হয় না। এই কনিষ্ঠ ভক্তের মধ্যে যে বৈরাগ্যের লক্ষণ দেখা যায়, তাহা প্রকৃত বৈরাগ্যের অস্ফূটাবস্থা মাত্র। অনর্থযুক্ত ভোক্তৃবিচার হইতে তখনও তিনি নিষ্কৃতি পান নাই। যুক্তবৈরাগ্যকে ভক্তি যাজনের পক্ষে অনুকূল জানিয়া তিনি উহার পালনে যত্নপর হন বটে, কিন্তু যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গু বৈরাগ্যের পার্থক্য ঠিকমত বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। নিখিল বস্তুকে কৃষ্ণসেবোপকরণ জানিয়া কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যে শরীর ধারণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অনাসক্তভাবে স্বীকার করাই যুক্তবৈরাগ্যের লক্ষণ। কিন্তু কনিষ্ঠাধিকারী প্রাকৃত-ধারণা-বিমুক্ত

না হওয়ায় জাগতিক বস্তুসমূহ কৃষ্ণেরই ভোগ্য—এই বিচার ঠিক যথাযথ গ্রহণ করিতে পারেন না। সেইজন্য জাগতিক বিষয়সমূহও ভোগ্যরূপে প্রতিভাত হইয়া তাঁহাকে ক্রমাগত বাধা দিতে থাকে। এই শরীরও কৃষ্ণসেবার জন্যই। সুতরাং ইহার প্রতি অত্যন্ত অবহেলা প্রদর্শনও যুক্তবৈরাগ্যের বিচার নহে। কিন্তু মুমুক্ষুর অনুকরণে অনেক সময় কনিষ্ঠাধিকারী সেবাপরাধ ফলে ইহা না বুঝিয়া ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণকেও ভোগ বলিয়া বিবেচনা করিয়া নানা কৃচ্ছতা অবলম্বন করেন। ভোক্তৃ-অভিমান এইরূপ প্রবল থাকায় তাঁহার বৈরাগ্য ভোগ বা শুষ্কত্যাগে পর্য্যবসিত হইবার প্রবল আশঙ্কা থাকে। দৃঢ়তার সহিত শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মের সেবা করিতে থাকিলে এই সকল অসুবিধা দূর হয়।

মধ্যম অধিকারী শ্রীগুরুকৃপাবলে যুক্তবৈরাগ্যের বিচারে প্রতিষ্ঠিত হন। সম্বন্ধজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হওয়ায় তিনি বুঝিতে পারেন যে, জীব স্বরূপে আদৌ ভোক্তা নহেন, সুতরাং ভোগ বা ত্যাগের অধিকারও তাঁহার নাই। এ জগতের যাহা কিছু পদার্থ, সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের সেবার উপকরণ, তাহাতে জড় বা ভোগবুদ্ধি করা অপরাধ। কৃষ্ণসেবোপকরণ সমূহকে হেয়, দুঃখপ্রদ জ্ঞানে পরিত্যাগ করার চেষ্টা বিকৃত বুদ্ধি হইতে প্রসূত। যাহা কৃষ্ণেতর বিষয় বা পরিমেয়, তাহাই কৃষ্ণসেবায় বাধা জন্মায় অর্থাৎ দেহে আত্মবুদ্ধিও নিজের ভোক্তৃ-অভিমান—ইহাই ত্যাগ করিতে হইবে,—কৃষ্ণসেবার উপকরণগুলিকে প্রাপঞ্চিকজ্ঞানে ত্যাগ করিতে হইবে না। এইরূপ আত্মসম্বন্ধজ্ঞান হৃদয়ে উদিত হওয়ায় জাগতিক বস্তুসমূহ

ভোগ্যরূপে প্রতিভাত হইয়া বাধা জন্মাইবার পরিবর্ত্তে সেবার সহায়ক হইয়া reciprocate respond ও co-operate করিতে থাকে। মধ্যম অধিকারী জড় ভোগত্যাগকেই কনিষ্ঠাধিকারীর ন্যায় কতকটা ইন্দ্রিয়নিগ্রহমূলক না জানিয়া কৃষ্ণপ্রীতির উৎপাদক বলিয়া উহাকে আদরের সহিত বরণ করেন। এই হরিগুরুবৈষ্ণব-প্রীণন-চেষ্টাই মধ্যম-অধিকারীর বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করে। বৈরাগ্য তাঁহার পক্ষে শুষ্ক ত্যাগ নহে। আপনাকে অপ্রাকৃত কৃষ্ণদাস জানিয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের তোষণার্থ তাঁহার যে ভোগত্যাগ স্বীকার, তাহাতে গুরুবৈষ্ণবের প্রতি মৈত্রী ভাবই থাকে।

"মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি তুষ্ট হন গৌর ভগবান্।।"

—এই বাণীর অনুসরণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের অর্থাৎ আশ্রয় বিগ্রহের আনুগত্যে মধ্যম অধিকারী যুক্ত-বৈরাগ্য বরণ করেন ; কারণ তাহাতে শ্রীগৌর-ভগবান্ তুষ্ট হন। কনিষ্ঠাধিকারীর বৈরাগ্যে ভগবানের প্রতি এই প্রেম, ভাগবতের প্রতি এই মৈত্রী নাই, উহা অনেকটা আরোপিত মাত্র।

কনিষ্ঠাধিকারীর যেরূপ ভোগ বা ত্যাগপথে চলিয়া যাইবার আশঙ্কা আছে. অনুকূলবিচার গ্রহণ করিবার ফলে মধ্যমাধিকারীর সেইরূপ কোন আশঙ্কা কম। ন্যূনাধিক সম্বন্ধজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকায় তিনি আপনার ও জগতের স্বরূপ ন্যূনাধিক অবগত আছেন। তজ্জন্য কখনও কখনও দুঃসঙ্গক্রমে তাঁহার সেবাপ্রবৃত্তি কিছুকালের জন্য স্তব্ধভাব ধারণ করিলেও শ্রীগুরুদেবের বিচারধারা

হইতে তিনি একেবারে ভ্রষ্ট কখনও হন না। মহাজন-কথিত "যথা-যোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ" এই বাণী মধ্যম ভাগবতের জীবনের গতিকে নিয়মন করেন।

কনিষ্ঠ ও মধ্যম অধিকারীর বৈরাগ্য ন্যূনাধিক নিষেধ-বাচক। কনিষ্ঠে ঐ বৈরাগ্য অস্ফুট ও অস্থায়ী, মধ্যমে স্ফুট ও কতকটা হরিতোষণানুকূল বলিয়া স্থায়ী, কিন্তু উত্তম অধিকারীতে উহা স্ফুটতম, পূর্ণতম স্থায়ীভাবে বিরাজমান। উপরন্তু উত্তম অধিকারী বা মহাভাগবতের বিচার বৈরাগ্য কেবলমাত্র নিষেধবাচক-রূপে প্রকাশিত না হইয়া অপর একটি চমৎকারিতাপূর্ণ ভাবের সূচনা করে। বিরাগ-শব্দে কেবল আসক্তিহীনতা নহে, মুখ্যতঃ উহা বিশিষ্টরূপে রাগ বা কৃষ্ণে গাঢ় অনুরক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। মহাভাগবত—

"স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥"

সুতরাং কৃষ্ণেতর বিষয়ে তাঁহার অভিনিবেশ কখনই হয় না বলিয়া কৃষ্ণেতর বিষয়ের প্রতীতি ও উহাকে পরিত্যাগ করিবার স্বতন্ত্র চেষ্টার অবকাশও তাঁহাতে নাই। কৃষ্ণেতর বিষয়ে তাঁহার বিরাগ স্বাভাবিক। মহাভাগবতের আচরণে আপাতবৈষম্য বহু অজ্ঞব্যক্তির চিত্তে নানাপ্রকার সন্দেহের উদয় করায়। অনেক সময় আধ্যক্ষিকদর্শনে তাঁহার বিলাস-দর্শনে অনেকে বঞ্চিত হন। বৈষ্ণব কেন বিলাসী হইবেন বা ভোগসুখে নিমগ্ন থাকিবেন?—ইত্যাদি প্রশ্ন অনেকেই আধ্যক্ষিকদর্শনে করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্য-

চরিতামৃতকার এই সকল প্রশ্নের সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন। যাহারা শুদ্ধভক্তিমার্গ আশ্রয় করিয়া ক্রমশঃ ব্রজের পথে অগ্রসর হইতেছেন, তাহাদের অনর্থ নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র সুখ-ভোগের ইচ্ছা ও ভোক্তৃ-অভিমান তাহাদের প্রগতিতে বাধা দিতে পারে ; সেই জন্য জাগতিক ভোগবিলাস হইতে দূরে থাকাই তাহা-দের পক্ষে শ্রেয়ঃ। কিন্তু যাঁহারা শ্রীআশ্রয়বিগ্রহের নিত্য অনুগ-তাভিমানী, নিত্য অন্তরঙ্গ সেবক, তাঁহাদের প্রতি সেইরূপ বিচার প্রযোজ্য নহে। "দেহস্মৃতি নাহি যাঁর, সংসারকূপ কাঁহা তাঁর।" অনাত্ম প্রতীতিতে অবস্থিত ব্যক্তির ন্যায় তাঁহাদের জড়াহঙ্কার নাই বা কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্রভাবে আপন সুখবাঞ্ছাও নাই। কৃষ্ণ-সুখবর্দ্ধনই তাঁহাদের একমাত্র কৃত্য। সুতরাং ভোগবিলাসের যে কুফল, তাহা তাঁহাদের নিকট হইতে লক্ষ যোজন দূরে ও নিম্নে অব-স্থিত। তাই তাঁহাদের বিলাস জড়ভোগীর বিলাস-সাম্যে দর্শন করিলেও মহা-অপরাধের আবাহন করা হইবে। জড়ভোগী আপ-নার ইন্দ্রিয়তোষণ-তৎপর ; অপ্রাকৃত ভক্তগণ কৃষ্ণসুখান্বেষণে নির-ন্তর যত্নশীল। তাহাদের যাবতীয় চেষ্টাই কৃষ্ণের অসীম সুখ উৎপা-দন করে। তাঁহাদের আচরণ, বেশ, ভূষা, বিলাস, সমস্তই কৃষ্ণপ্রীতি-তাৎপর্য্যময় এবং যখন তাঁহারা উপলব্ধি করেন—কৃষ্ণ তাঁহাদের যাবতীয় চেষ্টায় সুখলাভ করিতেছেন, তখন কৃষ্ণের সুখে তাঁহা-দেরও সুখ হয়। সেই জন্যই যে দেহ কৃষ্ণের সেবার উপকরণ, তাহার অনাদর না করিয়া প্রীতির সহিত তাহার পোষণ করেন।

এখানে এরূপ একটি সন্দেহ আসিতে পারে—উপরি উক্ত বিচার

সম্ভোগলীলা কালেই প্রযোজ্য হইতে পারে। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবকগণ সকলেই বিপ্রলম্ভরসের সেবক, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরায়-রামানন্দের ন্যায় কাহারও কাহারও সৌখীনতা লক্ষিত হয় কেন? শ্রীরূপ-রঘুনাথই বা এত কঠোরতা অবলম্বন করিলেন কেন?

উত্তরে প্রথমেই বলিতে হয়,—শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবকগণের মধ্যে শ্রীরায় রামানন্দ প্রভৃতি ভোগবিলাসে রত ছিলেন এবং শ্রীগোস্বামিবর্গ এ বিষয়ে খুব কঠোরতা দেখাইয়াছেন—এইরূপ বিচার রায় রামানন্দ ও গোস্বামিবর্গ, উভয়ের চরণেই অপরাধ-জ্ঞাপক। অপ্রাকৃত রসরসিক শ্রীরায় রামানন্দকে প্রাকৃত ভোগি-কুলের ন্যায় বিলাস-ব্যসনে আসক্ত মনে করা যেরূপ অপরাধ নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যশিরোমণি গোস্বামিগণকে সাধক জীবের ন্যায় জড়ভোগত্যাগে যত্নশীল শুষ্ক বৈরাগ্যপরায়ণ মনে করাও তদ্রূপ অপরাধ। কেবলমাত্র বাহ্য কঠোরতাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের বৈরাগ্যের মানদণ্ড নহে। শ্রীরূপরঘুনাথ ও শ্রীরায় রামানন্দ প্রভৃতি সকলেই যুক্তবৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ ও অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভরসসেবার পরিপোষ্টা। তাঁহাদের বাহ্য আচরণে আধ্য-ক্ষিকদর্শনে যে বৈষম্য দেখা যায়, বস্তুতঃ তাহা একই তাৎপর্য্যময়। একটি জড়ীয় উদাহরণ অতি ভয়ে ভয়ে দেওয়া যাইতেছে, সারগ্রাহী পাঠক উহার তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়া লইবেন—ইহাই প্রার্থনা।

সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্যই প্রসাধন সামগ্রী ও অলঙ্কারাদি ধারণ করেন। প্রিয়তম পতি যখন অন্যত্র গমন করেন বা কার্য্যোপরোধে তাঁহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়,

তখন পতিগতপ্রাণা স্ত্রী পতির বিরহদুঃখে কাতর হইয়া ভূষণাদি গ্রহণ করেন না, এমন কি ঐগুলি দেখিলেও তাহার দুঃখ বর্দ্ধিত হয়। আবার অন্য সময়ে কখনও কখনও এরূপও দেখা যায়—পতিবিয়োগবিধুরা পত্নী ঐ সকল বসন-ভূষণাদি স্বামীর প্রীতির উদ্দীপকজ্ঞানে যথাযথভাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এখানে বাহ্যদর্শনে দুইটি দৃষ্টান্তে ভেদ প্রতীতি হইলেও বস্তুতঃ এই ত্যাগ ও গ্রহণ একই তাৎপর্য্যপর। দুইটিই স্বামীর প্রতি সাধ্বী স্ত্রীর প্রগাঢ় প্রীতিরই পরিচায়ক। মহাভাগবতগণের আচরণও সেই-রূপ প্রাকৃতদর্শনে বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইলেও বস্তুতঃ উহা একই উদ্দেশ্যে বিহিত; বাহ্য আধ্যক্ষিক বিচারে ভেদ থাকিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে কোন পার্থক্য নাই।

—০—

দেহারামতা

সাধারণতঃ ও প্রধানতঃ লোকে 'কামে'র যে সংকীর্ণ অর্থ করিয়া থাকে, তাহাতে স্ত্রী ও পুরুষাভিমানীর ভোগ্য-ভোক্তৃ-সম্বন্ধগত সম্ভোগ-প্রবৃত্তি উদ্দিষ্ট হয়; কিন্তু 'কামে'র রাজত্ব আরও অনেক ব্যাপক। সেই ব্যাপক অর্থে কৃষ্ণেতর কামনা বা অন্যাভিলাষকেই 'কাম' বলা যায়। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কামনা বদ্ধজীবমাত্রের নৈসর্গিক ধর্ম্ম। এই নিসর্গ বহুরূপে তাহার বিক্রম প্রকাশ করিয়া

থাকে। দেহারামতা সেই কামেরই প্রকারভেদ। কৃষ্ণসেবা বিস্মৃত হইয়া আমরা বিভিন্ন যোনি-ভ্রমণ-কালে দেহারামী কামী হইয়া পড়িয়াছি। মাতৃগর্ভে থাকা-কালেও অজ্ঞানাবস্থায় দেহের আরাম অনুসন্ধান করি, ভূমিষ্ঠ হইবা-মাত্র সর্ব্বক্ষণ দেহের আরামেরই অন্বেষণ করিয়া থাকি। বাল্যে কৈশোরে, যৌবনে, প্রৌঢ়-কালে ও বৃদ্ধকালে, সুস্থ ও অসুস্থাবস্থায়, জাগরণে ও নিদ্রায়, অজ্ঞানাবস্থায় ও স্বপ্নাবস্থায় সকল সময়ই দেহের আরাম খুঁজিয়া বেড়াই। এই দেহারামতার জন্যই গৃহারামতার আবশ্যক হয়। জাড্য, আলস্য, ঔদাসীন্য, নির্জ্জনপ্রিয়তা, স্বজন বা জনপ্রিয়তা, বদ্ধজীবের সকল ধর্ম্মই দেহারামতারূপ কাম হইতে প্রসারিত হয়। দেহারামতা হইতে মনের নানাপ্রকার খেয়ালেরও উৎপত্তি হয়। 'এই জিনিষটি আমার ভাল লাগে, ইহা ভাল লাগে না, এই স্থান ভাল লাগে, সেই স্থান ভাল লাগে না',—এইরূপ লক্ষ লক্ষ 'ভাল-লাগালাগি', 'ভাল-না-লাগালাগি' দেহারামপ্রিয়তারূপ কাম হইতে উদ্ভূত হয়। দেহারামতা এইরূপ জাড্য আনিয়া দেয় যে, কিছুতেই তাহা একঘেয়ে জীবনের গতিকে, গৃহারামতাকে ভাঙ্গিতে দেয় না। গুরুবৈষ্ণবগণের মঙ্গলময় উপদেশ তিক্ত বোধ হয়, তাঁহাদিগকে বন্ধুর পরিবর্ত্তে 'শত্রু' মনে হয়; তাঁহাদের বিচারকে ভ্রান্তিপূর্ণ বলিয়া কল্পিত হয়।

দেহারামতা চেতন-রাজ্যের উপদেশ-সমূহকে কিছুতেই কর্ণে প্রবেশ করিতে দেয় না, ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করে। দেহারামতা জীবকে চেতনা-বিজলি-সঞ্চারের বা শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বর্গের শক্তি-সঞ্চারের পক্ষে নিজের দেহকে একটী non-conductor

প্রস্তরের মত stumbling block করিয়া রাখে। কিছুতেই গুরু-বৈষ্ণবের শক্তি-সঞ্চার বরণ করিব না, কিছুতেই আমায় তাঁহা-দিগকে আত্মসাৎ করিতে দিব না,—এইরূপ এক ভীষণ জড়তা, দেহারামপ্রিয়তারূপ কাম বদ্ধজীবের হৃদয়ে আনিয়া দেয়। যে গুরু-বৈষ্ণবের বাণী পালন করিলে মুহূর্ত্ত অপেক্ষাও অনেক অল্প সময়ের মধ্যে অনর্থনির্ম্মুক্ত হইয়া সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণপ্রীতি লাভ হইতে পারে, সেইরূপ পরমপ্রয়োজন-প্রাপ্তিকেও দেহারা-মতার জাড্য নির্ব্বাসিত করিতে কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হয় না।

গৃহব্রতধর্ম্মের মূল কারণই—'দেহারামপ্রিয়তা'। দেহের আরামের জন্যই আমরা গৃহ রচনা করিয়া থাকি, দেহের আরামের জন্যই আমরা মাতা, পিতা, স্ত্রী-পুত্রাদির আশ্রয় অনুসন্ধান করি; দেহের আরামের জন্যই আমরা 'আমি না দেখিলে তাহাদিগকে কে দেখিবে?.' 'আমি না করিলে কে রক্ষা করিবে?',—এইরূপ শত-শত কল্পনা করিয়া থাকি। দেহারামতার জন্যই আমরা 'রক্ষিষ্য-তীতি বিশ্বাসঃ' কৃষ্ণই রক্ষা করিবেন—এই বিশ্বাস করিতে পারি না; কৃষ্ণকে পালনকর্ত্তা বলিয়া বরণ করিতে পারি না; দেহারাম-তার জন্যই অনুকূল বিষয়ে সঙ্কল্প করিতে পারি না, প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জন করিতে পারি না। অনুকূল বিষয়ে সঙ্কল্প করিলে পাছে দেহারামতার বিঘ্ন উপস্থিত হয়, 'গৌরাঙ্গবিরোধীজনের মুখ না হেরিব'; 'গৌরাঙ্গ-বিরোধী নিজ-জনে জানি পর'; 'ন মে পত্নী-কন্যা-তনয়-জননী-বন্ধু-নিচয়া, হরৌ ভক্তে ভক্তো ন খলু যদি তেষাং সুমমতা অভক্তানামন্নগ্রহণমপি দোষো বিষয়িণাং কথং

তেষাং সঙ্গাৎ হরিভজনসিদ্ধির্ভবতি মে'—প্রতিকূল-বর্জ্জনের জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই সকল বাণী দেহারামতা ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয়েই পালন করিতে পারি না। দেহারামতার জন্যই কপট হইয়া পড়ি, গুরু-বৈষ্ণবের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে চাহি, সমন্বয়বাদী হই ও নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়ি। দেহারামতার বৃদ্ধির জন্যই কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার ভিখারী হই।

কনকের কি প্রয়োজন ? তাহা আমার দেহকে রক্ষা করিবে—দেহের আরাম দান করিবে। কামিনীর কি প্রয়োজন ? তাহা আমার দেহের আরাম-প্রিয়তার প্রশ্রয় প্রদান করিবে। প্রতিষ্ঠারই বা কি প্রয়োজন ? তাহা আমার স্থূল ও সূক্ষ্ম-দেহের আরামের পরিপোষকতা করিবে। লোকে আমাকে প্রশংসা করিলে আমার মন প্রফুল্ল হয়, নিন্দা বা তিরস্কার করিলে মনে দুঃখ হয়। এই যে সূক্ষ্মদেহের আরামপ্রিয়তা—ইহাই প্রতিষ্ঠাশার জননী। দেহারামতা আমাকে সাধুসঙ্গে গুরুগৃহে থাকিতে দেয় না ; দেহারামতা আমাকে ঘড়ি ধরিয়া সাধুর কথা শুনিবার (?) বুদ্ধি প্রদান করে। শুনা যায়, পাশ্চাত্ত্যদেশে খুব বেশী হলে ৪৫ মিনিটের অধিক সময় কেহ ধর্ম্মের কথা শুনিতে পারে না ; তাহাও এক বক্তার মুখে নহে, যদি ভিন্ন ভিন্ন বক্তার মুখ হইতে চাট্‌নি পাওয়া যায়, তবে সেইরূপ ধর্ম্মোপদেশ (?) শ্রবণ করিবার ধৈর্য্য অবলম্বন করা যায়। এই-সকলই দেহারামপ্রিয়তার নিদর্শন। গুরুগৃহে বাস বা মঠবাস করিলে, কিংবা কোন দায়িত্বপূর্ণ সেবা-কার্য্য স্কন্ধে গ্রহণ করিলে দেহারামতারূপ কামের ব্যাঘাত

হয়। এইজন্যই আমরা সাধুসঙ্গে বাস ও দায়িত্বপূর্ণ সেবা গ্রহণ করিতে পারি না। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু এই প্রকার দেহারামী ও গৃহারামী গৃহব্রতগণ যখন তাহাদের অবসর ও সুযোগমত মঠের সেবা(?) বা হরিকথা শুনিবার (?) ব্যপদেশে মঠে বেড়াইতে আসিতেন, তখন তাহাদিগকে মঠের guest বা 'অতিথি' বলিয়া আখ্যা দিতেন অর্থাৎ ইহারা মঠের নিত্য-সেবক নহেন, মঠকে 'গৃহ' করেন নাই, শ্রীসঙ্কর্ষণাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কর্ষণ-কার্য্যের জোয়ালটী ঘাড়ে গ্রহণ করেন নাই, মঠ বা গুরুসেবার সহিত নিজের সত্তাকে ঐক্যতানে গ্রথিত করেন নাই; গৃহই ইহাদের নিত্য কেন্দ্র, মঠ একটি বেড়াইবার স্থান—আরাম-ভবন বা শান্তি-ভবন। ইহারা বাহিরের লোকের মত মঠে আসেন ও কিছু 'কর্ম্ম' না করিলে ভাল দেখায় না বলিয়া চক্ষু লজ্জায় কিছু 'কর্ম্ম' করিয়া যান, **সেবার জন্য সেবা** করেন না। 'আমাদের এতগুলি মঠ-মন্দির আছে, এতগুলি মার্ব্বেল-পাথর আছে, এতগুলি তীর্থস্থান ও স্বাস্থ্য-নিবাসে গৃহ-অট্টালিকা-মন্দিরাদি আছে',—এইরূপ গর্ব্ব করিবার জন্য ও প্রয়োজনানুসারে তাহা হইতে স্ব-স্ব সুখ-সুবিধা লাভ-পূজা আহরণ করিবার জন্য কেহ কেহ মঠের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখেন, মঠে বেড়াইতে আসেন, দুই চারিটি কার্য্য করিয়া দিয়া কিংবা মাসিক বা বাৎসরিক কিছু চাঁদা, বা এককালীন কিছু দান, কিংবা কিছু সময়ের জন্য কিছুটা কার্য্যতৎপরতা দেখাইয়া return-ticketএ গৃহলক্ষ্মীর অঞ্চলে নিত্য-আবদ্ধ চিত্ত ও দেহকে লইয়া পুনরায় স্ব-স্থানে (?) প্রত্যাবর্ত্তন

করেন। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু বলিতেন যে, এই সকল ব্যক্তি গুরুসেবার জন্য কখনও আত্মবলিদান করিবে না; কারণ তাহারা দেহারামতার নিকট নিজ-সত্তাকে বলিদান করিয়াছে। আমি শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর এই সকল কথা শুনিয়া চটিয়া যাই,— ইহাও আমার দেহারামতারই আর একটি লক্ষণ। সার্ব্বকালিক শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবক না হইতে পারিবার জন্য অন্য কোন কৈফিয়ৎ থাকিতে পারে না,—একমাত্র দেহারামপ্রিয়তা ছাড়া। আমরা অনেকেই অনেক সময় বিভিন্ন কৈফিয়ৎ দিয়া থাকি। কেহ কেহ বলি, যদি আমার কিছু অর্থের সংস্থান থাকিত, যদি আমি সরকারী পেন্সন্ পাইতাম, যদি আমার পত্নী বিয়োগ হইত, কিংবা যদি আমার পুত্রাদি না থাকিত, অথবা যদি আমার সংসার দেখিবার মত অন্য লোক থাকিত, আমার দেহটি সুস্থ থাকিত, যদি আমার যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকিত, তাহা হইলে আমি সার্ব্বকালিক গুরুসেবক হইতাম। এই সকল কৈফিয়তের মূলে দেহারামতা ছাড়া আর কিছুই নাই। এই কৈফিয়ৎগুলিকে যতই প্রত্যক্ষ সত্য মনে করি বা অপরকে বিশ্বাস করাইতে চাই, **ইহাদের মূলে আছে একমাত্র সত্য—দেহারামপ্রিয়তা;** আর বাদবাকী সকলই আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা। কোন কোন সময় বলিয়া থাকি ও চিন্তা করি,—যাহারা সার্ব্বকালিক সেবকের অভিনয় করিয়াছিল, যাহারা সর্ব্বস্ব-সমর্পণকারী সেবক বলিয়া গণিত হইয়াছিল, তাহারা কেহ এখন সার্ব্বকালিক হরি-গুরু বৈষ্ণববিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছে, কেহ বা গুরুসেবার দীক্ষা পরিত্যাগ করিয়া "পুনর্মূষিকো ভব"

মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সার্ব্বকালিক প্রাকৃত-সহজিয়া বা নাস্তিক পাষণ্ড হইয়া পড়িয়াছে। আমার এই সকল দর্শন, বিচার ও ভাবনার মূলেও আছে,—দেহারামপ্রিয়তা। আমি দেহের আরাম অনুসন্ধান করি বলিয়াই বিভীষিকা দেখিয়া ভয় করি, আমাকেও অনুত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে পাতিত করিতে চাহি! শ্রীল ভক্তি-সুধাকর প্রভু এইরূপ আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদর্শে দেখিয়াছি,—শ্রীল প্রভুপাদ যেখানে যত জাগতিক অসম্ভব, সেখানে আরও ততটা তথা-কথিত অসম্ভবের মাত্রা বাড়াইয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছেন, জীবের দেহারাম-তাকে ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীভাগবতধর্ম্ম-যাজনকালে পতনের ভয়ের বিভীষিকা দেখিয়া বৈকুণ্ঠের পথের যাত্রা স্থগিত করিবার কোন কারণ নাই। কর্ম্ম ও জ্ঞানের পথের যাত্রা যে-কোন মুহূর্ত্তে স্থগিত করিলে তদ্দ্বারা অসুবিধা না হইতে পারে; কিন্তু ভাগবতধর্ম্মপথের যাত্রা চক্ষু মেলিয়াই হউক্, আর, বুজিয়াই হউক্, একবার আরম্ভ করিয়া দিলে কোনদিনই তাহার বিনাশ নাই। অপরের পতনের ইতিহাস আমার দেহারামতাকে ভাঙ্গিয়া দিলেই মঙ্গল, আমার দেহারামতা ও গৃহারামতাকে বাড়াইয়া দিলে মঙ্গলকর নহে। অপরের পতন দেখিয়া আমরা সতর্ক হইব, যাহাতে গুরু-বৈষ্ণব বিদ্বেষী না হই, নির্ব্বিশেষবাদী পাষণ্ড না হই; কিন্তু **অপরের পতন দেখিয়া 'আমি দেহা-রামী, গৃহারামী হইব'—এইরূপ বিচার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আত্মহত্যাকারক।** সার্ব্বকালিক হরিসেবকাভিমানী ব্যক্তিগণ মঠবাসের অভিনয় করিয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণব বিদ্বেষী হইয়া

পড়িয়াছেন, সুতরাং তাহার প্রতিষেধকল্পে আমি সর্ব্বক্ষণ গৃহারামী হইব,—এইরূপ বিচার যুক্তি ও বাস্তবতা কোনটির দ্বারাই সমর্থিত হয় না। কেবল ইহা আমার গৃহারামপ্রিয়তার অত্যুৎকট পিপাসাকে সমর্থন করিবার প্রচ্ছন্ন চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ট্রেনে বা মোটরে চড়িলে যে-কোনও মুহূর্ত্তে সংঘর্ষ বা নানা বিপদ্ হইতে পারে, রাজপথ দিয়া চলিলে প্রায়ই মোটর-চাপা বা নানা-বিপদের মধ্যে পতিত হইবার দৃষ্টান্ত অনুক্ষণ দৃষ্ট হয়, এইরূপ শত শত উদাহরণ দেখিয়াও কি আমরা ট্রেণ বা মোটরে চড়িতে কিংবা অর্থাদি অর্জ্জনের জন্য নানা স্থানে চলা-ফেরা করিতে ক্ষান্ত হই? ক্ষান্ত না হইবার কারণ;—তাহাতে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিরূপ দেহারামতা আছে; কিন্তু হরিসেবাতে দেহারামতার কোন সুযোগ নাই বলিয়া আমরা অপরের পতনের ইতিহাস বা বিপদের বিভীষিকার নজির দেখাইয়া গৃহারামতাকেই সারাংসার করিবার জন্য উদ্যত হই।

অনেক সময় যে আমাদের মুখে গৃহারামতার নিন্দা শ্রুত হয়, তাহাও গৃহারামতার বিঘ্নসমূহের তাপে তপ্ত হৃদয়ের শ্মশান-বৈরাগ্যের ন্যায় মনোধর্ম্মবিশেষ। আমরা নির্ব্বিঘ্নে গৃহারামতা ভোগ করিতে পারিতেছি না,—এই আক্ষেপ করিয়াই গৃহারামতার নিন্দা করিয়া থাকি এবং ঐরূপ নিন্দা বা বৈরাগ্যের মধ্যে যে কপটতা আছে, তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ধরা পড়িয়া যায়, অর্থাৎ আমরা পরমুহূর্ত্তেই দেহারামতাকে নানা আকারে অনুসন্ধান করিয়া থাকি!

অনেক সময় অনেক কথাই বিচার-যুক্তির দ্বারা বুঝি এবং বিচারের কক্ষায় ও ভাষার আল্‌পনায়ই মাত্র ঐগুলিকে সাজাইয়া রাখিতে চাই ; সেখানেও গৃহারামতাই আমাকে আমার মঙ্গলকর বিষয়গুলিকে কার্য্যে অর্থাৎ আচরণে পরিণত করিতে দেয় না।

টেবিল-চাপ্‌ড়াইয়া দুই চারিটি কথা বলিয়া যাওয়া বা দুই দশ পাতা লিখিয়া যাওয়া, বিচার-যুক্তির দ্বারা মাত্র কোন বিষয় স্থাপন করা কিংবা লোক-সভায় বা সঙ্ঘে বৈষ্ণব-সাজা, অথচ কার্য্যে, নিজ-আচরণের মধ্যে তাহা প্রতিপালন না করা বা করিতে না পারা গৃহারামতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রাকৃত সহজিয়ামাত্রেই এইরূপ গৃহারামী। তাহারা লম্বা-চওড়া কথা বলে, ভাগবত-পাঠের (?) অভিনয় করিয়া লোক ভুলাইতে পারে, বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া লোকের করতালি কুড়াইতে পারে, কিন্তু গৃহারামতা ছাড়িতে বলিলেই আঁকুপাঁকু ভাব দেখাইয়া বলিয়া থাকে,—'আমার কি সেইরূপ ভাগ্য হইবে ?' অর্থাৎ অন্তরে দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছে—দেহারামতা ও গৃহারামতাকে কিছুতেই ছাড়িবে না। ঐরূপ উক্তি কেবল কোনরূপে বৈষ্ণবগণের কবল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য একটি 'বুলি' বা কৌশল-বিশেষ।

একথা সত্য যে, গায়ের জোরে কেহ দেহারামতা ও গৃহারামতা পরিত্যাগ করিতে পারে না, গায়ের জোরেও কেহ শরণাগত হইতে পারে না। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত অন্য উপায় কিছুই নাই। সেই কৃপা তাঁহাদের প্রতি নিষ্কপট সেবোন্মুখতার দ্বারাই লাভ হয়। 'কৃপা' 'কৃপা' শব্দ কেবল মুখে আবৃত্তি করিয়া কার্য্যতঃ

দেহারামী হইয়া বসিয়া থাকিবার সংকল্পও আর একপ্রকার প্রচ্ছন্ন দেহারামপ্রিয়তার প্রবৃত্তি বিশেষ। নিষ্কপটে হৃদয়ের সমগ্র দ্বার উন্মুক্ত করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে নিজের দুঃখের কথা জানাইতে হইবে। দেহারামতারূপ কাম বা বিষয় হইতে পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই উদ্ধার করিয়া শ্রীগৌর-কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করিতে পারেন। তিনি—বলদেব; তাঁহার বল না পাইলে অতি ক্ষুদ্র জীবের আর কোনই বল, ভরসা নাই, পঞ্চতত্ত্বের কৃপা প্রাপ্ত হইলে পঞ্চভূতের নির্ম্মিত দেহের আরাম-প্রিয়তা মুহূর্ত্তের মধ্যে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা হইলেই হ্লাদিনীর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইবার যোগ্যতা হয়। তখনই "কৃষ্ণসেবা কামার্পণে", বা কামঞ্চ দাস্যে নতু কামকাম্যয়া' এই বৃত্তিটি স্বাভাবিক হয়। কপটতা করিয়া, অনুকরণ করিয়া, কিংবা লোক দেখাইবার জন্য অভিনয় করিয়া, দেহারামতা পরি-ত্যাগ করিবার প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের চেষ্টা করিলে, অথবা জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে অন্তরে দেহারামী থাকিবার দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া হিমা-লয়ের ন্যায় নিথর ও স্থবির হইয়া বসিয়া থাকিলে কোনদিনই মঙ্গল হইবে না। অকপট আর্ত্তি হইতে উত্থিত অশ্রু ধারায় গৃহা-রামপ্রিয়তার পঙ্ককে বিধৌত করিয়া ফেলিতে হইবে। শ্রীনিত্যা-নন্দের কৃপায় একমুহূর্ত্তে ভজনের পথের এই প্রবল প্রতিবন্ধক বিদূরিত হইতে পারে।

—০—

ধ্যান ও সঙ্কীর্ত্তন

আমাদের অনেকেরই ধারণা যে 'ধ্যান', 'জপাদি'ই শ্রেষ্ঠ সাধন। অনেকে ভাবেন, হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে বৃথা সময়-ক্ষেপ হয় মাত্র, কারণ উহাতে কেবল করণীয় ব্যাপারের আলো-চনা ও কথাবার্ত্তা হয়, কিন্তু মন্ত্রজপ বা ধ্যানাদিতে প্রকৃত কৃত্য সাধিত হইয়া থাকে। তাহারা বলেন হরিকথা ঔপপত্তিক (theoretical) আর ধ্যানজপাদি আনুষ্ঠানিক (Practical)। অনেক সময় এমনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন স্থানে কোন মহাভাগবত বৈষ্ণব হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন বা শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ ব্যাখ্যা করিতেছেন, সেই স্থান হইতে কেহ কেহ উঠিয়া যান। তাঁহাদের 'হরিকথা' পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ঐসকল ব্যক্তি বিনয়ের ভাণে বলিয়া থাকেন, —"আমার কিছু কৃত্য আছে, কেবল কথায় ত' চিড়া ভিজে না, তাহাতে মন স্থির হয় না, কাজ কর্ত্তে হয়।" কেহ কেহ বলেন,— 'সন্ধ্যা সমাগত, আমার তর্পণ, মন্ত্রজপ প্রাণায়াম ও ধ্যানাদি কার্য্য আছে।" কেহ বলেন—'হরি', 'হরি', বলিলে কি হইবে? তাহাতে ত' আর চিত্ত স্থির হইবে না? প্রাণায়ামাদি, ধ্যান, ধারণা না করিলে চিত্ত স্থির হইবার নয়।" কেহ কেহ বা বলেন,—"সকল সময় ধ্যান করা যায় না, ধ্যান করিতে করিতে একটা বিরক্তি আসিয়া যায় তাই একঘেয়ে ভাব দূর করিবার জন্য অবকাশ সময়ে কীর্ত্তন, গান ও হরিকথা আলোচনাদি কিংবা তৎ পরিবর্ত্তে জাগতিক

অন্যান্য কথাও আলোচনা করা যাইতে পারে।” আবার কেহ কেহ বলেন,—“কীর্ত্তনাদি দ্বারা চিত্তবৃত্তি ছড়াইয়া পড়ে, নির্জ্জনে ধ্যান দ্বারাই ছড়ান চিত্তবৃত্তি প্রত্যাহৃত হয়। অতএব ধ্যানই শ্রেষ্ঠ।”

মনোধর্ম্মিসম্প্রদায়ের মধ্যে ‘ধ্যান’ ও ‘কীর্ত্তন’ সম্বন্ধে এইরূপ বিসদৃশ ধারণা বর্ত্তমান। তাহারা যাহাকে ‘ধ্যান’ নামে অভিহিত করে, তাহা ইন্দ্রিয়তর্পণ মাত্র। অর্থাৎ জগতের কর্ম্মকোলাহলের ভিতর মন যখন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে, তখন সেই পরিশ্রান্ত মনকে কর্ম্মকোলাহল হইতে সাময়িক বিরতি প্রদান করিবার যে চেষ্টা বা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছা, তাহাই মনোধর্ম্মিসম্প্রদায়ের ‘ধ্যান’। তন্মধ্যে আবার যাহারা আত্মেন্দ্রিয় তর্পণরূপ কৈতবকে আরও প্রচ্ছন্নভাবে চালনা করিতে করিতে উর্দ্ধ্ব সীমায় আরোহণ করাইতে চায়, তাহারা ‘ধ্যান’ ‘ধ্যেয়’ ও ‘ধ্যাতার’ অস্তিত্বের সর্ব্বতোভাবে বিনাশই ধ্যানের চরম ফল বলিয়া বিচার করে। যে স্থানে ‘ধ্যাতা’, ও ‘ধ্যেয়ের’ নিত্যত্ব নাই, সেই স্থানে ধ্যানটীও একটী অনিত্য উপায় বিশেষ। উহা নিত্য উপেয় নহে। ঐ ধ্যানের ফল ‘ধ্যান’ নহে, পরন্তু ধ্যানের ফল সর্ব্বতোভাবে ধ্যানের বিনাশসাধন বা চেতনতার স্তব্ধীকরণ, চেতনতাকে বিনাশ বা চেতনতার বৃত্তির স্তব্ধতা সম্পাদনই যদি ধ্যানের ফল হয়, তাহা হইলে ঐরূপ সাময়িক নশ্বর ধ্যানদ্বারা কি লাভ হইল? ইষ্টক প্রস্তরাদির ন্যায় অচেতন অবস্থা বা চেতনবৃত্তির স্তব্ধ ও নিরপেক্ষ ভাব কখনও সাধ্য হইতে পারে না। উহা আত্মবিনাশের চেষ্টা মাত্র।

ইন্দ্রিয়বর্গের অধিপতি মন, পরম চঞ্চল এবং শত শত অনর্থ

উৎপাদনক্ষম। প্রগ্রহবিহীন প্রমত্ত অশ্ব যেরূপ, মনের গতিও তদ্রূপ। বাহ্য প্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গযোগ কখনও ঐরূপ বলবান্ মনকে বশীভূত করিতে পারে না। গঙ্গোত্রীর প্রবল স্রোতকে বালির বাঁধ যেরূপ ক্ষণিকের জন্য রোধ করিবার মত একটা প্রতীতি মাত্র প্রদর্শন করে, প্রকৃত পক্ষে প্রবল স্রোত ঐ দুর্ব্বল বাঁধকে চুর্‌মার্‌ করিয়া কোথায় লইয়া যায় তাহা ঠিক থাকে না, তদ্রূপ ধ্যান-ধারণাদি দ্বারাও চিত্তের পরিশ্রান্তি-ভাবের ক্ষণিক লাঘব ঘটিলেও তন্মুহূর্ত্তেই চঞ্চলস্বভাব মন ধ্যানীকে নানাপ্রকার বিষয়সাগরে মগ্ন করায়। ধ্যেয়বস্তুর স্থিরতা রাখিতে না দিয়া, ধ্যান প্রতিমুহূর্ত্তে নূতন নূতন ধ্যেয় বস্তু গ্রহণ করে ও পুরাতন ধ্যেয় বস্তুকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেয়। ধ্যানই নিজের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে না পারিয়া বিষয়ের ধ্যানকেই তখন 'ধ্যান' বলিয়া ধারণা করে। বঞ্চক মন ধ্যানীকে জানিতে দেয় না যে ধ্যানী তাহার পাল্লায় পড়িয়া কোথায় চলিয়া আসিয়াছে। 'ধ্যানী' মনকে বশীভূত করিতে গিয়া মনের প্রভু সাজিতে গিয়া মনের বশ্য বা 'দাস' হইয়া পড়ে। প্রাকৃত নায়ক যে প্রকার তাহার প্রিয়তমা নায়িকাকে তাহার অত্যন্ত অনুগত বলিয়া মনে করিলেও প্রকৃত পক্ষে নায়িকারই ক্রীত গোলাম হইয়া পড়ে, তদ্রূপ ধ্যানীও 'মনকে বশীভূত করিয়াছে' মনে করিলেও প্রকৃত-প্রস্তাবে মনেরই গোলাম হইয়া যায়। বিষয়ের 'ধ্যানকেই তিনি 'ধ্যান' এবং বিষয়গুলিই তাহার 'ধ্যেয়' এইরূপ আত্মবঞ্চনামূলা প্রতীতি আসিয়া উপস্থিত হয়। কখনও বা ত্রিপুটী বিনাশ বা আত্মবিনা-

শকেই শ্লাঘ্য বস্তু বলিয়া আত্ম প্রতারিত হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"যুঞ্জানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্॥"

(ভাঃ ১০।৫১।৬০)

অর্থাৎ অভক্তগণ প্রাণায়ামাদি দ্বারা চিত্ত নিরোধ করিয়া থাকেন; কিন্তু হে রাজন্ তদ্দ্বারা তাহাদের চিত্ত বিষয়মল শূন্য হয় না বলিয়া তাহা আবার বিষয়াভিমুখী হইয়া পড়ে।

"যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দ-সেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥"

(ভাঃ ১।৬। ৩৬)

অর্থাৎ মুকুন্দ-সেবাদ্বারা, সদা কাম-লোভাদি-রিপু বশীভূত অশান্ত মন যেমন সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগ-মার্গ অবলম্বন দ্বারা, তাহা তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না।

"প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জতো যোগিনো মনঃ।
বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনো নিগ্রহকর্শিতাঃ॥"

(ভাঃ ১১।২৯।২)

অর্থাৎ হে পুণ্ডরীকাক্ষ, প্রায়ই দেখা যায় যে, যে সকল যোগী যোগমার্গে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা মনো-নিগ্রহ বিষয়ে ব্যাকুল হইয়া ক্লেশ পাইয়া থাকেন; কারণ তদ্দ্বারা তাঁহাদের মনো-নিগৃহীত হয় না।

ধ্যানধারণাদি আরোহবাদের চেষ্টা পরমার্থ দুর্লভ মনুষ্য

জীবনের অতি মূল্যবান সময় নষ্ট হয় মাত্র। যাহারা দুষ্কৃতিবশে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে রুচিবিশিষ্ট নহে, তাহারাই ঐপ্রকার প্রাণায়ামাদি কার্য্যে সময় যাপন করিয়া থাকে—

"অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতা যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্।
ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষপণ-হেতবঃ॥"

(ভাঃ ১১।১৫।৩৩)

যাঁহারা উত্তম যোগ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিযোগে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ সকল চেষ্টাকে ভক্তিপথের বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া থাকেন। মদীয় ভক্তগণ আমাদ্বারাই সমস্ত সাধনের ফল প্রাপ্ত হন। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে ঐসকল সাধন চেষ্টা কাল-ক্ষেপণের হেতু মাত্র। আমার সেবা ছাড়িয়া তাঁহারা সেইরূপ বৃথা কাল ক্ষেপণ করেন না।

অন্যের কা কথা, বিবেকী, ঋষি, মুনি ও তপস্বিগণও যদি ভগবৎ শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রসঙ্গ-বিমুখ হন, তবে তাঁহাদেরও সংসার ক্লেশে পতিত হইতে হয়—

"অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানা মনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবা হতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব
যুষ্মৎ প্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি॥"

(ভাঃ ৩।৯।১০)

অর্থাৎ যদি বল, অবিবেকী ব্যক্তিগণের পক্ষে সংসার ক্লেশ সম্ভব হইতে পারে—বিবেকীগণ ত' মুক্ত তাঁহাদের ভক্তির আবশ্যক

কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—হে দেব, ঋষিগণও ভবদীয় শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ হইলে এই সংসারে গমনাগমন করিয়া থাকেন। দিবসে তাহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম ভগবদিতর বিষয়ে ব্যাপৃত হইয়া অত্যন্ত ক্লিষ্ট থাকে, রাত্রিকালেও তাহাদের বিষয়-সুখের লেশমাত্রও থাকে না, যেহেতু তাহারা বাহ্যেন্দ্রিয় ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিদ্রাগত হন বটে, কিন্তু নানা অসদ্বিষয়ে ধাবিত মনোধর্ম্মরূপ স্বপ্নদর্শন দ্বারা তাহাদের ক্ষণে ক্ষণে নিদ্রা-ভঙ্গ হয়। তাহারা অর্থের জন্য উদ্যম করিতে পারে না। যেহেতু উহা ত' তাহাদের জন্য দৈব কর্ত্তৃক সকল স্থান হইতে প্রতিহত হইয়াছে। কিন্তু পিপ্পলায়নাদি বৈষ্ণবগণ যে কীর্ত্তন অপেক্ষা স্মরণকেই প্রেমের অধিকতর অন্তরঙ্গ সাধন বলিয়া বর্ণন করি-য়াছেন, তাহার রহস্য আছে। সেই স্থানে 'স্মরণ বা ধ্যান', ফলভোগকামীর মন্ত্রাদি জপ বা ফলত্যাগী ব্রহ্মসাযুজ্য ও ঈশ্বর-সাযুজ্যকামীর 'ধ্যান'কে লক্ষ্য করা হয় নাই। সর্ব্বতোভাবে প্রভুর স্ফূর্ত্তি বিশেষের পরিপাকই ধ্যান ; নিত্য আরাধ্য বাস্তব-স্বরূপ সচ্চিদানন্দঘন ভগবান্ অবস্থান করিতেছেন। আমি সেই ভগবানের "নিত্যদাস"—এইরূপ ভগবানের সহিত সম্বন্ধই স্মৃতি। এইরূপ ধ্যান-বশত; সঙ্কীর্ত্তন, স্পর্শন ও দর্শনাদি ইন্দ্রিয়-বৃত্তিবর্গ চিত্তবৃত্তিতে অন্তর্ভূত হইয়া যায়। সুতরাং এইরূপ ধ্যান হইতে সঙ্কীর্ত্তন মাধুরী-সুখ আরও পরিবর্দ্ধিত হয়। এইরূপ ধ্যান ও 'সঙ্কীর্ত্তন' উভয়ে উভয়েরই বর্দ্ধক এবং পরস্পর অভিন্ন। কিন্তু, নির্ভেদজ্ঞানী ও যোগীর ধ্যান, সঙ্কীর্ত্তনের বর্দ্ধক হওয়া

দূরে থাকুক্, বরং তৎপ্রতিকূল। যে ধ্যানে ধ্যাতা ও ধ্যেয়ের নিত্যত্ব নাই, সেইরূপ শুষ্কচিত্তের স্তব্ধভাব কখনও আদৃত হইতে পারে না। উহাতে ধ্যেয়বস্তু নিত্য প্রভুর নিত্যনাম-রূপ-গুণমাধুরী স্ফূর্ত্তি না করাইয়া তৎপরিবর্ত্তে জীবকে আত্মবিনাশের পথে লইয়া যায়। জীবন্মুক্তাভিমানী ঐরূপ ধ্যানী সম্প্রদায়ের চিত্ত কখনও স্থায়ী নির্ম্মলতা বা পরা শান্তি লাভ করিতে পারে না। তাই, শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি মানে। বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥" শ্রীমদ্ভাগবতেও আদি গুরু ব্রহ্মা "যেঽন্যেরবিন্দাক্ষ" শ্লোকে এইকথা ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥"
(১০।৯-১০)

অর্থাৎ— বুধগণ আমাতে চিত্ত ও প্রাণ সম্যগ্‌রূপে অর্পণ পূর্ব্বক পরস্পর ভাববিনিময় ও মৎসম্বন্ধিনী কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সেই শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা (সাধনাবস্থায়) ভক্তি সুখ ও (সাধ্যাবস্থায় অর্থাৎ লব্ধ প্রেমাবস্থায়) নিত্যকাল আমার সহিত রাগমার্গে ব্রজরসান্তর্গত মধুর রস পর্য্যন্ত সম্ভোগ পূর্ব্বক রমণ সুখ লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা এইরূপ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তিযোগ

দ্বারা সতত আমাতে যুক্ত হইয়া প্রীতি পূর্ব্বক আমার ভাবনা করেন আমি তাঁহাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকি; তাঁহারা তদ্দ্বারা আমার পরমানন্দধাম লাভ করেন।

শ্রবণ-কীর্ত্তন-রত ভক্তগণ ভক্তিকে নিজায়ত্ত বলিয়া গণনা করেন না; প্রভুর মহাপ্রসাদ বলিয়াই অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু, আরোহবাদী ধ্যানী অজিত ভগবানকে স্বীয় ক্ষুদ্র পুরুষাকার দ্বারা জয় করিবার বৃথা চেষ্টা দেখাইয়া ভগবচ্চরণে অপরাধী এবং স্থানচ্যুত হইয়া পড়েন। এই জন্য ব্রহ্মা শ্রীভগবানকে বলিয়াছেন,--"হে ভগবন্ যাঁহারা নশ্বর তাৎকালিক-লভ্য সঙ্কীর্ণতা মূলক বাহ্য জ্ঞান অথবা যাঁহারা নির্ভেদ ব্রহ্মচিন্তারূপ জ্ঞান চেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে দূরে পরিত্যাগ করিয়া সাধুমুখ-বিগলিত ভবদীয় বার্ত্তা শ্রবণ করেন এবং কায়মনোবাক্যে সাধুপথে থাকিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, ত্রিলোকমধ্যে আপনি অজিত হইলেও তাঁহাদের দ্বারাই জিত হন। অহমিকা-পরায়ণ ধ্যানি—সম্প্রদায় নিজ চেষ্টায় ভগবানকে দর্শন করিতে সমর্থ হন না। তুষরাশিতে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া তণ্ডুল পাইবার আশায় বৃথা ক্লেশ স্বীকার করেন মাত্র।

ধ্যান হইতে কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা আরও অন্যান্য কারণেও আমরা প্রত্যক্ষ করি। আত্মারাম মুনিগণেরও চিত্ত কীর্ত্তনে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। শুক-সনকাদির ন্যায় শ্রেষ্ঠ-যোগিগণ যাঁহাদের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে সংযত ও বিক্ষেপ বিহীন, যাঁহারা ধ্যানে পরিপক্কাবস্থা লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা বিধিনিষেধ হইতে নিবৃত্ত নৈগুণ্যে

স্থিত; তাঁহারাও হরিকীর্ত্তনের দ্বারা আকৃষ্টচিত্ত হইয়া কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি যাজন করিয়াছেন। অতএব ধ্যান হইতেও যে কীর্ত্তনের মাধুরী আরও অধিক এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

ধ্যানের দ্বারা ব্যক্ত-বাগ্-বেগের রোধ হইলেও অব্যক্ত বাগ্-বেগ অর্থাৎ মানসিক চাঞ্চল্য রুদ্ধ হয় না। কিন্তু কীর্ত্তনপ্রভাবে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ-রূপ ত্রিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যুগপৎ সাধিত হয় বলিয়া চিত্ত সহজেই ভগবৎপাদপদ্মে সংলগ্ন হইয়া থাকে।

"শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥
প্রবিষ্টকর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ॥"

(ভাঃ ২।৮।৪-৫)।

অর্থাৎ—যিনি শ্রীহরির সুমঙ্গলময়ী কথা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ভগবান্ অচিরকাল মধ্যেই সেই ভক্তের স্বপ্রযত্ন ব্যতীত স্বয়ং তাঁহার হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হন, ইহার দ্বারাই শ্রবণ কীর্ত্তনের অধীনই যে স্মরণ তাহা জ্ঞাপিত হইল। (শ্রীচক্রবর্ত্তী)। শ্রীহরি স্বীয় কৃত দাস্যসখ্যাদি ভাবরূপ কমলাসনে কথারূপে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বজীবের কাম-ক্রোধাদি মলিনতাকে সর্ব্বতোভাবে এবং কিছুমাত্র আপনার না রাখিয়া বিদূরিত করিয়া থাকেন। যদি কেহ বলেন, ধ্যানাদির দ্বারাও ত' কামক্রোধাদি মনোমল বিনষ্ট হইতে পারে, তবে হরিকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? তদুত্তরে বলিতেছেন,—যে প্রকার

কোনও কুম্ভস্থ জলকে দ্রব্যান্তর-মিশ্রণ দ্বারা শোধন করিলে তদ্দ্বারা ঐ কুম্ভস্থ জল মাত্রই শোধিত হইয়া থাকে ; কিন্তু অন্য পাত্রস্থ বা নদীতড়াগাদির জল শোধিত হয় না; আবার কুম্ভস্থ জলও সম্পূর্ণভাবে শোধিত হইয়াছে বলা যায় না ; কারণ মলরাশি সঞ্চিত হইয়া ঐ কুম্ভের তলদেশেই পড়িয়া থাকে ; জল কোনও প্রকারে ঈষৎ ক্ষোভিত হইলেই পুনরায় তলদেশস্থ মল জলে মিশ্রিত হয় ; তদ্রূপ ধ্যান যোগাদির দ্বারাও সকল জীবের হৃদয় মল শোধিত হইতে পারে না। কেহ কেহ শোধিত হইয়াছে মনে করিলেও কুম্ভস্থ জলের তলদেশস্থ মলের ন্যায় তাহারও কামক্রোধাদি-মল কিছু সময়ের জন্য উপশমিত প্রায় দেখাইয়া পর মুহূর্ত্তেই আবার নিজ স্বরূপ ধারণ করে।

ধ্যান, যজ্ঞ, ব্রত, তপস্যাদি কখনও নাম কীর্ত্তনের সহিত সমান নহে। শ্রীপদ্মপুরাণে দশবিধ-নামাপরাধ-বর্ণন প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি তপস্যাদির সহিত নামকীর্ত্তনকে সমান জ্ঞান করেন, তাহারা নামাপরাধী। যাঁহারা ধ্যানাদি সাধনকে হরিসঙ্কীর্ত্তনের অন্যতম সাধন বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন, তাঁহাদের বিচারেই ধ্যান সাধনোপায় মাত্র, উপেয় নহে। কিন্তু, হরিকীর্ত্তন উপায় ও উপেয়। 'হরিকথা' ও 'হরি' একই বস্তু ; উঁহাদের মধ্যে কোনও রূপ ব্যবধান নাই।

নির্জ্জনত্ব ও একাকিত্ব ব্যতীত কদাচ ধ্যান সিদ্ধ হয় না। কিন্তু, নির্জ্জনেই হউক্ অথবা বহুলোকের মধ্যেই হউক্ সঙ্কীর্ত্তন উভয়ত্রই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। কীর্ত্তন, বালক-যুবা-বৃদ্ধ-পণ্ডিত-মূর্খ, নির্ধন-

ধনবান, স্ত্রী-পুরুষ—সকলের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু, ধ্যান সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। কীর্ত্তন শুচি, অশুচি, স্নাত, অস্নাত যে কোন অবস্থায়, গৃহে, বনে যে কোন স্থানে সাধিত হইতে পারে। কিন্তু, ধ্যানাদি কার্য্য সেইরূপ নহে।

ধ্যান ধ্যেয়ের পরোক্ষেই যুক্তিযুক্ত হয়। কিন্তু, সাক্ষাতে তাহা যুক্তিযুক্ত হয় না। কিন্তু, কীর্ত্তন উভয় ক্ষেত্রেই যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে।

ধ্যান অধিকারী অনধিকারী বিচার অপেক্ষা করে, কিন্তু নাম-কীর্ত্তনে অধিকারী অনধিকারী অপেক্ষা নাই; কারণ তাহা সুখোপাস্য, অর্থাৎ জিহ্বাগ্রমাত্র দ্বারাই তাঁহার সেবা করিতে পারা যায়। নামকীর্ত্তন সেবোন্মুখ জিহ্বায় উচ্চারিত হইলে অব্যর্থরূপে পরম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমা প্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু, ধ্যান বহু ক্লেশ সহকারে সাধিত হইলে কোনও কোনও ব্যক্তির চিত্ত কিছু-কালের জন্য নিরোধ করিতে পারে মাত্র। ধ্যানের ফল—চিত্ত নিরোধ, তাহা কিছু চরম ফল নহে। কিন্তু, নামকীর্ত্তনের ফল কৃষ্ণ-প্রেমা জীবের পরম প্রয়োজন বা চরম ফল!

কেহ কেহ বা বলিতে পারেন সংকীর্ত্তনে লোক-লজ্জা শারীর-দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি বহু বহু বিঘ্ন ঘটিতে পারে কিন্তু ধ্যানে অর্থাৎ অন্তশ্চিন্তনে সেরূপ কোনও বিঘ্নাশঙ্কা নাই। তদুত্তর এই যে, বিচিত্রলীলা-কল্লোল-সমুদ্র শ্রীভগবানের স্ফুরিত বিচিত্র প্রসাদ হইতেই সেই বিচিত্র সংকীর্ত্তন মাধুরী স্ফুরিত হইয়া থাকে। নিজ পৌরুষ বলে উহা কখনও সাধিত হয় না। অতএব ভগবৎ-প্রসাদে কুশাগ্রও বিঘ্ন ঘটিতে পারে না। সেবোন্মুখ ব্যক্তির সং-

কীর্ত্তনের বিঘ্নরাজি অরুণোদয়প্রারম্ভেই নীহার-রাশির ন্যায় সম্পূর্ণ ভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়।

"বিচিত্র লীলা-রস-সাগরস্য
প্রভোর্বিচিত্র্যাৎ স্ফুরিতাৎ প্রসাদাৎ।
বিচিত্র-সংকীর্ত্তন-মাধুরী সা
নতু স্বয়ন্ত্বাদিতি সাধু-সিদ্ধয়েৎ॥"

(বৃঃ ভাঃ ২।৩।২৬৮)

এক নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারাই নববিধ-ভক্তি সাধিত হয়। সংকীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত ধ্যানও হইয়া থাকে। কলিযুগে লোকের চিত্তবৃত্তি সর্ব্বদাই বাহ্যবিষয়ে প্রধাবিত। সত্যে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম ছিল, লোকের চিত্ত সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকায় অধোক্ষজ বস্তুর ধ্যান অতি সহজেই হইত। কিন্তু একপাদমাত্র ধর্ম্মবিশিষ্ট কলিযুগে ধ্যান সম্ভবপর নহে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত (১২।৩।৫২) বলিতেছেন—

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥"

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—

"ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥"

সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ দ্বারা, এবং দ্বাপরে পরিচর্য্যা দ্বারা যাহা লাভ হইত, কলিতে একমাত্র হরিকীর্ত্তন দ্বারাই তাহা লব্ধ হয়।

"কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা"

আমরা শ্রীল সনাতন গোস্বামী-প্রভুর শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের একটী শ্লোক উদ্ধার করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি—

"জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
র্বিরমিত-নিজধর্ম্ম-ধ্যান-পূজাদিযত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে ॥"

শ্রীকৃষ্ণের আনন্দস্বরূপ শ্রীনাম জয়যুক্ত হউন্। শ্রীনাম সর্ব্বোৎকর্ষতার সহিত বিরাজ করুন্। শ্রীনামোচ্চারণ দ্বারা বর্ণাশ্রমাদি-ধর্ম্ম, ধ্যান ও পূজাদির জন্য যত্ন সর্ব্বতোভাবে নিরাকৃত হয়। কোনও প্রকারে নাম একবার উচ্চারিত হইলেও অর্থাৎ নামাভাস হইলেও প্রাণিগণের সম্বন্ধে তাহা মুক্তিপ্রদ হয়। শ্রীনাম—পরমামৃত স্বরূপ অর্থাৎ তাহা প্রেমপ্রদ, তাহা একমাত্র আমার জীবন ও ভূষণ।

—০—

'গোষ্ঠ্যানন্দী' ও 'বিবিক্তানন্দী'

বৈষ্ণব-সাহিত্যের এই দুইটি পরিভাষা অনেকেই শ্রবণ করিয়াছেন। 'গোষ্ঠী'-শব্দে বহুলোকের সমাগম স্থান, সভা, দল, গণ, পরিবার, পোষ্য, জাতি-প্রভৃতি অর্থ বুঝায়। যিনি গোষ্ঠী অর্থাৎ সজাতীয় স্নিগ্ধ সমবাসনাময় ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়া

ভগবৎ-সুখানুসন্ধান করেন, তিনি 'গোষ্ঠ্যানন্দী' নামে পরিচিত। গোষ্ঠী, সমষ্টি বা গণ সমচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট হইবেন। স্নিগ্ধতা ও সমবাসনত্ব গোষ্ঠীর অপরিহার্য্য গুণ। ঐ দুইটির অভাবে গোষ্ঠিত্ব সংরক্ষিত হইতে পারে না। দুইয়ের অধিক সংখ্যা বুঝাইতে শাস্ত্রে 'বহু'-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। সুতরাং যে-স্থানে সমজাতীয় দুইয়ের অধিক বা বহুকে লইয়া ভজনের প্রবৃত্তি, তথায়ই গোষ্ঠ্যা-নন্দিত্ব।

'বিবিক্ত' শব্দের অর্থ—নির্জ্জন, স্বতন্ত্র, পৃথক্, একক, অসম্পৃক্ত নিরপেক্ষ ইত্যাদি। বিবিক্তানন্দী সর্ব্বদাই একাকী, দ্বিতীয়-সঙ্গহীন। বিবিক্তানন্দিগণের মূল মহাজনের আচরণ এই—

"পরম বিরক্ত, মৌনী, সর্ব্বত্র উদাসীন।
গ্রাম্যবার্ত্তা-ভয়ে দ্বিতীয়-সঙ্গ-হীন॥"

(চৈ-চ ম ৪।১৭৯)

"অযাচিত-বৃত্তি পুরী—বিরক্ত, উদাস।
অযাচিত পাইলে খা'ন, নহে উপবাস॥"

(চৈ চ ম ৪।২৩)

"প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেলা পলাঞা।
কৃষ্ণ-প্রেমে প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গড়াঞা॥"

(ঐ ৪।১৪৭)

আর বিবিক্তানন্দী কি করেন?—

"শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে-
জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।

গীতানি নামানি তদর্থকানি
গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ ॥"
(ভা ১১।২।৩৯)

* * *

'নিঃসঙ্গো ব্যচরৎ ক্ষৌণীমনগ্নিরনিকেতনঃ ॥"
(ভা ৩।২৪।৪২)

শ্রীকর্দ্দমমুনি জনসঙ্গরহিত অনগ্নি অর্থাৎ আহারাদির চেষ্টাশূন্য ও অনিকেতন অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট-বাসস্থান-রহিত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর সুখোদ্দেশে পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছিলেন। বিবিক্তভজনানন্দি-গৌড়ীয়গণের মূল শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীশ্রীরঘুনাথ কিরূপ আচরণ প্রকট করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহাদের স্নিগ্ধ শিষ্যবর শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় আমরা এইরূপ শুনিতে পাই,—

"অনিকেত দুঁহে, বনে যত বৃক্ষগণ।
এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন॥
'বিপ্রগৃহে' স্থূলভিক্ষা, কাহাঁ মাধুকরী।
শুষ্ক রুটী-চানা চিবায় ভোগ পরিহরি'॥
করোঁয়া-মাত্র হাতে, কাঁথা ছিঁড়া, বহির্বাস।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, নর্ত্তন-উল্লাস॥
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন, চারিদণ্ড শয়নে।
নাম-সংকীর্ত্তনে সেহ নহে কোনদিনে॥
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন।

চৈতন্যকথা শুনে, করে চৈতন্য-চিন্তন ॥”

(চৈ চ ম ১৯।১২৭-১৩১)

“মহা-বিরক্ত সনাতন ভ্রমেন বনে বনে।
প্রতি বৃক্ষে, প্রতি কুঞ্জে রহে রাত্রি-দিনে ॥
মথুরামাহাত্ম্য-শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া।
লুপ্ততীর্থ প্রকট কৈলা বনেতে ভ্রমিয়া ॥’

(চৈ চ ম ২৫।২১৪-২১৫)

“অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা ?
রঘুনাথের নিয়ম, – যেন পাষাণের রেখা ॥
সাড়ে সাত প্রহর যায় কীর্ত্তন-স্মরণে।
আহার-নিদ্রা চারিদণ্ড সেহ নহে কোনদিনে ॥
বৈরাগ্যের কথা তাঁ’র অদ্ভুত-কথন।
আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন ॥
ছিণ্ডা-কানি কাঁথা বিনা না পরেন বসন।
সাবধানে প্রভুর কৈলা আজ্ঞার পালন ॥
প্রাণ-রক্ষা লাগি’ যেবা করেন ভক্ষণ।
তাহা খাঞা আপনাকে কহে’ নির্বেদ-বচন ॥
প্রসাদান্ন পসারির যত না বিকায়।
দুই-তিন দিন হৈলে, ভাত সড়ি’ যায় ॥
সিংহদ্বারে গাভী-আগে সেই ভাত ডারে।
সড়া-গন্ধে তৈলঙ্গী-গাই খাইতে না পারে ॥
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি’।
ভাত পাখালিয়া ফেলে ঘরে দিয়া বহু পানি ॥

ভিতরের দৃঢ় যেই মাজি ভাত পায়।
লবণ দিয়া রঘুনাথ সেই অন্ন খায়॥"
(চৈ চ অ ৬।৩০৯, ৩১৩, ৩১৫,-৩১৮)

বিবিক্তানন্দি-শিরোভূষণ শ্রীশ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভুর চরিতালোচনায় জানিতে পারা যায় যে, তিনি শ্রীশ্রীল নরোত্তমের ন্যায় একান্ত স্নিগ্ধ অনুগত ব্যক্তিরও কোন প্রকার শুশ্রূষা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন নাই। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিজ শ্রীগুরুপাদপদ্ম বিবিক্তানন্দি-শিরোমণি শ্রী শ্রীলগৌরকিশোর-প্রভু সম্বন্ধেও বলিয়াছেন,—

"ব্রজমণ্ডলের সকল মহাত্মার সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। পরিচয় থাকিলেও কাহারও বিষয়-চেষ্টা তিনি কোনদিন অনুমোদন করেন নাই। স্বয়ং একল হইয়া সঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক শুদ্ধ-ভজনে কালাতিপাত করেন।"

যে বৎসর শ্রীগৌরহরি শ্রীমায়াপুরে ফাল্গুন-পূর্ণিমায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন অর্থাৎ বাঙ্গালা ১৩০০ সালে ফাল্গুন-মাসে এই মহাত্মা শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়ের আদেশানুসারে শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে শ্রীগৌড়মণ্ডলে আগমন করেন এবং তদবধি মহাপ্রস্থানকাল পর্য্যন্ত শ্রীধাম-নবদ্বীপের বিভিন্ন পল্লীতে বাস করিয়াছিলেন। ১৩১১ সাল হইতে তাঁহার দৃষ্টিশক্তির অভাব আমরা দেখিয়া আসিতেছি। ১৩১২ সাল হইতে তিনি যাযাবরের বিচরণধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এক কুটীরে অবস্থান স্বীকার করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে শ্রীধামের বিভিন্ন গ্রামসমূহে ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা মাধুকরী সংগ্রহ এবং নিজ পরিশ্রম-

দ্বারা সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। অপর কেহ কোনদিন তাঁহার সেবা করিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহার কঠোর বৈরাগ্যের কথা শুনিলে জীবের ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে স্মরণ হয়। পরমহংস বাবাজী মহাশয়কে কৃষ্ণেতর-বিষয়-বৈরাগ্য আশ্রয়স্বরূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছিল। আর যাঁহারা সেই বৈরাগ্যচরিত-অনুষ্ঠানাবলী দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য কৃষ্ণেতর-বিষয়ে বিতৃষ্ণ হইয়াছেন, ইহা ধ্রুব সত্য। তাঁহার কৃষ্ণেতর বিষয়-বৈরাগ্যের আদর্শ নিতান্ত পাষাণ-হৃদয়কেও দ্রবীভূত করিতে পারে।

তাঁহার গলদেশে তুলসীমালা, হস্তে নির্ব্বন্ধিত নাম-সংখ্যার জন্য তুলসীমালা এবং কতিপয় বঙ্গভাষায় লিখিত শ্রীগ্রন্থ আমি দেখিয়াছি। কোন কোন সময়ে গলদেশে মালা নাই, হস্তে সংখ্যা রাখিবার তুলসীমালার পরিবর্ত্তে ছিন্নবস্ত্র-গ্রন্থিমালা, উন্মুক্ত কৌপীন, নগ্নভাব, কারণরহিত বিতৃষ্ণা ও পারুষ্য প্রভৃতি অনেকানেক দৃশ্য আমার নয়ন গোচর হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়াও অনেক অর্ব্বাচীন, অনেক চতুর সমীচীন, বালক, বৃদ্ধ, পণ্ডিত, মূর্খ ভক্তাভিমানী ব্যক্তিগণও তাঁহার দর্শন-লাভ করিতে পারেন নাই। এইটি কৃষ্ণভক্তের ঐশী শক্তি। কত শত অন্যাভিলাষী তাঁহার নিকট নিজ নিজ ক্ষুদ্র অভিলাষের পরামর্শ পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু সেই উপদেশগুলিই তাঁহাদের বঞ্চনাকারক।

* * তিনি নিষ্কিঞ্চন, সুতরাং প্রতিষ্ঠার আশা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে কোনদিন সমর্থ হয় নাই। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধী

ব্যক্তির প্রতি কোন বিতৃষ্ণা ছিল না। কৃপাপাত্রের প্রতিও কোন বাহ্য অনুগ্রহ প্রদর্শন ছিল না। তিনি বলিতেন,—'আমার বিরাগভাজন বা প্রীতিভাজন জগতে কেহ নাই, সকলেই আমার সম্মানের পাত্র।'

(সজ্জনতোষণী ১৯১৫, ১৮০-১৮৩ পৃঃ)

গোষ্ঠ্যানন্দী ও বিবিক্তানন্দী—উভয়ই মুক্ত-পুরুষ। শ্রীগৌড়-মণ্ডলবাসিগণ সাধারণতঃ গোষ্ঠ্যানন্দী; শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলবাসিগণের মধ্যে গোষ্ঠ্যানন্দী ও বিবিক্তানন্দী উভয় শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীব্রজমণ্ডলবাসিগণ প্রধানতঃ বিবিক্তানন্দী। শ্রীগৌড়-মণ্ডলবাসিগণের মধ্যে শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিত, শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীরামানন্দ বসু প্রভৃতি কুলীন-গ্রামবাসিগণ সকলেই নিজ নিজ গোষ্ঠী বা গণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের সুখানুসন্ধান করিয়াছিলেন। অন্য দিকে শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত, শ্রীগোপালগুরু, শ্রীধ্যানচন্দ্র প্রভৃতি আচার্য্যবৃন্দ গৃহত্যাগী হইয়াও গোষ্ঠ্যানন্দীর লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। আবার শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলবাসিগণের মধ্যে শ্রীস্বরূপদামোদর, পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দ, নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু প্রভৃতি বিবিক্তা-নন্দীর লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধির সন্নিকটে শ্রীসাতাসন-মঠে অনেক বিবিক্তানন্দী মহাজন ভজন করিতেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সমসাময়িক দুই একজন বিবিক্তানন্দী মহাপুরুষের কথা ঠাকুরের স্বলিখিত চরিতে পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন,—

"টোটা গোপীনাথের মন্দির হইতে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি-বাটী যাইতে পথে সাতাসন-ভজনকুটীর। সেখানে নিরপেক্ষ বাবাজীগণ ভজন করিতেন। শ্রীস্বরূপদাস বাবাজী সেখানে ভজন করিতেন। মহাত্মা শ্রীস্বরূপদাস বাবাজী একজন অপূর্ব্ব বৈষ্ণব। সমস্ত দিবসই কুটীরের ভিতর ভজন করিতেন। সন্ধ্যাকালে প্রাঙ্গণে আসিয়া তুলসী দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া নামগান করিতে করিতে নাচিতেন ও কাঁদিতেন। ঐ সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বৈষ্ণবগণ যাইতেন। কেহ কেহ এক মুষ্টি মহাপ্রসাদ তাঁহাকে সেই সময় দিতেন। তাঁহার ক্ষুন্নি-বৃত্তি পর্য্যন্ত তিনি তাহা স্বীকার করিতেন; অধিক লইতেন না। কেহ কেহ সেই সময় শ্রীচৈতন্যভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন। বাবাজী মহাশয় আবার রাত্রি ১০টায় নিজের কুটীরে যাইয়া ভজন করিতেন। অন্ধকার থাকিতে থাকিতে সমুদ্রতীরে গিয়া হাত-মুখ ধোয়া ও স্নান করা সমাপ্ত করিতেন। কোন বৈষ্ণব পাছে তাঁহার কোন কার্য্য করেন, সেই আশঙ্কায় একক সব কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু অন্ধ; কেমন করিয়া রাত্রি থাকিতে সমুদ্রে দৈহিক স্নানাদি করিতেন, তাহা মহাপ্রভুই জানেন। তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার বিষয়-চিন্তা মাত্রই ছিল না। আমি সন্ধ্যার পর কোন কোন দিন তাঁহার চরণ দর্শন করিতে যাইতাম। বড় মিষ্ট-বাক্যে তিনি আগন্তুক লোকের সহিত কথোপকথন করিতেন।"

(স্বলিখিত-জীবনী, ১৪১-১৪২পৃঃ)

শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভু, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী প্রভু, শ্রীশ্রীরূপসনাতন, শ্রীরঘুনাথাদি গোস্বামিবর্গ সকলেই-বিবিক্তানন্দীর লীলা প্রকট করিয়াছেন। তাঁহারা যে কিরূপ বিরক্ত, নিরপেক্ষ ও দ্বিতীয়-সঙ্গ-রহিত ছিলেন, তাহার সাক্ষ্য শ্রীল কবি-রাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। অত্যন্ত নিরপেক্ষ না হইলে বিবিক্তানন্দী হওয়া যায় না। অধিক কি, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতনের দ্বারা জগৎকে বিবিক্তানন্দীগণের অনন্যনিরপেক্ষতার কথা জানাইয়াছেন।

বিবিক্তানন্দিগণের আকাঙ্ক্ষার কথা শ্রীশ্রীল ঠাকুর নরোত্তম এইভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"ধন, জন, পুত্র, দারে, এ-সব করিয়া দূরে,
একান্ত হইয়া কবে যা'ব।
সব দুঃখ পরিহরি' বৃন্দাবনে বাস করি'
মাধুকরী মাগিয়া খাইব॥

* * *

করঙ্গ-কৌপীন লঞা, ছেঁড়া কাঁথা গায় দিয়া,
তেয়াগিব সকল বিষয়।
কৃষ্ণে অনুরাগ হ'বে, ব্রজের নিকুঞ্জে কবে,
যাইয়া করিব নিজালয়?
হরি হরি, কবে মোর হইবে সুদিন।
ফল-মূল বৃন্দাবনে, খাঞা দিবা- অবসানে,
ভ্রমিব হইয়া উদাসীন॥"

* * *

ত্যাজিয়া শয়ন-সুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হ'বে অঙ্গ ?
ষড়রস-ভোজন দূরে পরিহরি'।
কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী ?

* * *

আর কি এমন দশা হ'ব।
সব ছাড়ি বৃন্দাবনে যা'ব॥"

* * *

(প্রার্থনা—২৭-৩০)

এই গেল গোষ্ঠ্যানন্দী ও বিবিক্তানন্দী মুক্তকুলের কথা। ইঁহারা উভয়েই শ্রীকৃষ্ণ সুখ-তাৎপর্য্যে ভজন করেন। বাহ্যতঃ উভয়ের ক্রিয়ামুদ্রায় কিছুটা পার্থক্য লক্ষিত হইলেও ইহাদের শ্রীকৃষ্ণ-সুখানুসন্ধান-তাৎপর্য্যরূপ অন্তর-নিষ্ঠায় স্বরূপতঃ কোন-প্রকার আত্যন্তিক ভেদ নাই। যাঁহারা সর্ব্বহারা হইয়া শ্রীকৃষ্ণসুখানু-সন্ধিৎসু, তাঁহারা বিবিক্তানন্দী ; আর যাঁহারা গোষ্ঠীর সহিত শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধানপর হইয়া সংকীর্ত্তনরাসরসিকের সেবায় লৌল্য-বিশিষ্ট, তাঁহারা গোষ্ঠ্যানন্দী। উভয়ের মধ্যে সেবার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র থাকিলেও কোনপ্রকার জড়-ভেদ নাই। উভয়েই স্ব-স্ব ভূমিকায় সেবানন্দে ভরপুর। স্থায়িভাব-রতির পর যে রসচমৎ-কারিতার তারতম্য, তাহাতে অস্থায়িভাবের ভূমিকার ন্যায় উচ্চাবচ ভেদ নাই।

গোষ্ঠ্যানন্দিত্বের ব্যভিচারত্ব-হেতু কালক্রমে গৃহব্রতধর্ম্ম বা ভূম্যধিকারী মহান্ত-প্রথার উদ্ভব হইয়াছে। আর বিবিক্তানন্দিত্বের অপব্যবহার-হেতু 'রঙ্‌তারাম' বা 'দেলায় দে রাম' বা 'ভবঘুরে বৈরাগি'-প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে।

সাধকগণ যখন গোষ্ঠ্যানন্দী বা বিবিক্তানন্দীর মধ্যে কোন একটিকে বাছিয়া লইতে চাহেন, তখন তাঁহার উপর অনেকগুলি দায়িত্ব উপস্থিত হয়। গোষ্ঠ্যানন্দীর দলে প্রবেশ করিলে তাঁহাকে ব্যক্তিগত ভজনের প্রতি উদাসীন হইলে চলিবে না। গোষ্ঠে থাকিলে অনেক সুবিধা আছে। স্বয়ং গোষ্ঠপতি শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও গোষ্ঠস্থিত সতীর্থ সাধুগণ নানা প্রকার সাক্ষাৎ উপদেশ ও আচরণের দ্বারা সাধককে সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন হইতে রক্ষা করেন। কিন্তু যদি গোষ্ঠে থাকিয়া কেহ নিশ্চিন্ত হইয়া পড়েন অর্থাৎ অন্ন-বস্ত্রের চিন্তার অভাবের সহিত শ্রীশ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের সুখানুসন্ধানস্মৃতির প্রতি অন্যমনস্ক হইয়া পড়েন কিংবা নিজের অযোগ্যতার তীব্র-উপলব্ধির পরিবর্ত্তে অপরের দোষানুসন্ধান, মাৎসর্য্য, অশ্রদ্ধা, কুটিলতা, জড়াভিনিবেশ, নিজ-বহুমানিত্ব প্রভৃতি অপরাধ-প্রসূত অপরাধ-সমূহের ইন্ধন হইয়া পড়েন অথবা নিজ শান্তি-কামনাকে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সুখানুসন্ধান হইতে বড় মনে করেন, তাহা হইলে সঙ্ঘে থাকার যে সকল সুযোগ আছে, তাহা সুফলপ্রসূ না হইয়া অমঙ্গলই আনয়ন করে।

শ্রীলোকনাথ, শ্রীভূগর্ভ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথদাস, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীগোপাল ভট্ট-প্রমুখ বিবিক্তানন্দি-শিরোমণি গোস্বামিবৃন্দ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীব্রজভজনানন্দী হইয়াছিলেন; আবার শ্রীলগৌরকিশোর বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের কৃপাদেশ প্রাপ্ত হইয়া সুদীর্ঘকাল শ্রীব্রজভজন করিবার পর শ্রীগৌড়মণ্ডলে আগমন করিয়া শ্রীপাদসেবনক্ষেত্রে ব্রজবাস করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীব্রজমণ্ডলে বিবিক্তানন্দী হইয়া বাস করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর আদেশে তিনি সেই সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে গোষ্ঠ্যানন্দিরূপে অবস্থান করিয়া শ্রীগৌরহরির শ্রীনাম, শ্রীধাম ও শ্রীকামের সেবা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছিলেন,—

"মনে হইল,—আমি বৃথা দিন কাটাইলাম। আমার কিছুই হইল না। শ্রীসচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের দাস্যরস কিছুই ভোগ করিতে পাইলাম না। যদি পারি, এই কয়েক বৎসর কর্ম্মের পর পেন্‌সন্ লইয়া **মথুরা-বৃন্দাবনের মধ্যে কোন যামুন-পুলিনময় বনে একটু স্থান করিয়া তথায় নির্জ্জন ভজন করিব,** কিন্তু অভ্যাসবশতঃ আমার শরীর সেরূপ স্থানে একা থাকিতে পারিবে না; সুতরাং আর একটি লোক সঙ্গে রাখিব। শ্রীরামসেবক ভক্তিভৃঙ্গকে সেই কার্য্যের সঙ্গী করিবার যত্ন করিলাম। শ্রীরামপুরে তাঁহাকে আনাইয়া পরামর্শ করিলে তিনি তাহাতে মত দিলেন। সেই সময় আমি 'আম্নায়-সূত্র' রচনা করিতেছিলাম। রামসেবক বাবু কলিকাতা গেলেন। আমি কার্য্যোপলক্ষে একবার তারকেশ্বরে গেলাম। তথায় রাত্রে শয়ন

করিলে নিদ্রাকালে প্রভু আমাকে বলিলেন,—"তুমি বৃন্দাবন যাইবে ? তোমার গৃহের নিকটবর্ত্তী শ্রীনবদ্বীপধামে যে কার্য্য আছে, তাহা কি করিলে ?"

(স্বলিখিত-জীবনী, ১৭৪-১৭৫ পৃষ্ঠা)

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীবৈষ্ণবরাজ শম্ভু-র এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে নির্জ্জন-ভজনের সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ শ্রীগৌরজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নিত্যসিদ্ধ গোষ্ঠ্যানন্দী আচার্য্যরূপেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুরের ঐসকল দৈন্যময়ী উক্তির মধ্যে সাধকগণেরও অনেক শিক্ষার বিষয় আছে।

পাঁচমিশালী-ব্যক্তিগণের সঙ্ঘকে 'সামাজিক সভা' বলা যাইতে পারে ; বস্তুতঃ তাহা 'শুদ্ধভক্ত-সঙ্ঘ' বা 'গোষ্ঠী' নহে। তথায় প্রকৃত ইষ্টগোষ্ঠী হয় না। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

"শুদ্ধভক্তসঙ্গ ব্যতীত ইষ্টগোষ্ঠী হয় না। 'ইষ্ট'-শব্দে—অভিলষিত বিষয় এবং 'গোষ্ঠী'-শব্দে—সভা। এই দুই শব্দ মিলিত হইয়া শুদ্ধভক্তি-পরায়ণ সাধুদিগের সভাকে 'ইষ্টগোষ্ঠী' বলিয়া নামকরণ করা হয়।

যে-স্থলে সর্ব্বপ্রকার লোকের সমাগম, সে-স্থলে গৌরাঙ্গের সামাজিক সভা হয়। যে-স্থলে কেবল ভক্তগণের সমাগম, সে-স্থলে বৈষ্ণব-সমাজ বা বৈষ্ণবদিগের ইষ্টগোষ্ঠী। যে-স্থলে দুই শুদ্ধভক্তের মিলন, সে-স্থলে কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠী। যে-স্থলে এক শুদ্ধভক্তের অব-

স্থান সে-স্থলে কেবল নামাদির নির্জ্জন-ভজন।

শুদ্ধভক্ত জগতে বিরল। অতএব তাঁহাদের মিলনরূপ ইষ্ট-গোষ্ঠীতে দুই চারিজন ব্যতীত একস্থানে অধিক পাওয়া যায় না। সাধারণের সঙ্গে রসালাপে সুখ হওয়া দূরে থাকুক্, অত্যন্ত রসভঙ্গ হয়; ইষ্টগোষ্ঠীতে সেরূপ রসভঙ্গ হয় না।

ইষ্টগোষ্ঠী দুই প্রকার—আচার ও প্রচার। আচার-পালনে তাঁহারা (ভজনপরায়ণ বৈষ্ণবগণ) শ্রীভাগবতাদির পাঠ ও শ্রবণ এবং হরিনাম-কীর্ত্তনে রত। প্রচার-সময়ে ভগবত্তত্ত্ব, জীব, রসতত্ত্ব ও নাম-মহিমা অধিকারী-ভেদে প্রদান করেন।”

(—‘শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-সমাজ’, সঃ তোঃ ১০।১১,১২)

কেহ ভজনানুকূল সঙ্ঘেই থাকুন, আর একাকীই থাকুন, গৃহে থাকুন আর বনেই থাকুন—সর্ব্বত্রই ব্যক্তিগত ভজন অর্থাৎ শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সুখানুসন্ধানস্মৃতির প্রতি অভিনিবিষ্ট থাকিবেন। **‘ব্যক্তিগত ভজন’ বলিতে ভগবৎসুখানুসন্ধানস্মৃতি; মুমুক্ষা বা আত্মশান্তি পিপাসা নহে।**

“যা নির্ব্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূত
কিন্ত্বন্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ॥”

(ভা ৪।৯।১০)

হে নাথ, ভবদীয় শ্রীচরণকমল ধ্যান এবং আপনার নিজ-জনের সহিত আপনার চরিত্র-কথা শ্রবণ করিয়া যে আনন্দ লাভ

হয়, ব্রহ্মানন্দেও সেইরূপ সুখ অনুভূত হয় না। অতএব দেবতা-পদ ত' অতি তুচ্ছ! কারণ, কালরূপ খড়্গ দ্বারা স্বর্গারোহণ-যান খণ্ডিত হইলে দেবতাগণও মর্ত্ত্যলোকে পতিত হইয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের কথা আর কি বলিব?

"ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো
ভূয়াদনন্ত মহতামমলাশয়ানাম্।
যেনাঞ্জসোল্বণমুরুব্যসনং ভবাব্ধিং
নেষ্যে ভবদ্‌গুণকথামৃতপানমত্তঃ॥"
(ভা ৪।৯।১১)

হে অনন্ত, যে সকল শুদ্ধাত্মপুরুষ নিরন্তর আপনাতেই ভক্তি করিয়া থাকেন, সেই সকল সাধু মহাত্মার সহিত আমার প্রকৃষ্ট সঙ্গ লাভ হউক্। এবম্ভূত মহৎসঙ্গবলে আমি ভবদীয় গুণকথামৃত-পানোন্মত্ত হইয়া অতিশয় দুঃখ-পরিপূর্ণ এই ভীষণ ভবসমুদ্র অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইতে পারিব।

"তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্ত্যং
যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্‌গৃহবিত্তদারাঃ।
যে ত্বব্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ-
সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃত প্রসঙ্গাঃ॥"
(ভা ৪।৯।১২)

হে ঈশ, হে পদ্মনাভ, যাঁহারা ভবদীয় পাদারবিন্দ-সৌগন্ধে লুব্ধহৃদয় মহাত্মগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ লাভ করেন, তাঁহারা নিরতিশয় প্রিয় এই দেহকে এবং তৎসম্বন্ধি পুত্র, সুহৃৎ, গৃহ, বিত্ত এবং কলত্র ইহাদের কিছুই চিন্তা করেন না।

"হে সাধকগণ! দেহযাত্রা-নির্ব্বাহে সৎ ও অসৎ উভয় ব্যক্তির নৈকট্য অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। ইহাতে গৃহী ও গৃহত্যাগী উভয়ের সমানতা। নৈকট্য অবশ্যই ঘটিবে, তথাপি অসতের সঙ্গ করা হইবে না। দান, প্রতিগ্রহ, পরস্পর গূঢ়-জল্পন ও পরস্পর ভোজনাদি-স্বীকার কার্য্যে যদি প্রীতি করা হয়, তবে সঙ্গ হয়। ক্ষুধাতুর ব্যক্তিকে যাহা কিছু দেওয়া যায় এবং ধার্ম্মিক দাতার নিকট হইতে যাহা কিছু লওয়া যায়, তাহা কর্ত্তব্যবোধে কৃত হয় মাত্র, প্রীতির সহিত করা যায় না। তাহারা অসৎ হইলেও তৎকার্য্যে তাহাদের সঙ্গ হয় না। তাহারা শুদ্ধবৈষ্ণব হইলে সেই কার্য্যে প্রীতি হয়। প্রীতি করিলে সঙ্গ হয়। সুতরাং, শুদ্ধবৈষ্ণব-দিগকে দান ও তাঁহাদের নিকট হইতে দ্রব্য বা অর্থ-গ্রহণে সৎসঙ্গ হয়। অসৎকে দান ও অসতের নিকট হইতে গ্রহণ যদি প্রীতি-সহকারে হয়, তবে অসৎসঙ্গ হইয়া পড়ে। অসদ্ব্যক্তি নিকটে আসিয়াছে, তাহার সহিত যে কর্ত্তব্য-কর্ম্ম আবশ্যক হয়, তাহা কেবল কর্ত্তব্যবোধে করিবে। পরস্পরের গূঢ়কথার জল্পনা করিবে না। গূঢ়-জল্পনায় প্রায় প্রীতি থাকে, তাহাতে সঙ্গ হয়। সংসারী বান্ধবাদির মিলনে নিতান্ত আবশ্যক বার্ত্তামাত্র বলিবে। হৃদয়ের প্রীতি তখন না করাই ভাল। কিন্তু, যদি সেই বান্ধব সাধুবৈষ্ণব হ'ন, তবে সেই বার্ত্তা প্রীতি সহকারে করিয়া তাঁহার সঙ্গ স্বীকার করিবে। কুটুম্ব ও বান্ধবের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিলে কোন বিরোধ হইবে না। ব্যবহারিক বার্ত্তায় সঙ্গ হয় না। বাজারে দ্রব্যক্রয় সময়ে যেরূপ নূতন ব্যক্তির সহিত কেবল বাহ্য ব্যবহার

করিতে হয়, সেইরূপ ব্যবহার সাধারণের সঙ্গে করিবে। শুদ্ধ ভক্তের সহিত সেই সেই ব্যবহারের প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক সঙ্গ করিবে।"

(—শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত 'সঙ্গত্যাগ'-প্রবন্ধ)

শ্রীশ্রীল-প্রভুপাদের প্রকটকালে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে গৌড়ীয়ের ১২শ বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় 'ব্যষ্টি ও গোষ্ঠীগত-ভজন'-সম্বন্ধে যে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, উহার কিয়দংশ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"অর্ব্বাচীন অভক্ত-সম্প্রদায় যেমন একদিকে হরিকথা-প্রচারের মূল উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া অন্যায়, অবৈধ, অনধিকারী সমালোচক হইয়া পড়ে, তেমনই আবার অনর্থযুক্ত সাধক-জীব মহামুক্ত আচার্য্যের অনুকরণ করিতে গিয়া প্রচারের বা প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্যের ছলনায় ব্যক্তিগত সাধক-জীবনকে বিপদগ্রস্ত ও পাতিত করিয়া ফেলিবার যোগ্যতা সংরক্ষণ করে।

প্রচার বা প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্য করিবার ছলে সাধকগণ যদি বৈধী ভক্তির শাসনগুলিকে উল্লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে প্রচার সেবার ছলনায় কেবল যে ব্যক্তিগত সাধক-জীবন পাতিত হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা নহে—ব্যষ্টির পাপ ও অপরাধ গোষ্ঠীর মধ্যেও ক্রমে ক্রমে সঞ্চারিত ও সংক্রামিত হইয়া গোষ্ঠীকে ধ্বংসের দিকে প্রধাবিত করিয়া থাকে।

বস্তুতঃ **বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্পূর্ণ ব্যক্তিনিষ্ঠ ধর্ম্ম**। ব্যক্তিগত সাধকজীবন সর্ব্বতোভাবে আদর্শ না হইলে—সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবশাস্ত্রের আনুগত্যপূর্ণ ও অনুমোদিত না হইলে ঐরূপ জীবনের দ্বারা প্রতিষ্ঠানের ত' কোন মঙ্গল হয়ই না, বরং কলঙ্ক-প্রচারেরই সাহায্য করে।

ব্যক্তিগত সাধক-জীবনে বিন্দুমাত্রও উদাসীন হইলে চলিবে না। সাধক সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে নিজের মঙ্গল করিবেন—নিজের চরিত্রকে আদর্শস্থানীয় ও শাস্ত্রানুমোদিত করিবেন। সর্ব্বাগ্রে নিজে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-শাস্ত্র-বাক্য শ্রবণ করিবেন। **যাহার নিজের শ্রবণ হয় নাই, তিনি কখনও অপরকে শ্রবণ করাইতে পারেন না।** যাহার নিজের চরিত্র পরম বিমল নহে, তিনি অধিকক্ষণ কপট করিয়া অপরের চরিত্রকে বিমল করিবার উপদেশ দিতে পারেন না ; আর সেই উপদেশও কার্য্যকরী হয় না। **যাহাদের ব্যক্তিগত আদর্শ জীবন নাই, তাহারা কৃত্রিম ও সাময়িক প্রচারক সাজিলে জগতে কৃত্রিমতা ও কপটেরই প্রচার হইয়া থাকে।** ঐ সকল প্রচার মৌখিক বাগ্‌বৈখরী মাত্র।

ব্যক্তিগত চরিত্রের উপরে অবগুণ্ঠন টানিয়া গোষ্ঠীগত শিক্ষার চেষ্টা কেবল আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনার তাণ্ডব। ব্যক্তিগত জীবনে অন্যমনস্ক হইয়া মৌখিক প্রচার কেবল **পর-ছিদ্রানুসন্ধানের শলাকা** সৃষ্টি করিবে। যে ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত ছিদ্র অনুসন্ধান এবং শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা ও সেবাদ্বারা সেই ছিদ্রকে নিশ্ছিদ্র না করিয়া প্রচারকের সজ্জায় কেবল অপর ব্যষ্টি বা সমষ্টির ছিদ্রের কথা-প্রচারেই শতমুখ হন, সে ব্যক্তি বস্তুতঃ কখনও নিজের মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না ; কেবল ঐরূপ ছিদ্রানুসন্ধান ও পরচর্চ্চার গ্রাম্য আবহাওয়ায় সুখানুভব করিতে করিতে তিনি ঐরূপ দলেরই একজন দলভুক্ত বা দলপতি হইয়া পড়েন। ব্যক্তিগত সাধন জীবনের দিকে না তাকাইয়া এইরূপ

প্রচারকের ছলনা-গ্রহণকারী বহু ব্যক্তিকে এইরূপভাবে পতিত হইতে দেখা গিয়াছে।

'আমি বা আমরা প্রচারের বিশিষ্ট সেবায় যাইব, সুতরাং আমাদের জন্য যে ব্যবস্থা তাহা বৈধী ভক্তির গণ্ডীর বাহিরে; আমরা ভোগের আগেই প্রসাদ পাইব, উত্তম উত্তম দ্রব্য ভোজন করিব, অপর গুরুসেবক বা বৈষ্ণবের দ্বারা সেবা করাইয়া লইবার বিশেষ অধিকার দাবী করিব, উত্তম বসন-ভূষণ, যান-বাহন, বিষয় ও বিষয়ীর সংস্পর্শ, প্রতিষ্ঠাবরণ প্রভৃতি কার্য্যগুলি অনাসক্তভাবে স্বীকার করিব'—এইরূপ বিচার পরমমুক্তপুরুষের অনুকরণে গ্রহণ করিতে গেলে অনর্থযুক্ত সাধককে কতটা বিপদের বোঝা ঘাড়ে লইতে হয়, তাহা যদি সর্ব্বক্ষণ তাহার হৃদয়ে দেদীপ্যমান না থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ যুক্ত বৈরাগ্য-ছলনা সাধকের মুহূর্ত্তমাত্র অবশ্যম্ভাবী অন্যমনস্কতার মধ্যে সাধককে তাহার বিশেষ অধিকার-প্রাপ্তির গৌরীশঙ্কর হইতে ভৃগুপাত করাইয়া পতনের রসাতলে প্রেরণ করিবে।

এজন্য সাধু সাবধান! প্রচার বা প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্য করিবার ছলনায় ব্যক্তিগত সাধকজীবনের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিলে চলিবে না। **'যথাযোগ্য বিষয়ভোগে'র নামে সাধক-জীবনের মঙ্গল-চেষ্টায় গোঁজামিল দিলে চলিবে না।** 'যুক্তবৈরাগ্য'-শব্দের ভাবের ঘরে 'চুরি' করিলে আপনাকে পতনের প্রপাতের মধ্যে ফেলিয়া দিতে হইবে।

মহাপ্রভু স্বয়ং প্রচারকের অভিনয় করিয়াছিলেন। তথাপি প্রচার-

কের সজ্জা গ্রহণ করিয়াও তিনি ব্যক্তিগত সাধকজীবনের কর্ত্তব্য-সমূহ নিজ আচরণের দ্বারাই জীবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাকে বন্ধ্যা করিবার জন্য যদি কাহারও চেষ্টা হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা বা সেইরূপ ব্যষ্টির সমষ্টি-দ্বারা কোনদিনই শ্রীচৈতন্য-বাণীর মনোঽভীষ্ট পূর্ণ হইতে পারে না।

শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি-প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ পরম-মুক্তকুলের আদর্শ বা আচারকে প্রচারের আনুকূল্যের আদর্শরূপে গ্রহণ করিলে সেরূপ ঢঙ্গবিপ্রের অনুসরণকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে মায়ার কশাঘাত খাইতেই হইবে। 'এক রামানন্দের যাহাতে অধিকার,' 'এক পুণ্ডরীকের যাহাতে অধিকার,' কিংবা সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ বা শ্রীঅদ্বৈত মদিরা, যবনী গ্রহণ করিলেও 'জগদ্গুরু'-পদবাচ্য বলিয়া ব্যক্তি-গত সাধকজীব যদি তাঁহাদের অনুকরণ বা তাঁহাদের পদবীর অবৈধ দাবী করিতে যান, তাহা হইলে তাহার ঐরূপ আচার বা প্রচারের দ্বারা গোষ্ঠীর কোন মঙ্গল হইবে না। ঐরূপ ব্যষ্টিপ্রচারকের শিক্ষায় যে-সকল গোষ্ঠী বর্দ্ধিত বা শিক্ষিত হইবে, তাহা বাউল, সহজিয়া, নেড়া, দরবেশ বা কপটভণ্ডের গোষ্ঠীই বৃদ্ধি করিবে।

অতএব **পরম-মুক্ত-পুরুষের নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যত্ব আর অনর্থযুক্ত সাধকের আচার্য্যত্বের শিক্ষানবিসি সমপর্য্যায়ে অবস্থিত নহে।** শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-প্রভু কিংবা

শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি-প্রভৃতি আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীশ্যামানন্দ, শ্রীরসিকানন্দ, প্রভৃতি আচার্য্য-গণ প্রচার করিয়াছেন,—ইঁহারা নিত্যসিদ্ধ মুক্তকুল। এইসকল আচার্য্যের অনুকরণ করিয়া যদি কেহ শ্রীপুণ্ডরীকের ন্যায় বিলাস-দ্রব্য; শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীশ্রীনিবাস-আচার্য্যপ্রভু প্রভৃতি অতিমর্ত্ত্য মহাজনের ন্যায় দুই বা বহু-পত্নী-গ্রহণ প্রভৃতি ব্যাপারকে প্রচারের অনুকূল জীবন বলিয়া-চালাইতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি বঞ্চিত হইলেন। যিনি সাপ খেলাইতে পারেন, একমাত্র তাঁহারই সাপ খেলান-কাজটি শোভা পায়। শ্রীমহাদেবই কালকূট হজম করিতে পারেন। জগদ্গুরু মহাদেব শ্রীপার্ব্বতীকে উরুদেশে স্থাপন করিয়া উপবিষ্ট থাকিতে পারেন, তাহাতে হাস্য করিবার কিছুই নাই বা তাহা অনুকরণীয়ও নহে।

সাধক প্রচারক বাহ্য পোষাকে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা গৃহস্থ যাহাই থাকুন না কেন, সাধকজীবের ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি উদাসীন হইলে চলিবে না। **সন্ন্যাসীর অল্পছিদ্র বহু-লোকে গান করে সত্য, কিন্তু গৃহস্থের ছলনায় সাধক-জীবনের যে সাত খুন মাপ হইবে, তাহাও নহে।** সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, আচার্য্যত্বের শিক্ষা-নবিসির মধ্যে আচার্য্যত্বের অনুকরণ থাকিবে না, কিন্তু সেবাময় ও মঙ্গলময় অনুসরণ থাকিবে। **ব্যক্তিগত সাধকজীবন এরূপ আদর্শের হইবে, যেন তাহা স্বয়ংই নীরাগ-প্রচারকের মূর্ত্ত শতকণ্ঠ হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের** সৌন্দর্য্যের প্রচার করিতে পারে। ব্যক্তিগত

সাধকজীবনে ঔদাসীন্য-প্রদর্শন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কলঙ্কের পরিচায়ক। যদিও নিত্য, অপতিত, পরম-মুক্ত শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বদাই ঐরূপ পতিত ব্যক্তির স্বকর্ম্ম-ফল-ভোগ হইতে স্বতন্ত্র, তথাপি ঐ ব্যক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধী এবং এই অপরাধেই অবৈধভাবে মুখর জগতের নিকট নির্লেপ বস্তুতেও কলঙ্ক আরোপের ছিদ্র।

—০—

নিরপেক্ষতা

জগতে নিরপেক্ষতা ও সাপেক্ষতা এই দুইটি ধর্ম্ম প্রত্যেক জীবের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে কোনপ্রকার আত্মীয়তা-বোধ বা স্বজন-বোধ আছে, সেখানেই সাপেক্ষতা-ধর্ম্ম অনিবার্য্য, আর যেখানে কোন বস্তু বা জীবে আত্মবোধ বা আত্মীয়তা-বোধ নাই, সেখানে নিরপেক্ষতা স্বাভাবিক। মাতা বা পিতা যে পুত্রের স্বাস্থ্যের কুশল জিজ্ঞাসা করেন বা পত্নী যে স্বামীর স্বাস্থ্য কামনা করেন, উহার মূলে সাপেক্ষতা-ধর্ম্ম বর্ত্তমান। কিন্তু কেবলমাত্র ব্যবহারিকতা প্রদর্শনের জন্য সামাজিকগণ যে একে অপরের কুশল জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে নিরপেক্ষতার ভাবই অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান; অর্থাৎ পুত্রের অমঙ্গলে মাতার বা স্বামীর অসুস্থতায় পত্নীর যে বাস্তব ক্ষতি-বোধ বা আত্মবোধ আছে, পথিকের সহিত পথিকের মৌখিক কুশল জিজ্ঞাসার ব্যবহারিকতার মধ্যে সেরূপ ক্ষতি বৃদ্ধি বোধ নাই।

এ জগতে সাপেক্ষতার মূলে দেহাত্মবোধ বা জড়াত্মবোধ আছে বলিয়াই সাপেক্ষতায় হেয়তা বর্ত্তমান। এজন্যই সাপেক্ষতা হইতে এ জগতে নিরপেক্ষতায় অধিক ন্যায়পরতা বিবেচিত হয় ও উহার সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। পুত্র বা বন্ধু কোন বে-আইনী কাজ করিলে জাগতিক আইন পিতা বা বন্ধুর উপর বিচারের ভার প্রদান করেন না, তাহাতে নিরপেক্ষতার হানি হইবে ও সাপেক্ষতা আসিয়া যাইবে, এরূপ আশঙ্কা করেন। কারণ, এই সাপেক্ষতা দেহাত্মবোধকে কেন্দ্র করিয়া অবস্থিত। বদ্ধজীব কিছুতেই জড়ীয় সাপেক্ষতাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। এইজন্য যাহারা জড়প্রতিযোগিভাবকে সমীচীন বা ন্যায়পর বিচার করেন, তাহারা নিরপেক্ষতাকে বহুমানন করিয়া থাকেন।

পঞ্চ রসের মধ্যে শান্তরসে নিরপেক্ষতা বর্ত্তমান। ব্রহ্মভূত বা তটস্থ অবস্থাকে নিরপেক্ষতা বলা যাইতে পারে। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস সাপেক্ষতাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। ধর্ম্মের বাজারে যে তথাকথিত সমন্বয়ের এতটা আদর দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমন্বয় জিনিষটিও নিরপেক্ষতা ধর্ম্মেরই রূপান্তর। "কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ হইতে ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিলে কিংবা শিব ও দুর্গাকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর না বলিয়া কৃষ্ণকে স্বতন্ত্র ভগবান্ বা স্বয়ং ভগবান্ বলিলে, সনাতন ধর্ম্মকে নিত্যধর্ম্ম বলিলে কোন একটি তত্ত্ব বা ধর্ম্ম-বিশেষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয়, সাপেক্ষতা-ধর্ম্ম আসিয়া পড়ে", এই আশঙ্কা করিয়া সকল পথই সমান, সকল ধর্ম্ম ও

সকল দেবতাই সমান, ইহাদের মধ্যে কোন উচ্চাবচত্ব নাই—এই-রূপ এক জাড্যপূর্ণ নিরপেক্ষতার উদ্ভব হইয়াছে। নির্ব্বিশেষ বিচারটি নিরপেক্ষতারই অভিব্যক্তিবিশেষ। পরাৎপরতত্ত্বকে ব্যক্তিরূপে স্বীকার করিলে পাছে তাঁহার প্রতি কোনরূপ সাপেক্ষতা আসিয়া পড়ে,—এই ভয়ে পরতত্ত্ব ক্লীব-ব্রহ্ম বা নির্ব্বিশেষভাব-সমষ্টি বলিয়া কল্পিত হয়। নাম রূপ-গুণ-পরিকর-লীলার মধ্যে সাপেক্ষতা অবশ্যম্ভাবী—এই আশঙ্কায় নামহীন. রূপহীন, গুণ-হীন, পরিকর-লীলাহীন-ভাববিশেষকে নিরপেক্ষ তত্ত্ব বলিয়া গৃহীত হয়।

পরমেশ্বরের প্রতি নিরপেক্ষ-বিচার যেরূপ এক শ্রেণীর লোকের নিকট বিশেষ ন্যায়পর বলিয়া বহুমানিত হয়, পরমেশ্বরের সেবক-সম্প্রদায়ের প্রতিও সেইরূপ নিরপেক্ষতা প্রদর্শনকে অনেকে বহু-মানন করেন। তাহারা বলেন,—সকলেই যখন ভগবানের ভজন করিতেছেন, তখন সমস্তই সমান। তুলসী পত্রের মধ্যে ছোট বড় ভেদ নাই—এইরূপ ভ্রমপূর্ণ লৌকিক উদাহরণ দিয়াও অনেকে ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে তারতম্য বিচারে আলস্য ও জাড্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত কনিষ্ঠ বা প্রাকৃত, মধ্যম ও উত্তম—এই তিন প্রকার অধিকারী বা ভক্তের নির্দ্দেশ করেন এবং তাঁহাদের প্রতি ব্যবহারের তারতম্যের কথাও উপদেশ করেন। উত্তম ভক্তে শুশ্রূষা, আর প্রাকৃত অধিকারীকে মঙ্গলের উপদেশ-প্রদানাদি ব্যবহারের মধ্যে তারতম্য দেখিয়া যদি কেহ বলেন,—উত্তম অধিকারীর 'তেলা মাথায় তেল ঢালিয়া' প্রাকৃত ভক্তের প্রতি

শাসনাদি ব্যবহার করায় নিরপেক্ষতার হানি হইয়াছে, তাহা হইলে ঐরূপ বিচারে অর্ব্বাচীনতারই পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষক ও ছাত্রের প্রতি সমান ব্যবহার করিলে কোনদিনই শিক্ষা লাভ হইতে পারে না। মধ্যম অধিকারে এই সাপেক্ষতাধর্ম্মই ভগবদ্ভক্তি বা আত্মমঙ্গল-লাভের একমাত্র উপায়। মধ্যম অধিকারীর নিরপেক্ষতার ভাণ আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা মাত্র। নিরপেক্ষতা কখনই ভক্তি-পদবাচ্য নহে। নিরপেক্ষতা ভক্তিধর্মের প্রতিবন্ধক, এমন কি, উৎসাদনকারী—যদিও অভক্ত-সমাজে নিরপেক্ষতার বিশেষ আদর পরিলক্ষিত হয়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে,—তটস্থধর্ম্মের নামই নিরপেক্ষতা জল ও স্থলের মধ্যবর্ত্তী কাল্পনিক রেখাকে 'তট' বলা যায়। বস্তুতঃ ঐরূপ কোন পরিস্থিতি বা অবস্থানে কাহারও অবস্থান সম্ভব নহে। আমাদিগকে হয় জলে, না হয় স্থলে, যে-কোন একটিতে অবস্থিত হইতে হইবে। তটস্থা-শক্তি পরিণত জীবকে হয় মায়ায়, না হয় কৃষ্ণে অবস্থান করিতেই হইবে। মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে জীবের অবস্থান নাই।

এক শ্রেণীর ব্যক্তি আছেন—যাহারা মনে করেন, বৈষ্ণবগণের প্রতিও তাহারা নিরপেক্ষ থাকিয়া হরিভজন বা আত্মমঙ্গল লাভ করিতে পারেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকট-লীলাকালে বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায়ের ব্যক্তি এইরূপ নিরপেক্ষতার কাচ কাচিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ যখন সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতিগোস্বামী অতিবাড়ী, গৌরাঙ্গনাগরী প্রভৃতি অপসম্প্রদায়ের

অভক্তিসিদ্ধান্ত ও আচারাদির সম্বন্ধে প্রচার-অভিযান আরম্ভ করিলেন, তখন কোন কোন প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় মনে করিতে লাগিলেন যে, তাহাদের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকাই ভাল। আবার শ্রীল প্রভুপাদ যখন শ্রীভক্তিবিনোদানুগাভিমানী কোন কোন ব্যক্তির বা দলের সিদ্ধান্ত ও আচার-প্রচারের বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করিলেন, তখনও এক শ্রেণীর ব্যক্তি ঠিক করিলেন, - কোন দলের কথায় না ঢুকিয়া নিরপেক্ষতা অবলম্বন-পূর্ব্বক নির্জ্জন-ভজনানন্দী হওয়াই ভাল। কিন্তু বদ্ধজীব যতই নিরপেক্ষতার কাচ কাচুক না কেন, সেই নিরপেক্ষতা তাহাকে প্রকৃত কৃষ্ণভক্তের প্রতি বা বাস্তব-সত্যের প্রতি সাপেক্ষতা-ধর্ম্ম অবলম্বন না করাইয়া গোপনে গোপনে কৃষ্ণাভক্ত বা শুদ্ধভক্তদ্বেষী অসত্যের প্রতি পূর্ণমাত্রায় সাপেক্ষ করাইয়া থাকে। যেখানেই এইরূপ নিরপেক্ষতার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, সেখানেই বহুরূপিণী মায়া এরূপ নিরপেক্ষকে ঘাড়ে ধরিয়া অসত্যের প্রতি সাপেক্ষ করাইয়াছে।

কেহ কেহ তৃতীয় পক্ষ সাজিয়া নিরপেক্ষতার মুখোস পরিধান করেন। কিন্তু ঐ মুখোস উন্মোচন করিয়া অসৎ-সাপেক্ষতার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। এই তৃতীয় পক্ষের মুখোস অসৎ-সাপেক্ষতা-সমর্থনের কপট কবচমাত্র।

কেহ কেহ নিরপেক্ষতার প্রতি এতটা বিশ্বাসী যে, তাহারা অনেক সময় শপথ করিয়া নিরপেক্ষতার ব্রত গ্রহণ করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে জনৈক এঁচড়ে পাকা

লেখকাভিমানী বহুলোকের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিল যে,
সে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিবে, সে কোন দলের পক্ষে বা বিরুদ্ধে কোন
কথা লিখিবে না বা বলিবে না; কিন্তু আমাদের আচার্য্যদেব
তখনই ঐ ব্যক্তিকে বহু লোকের সম্মুখে বলিয়াছিলেন,—দুইএর
সহিত দুই যোগ করিলে 'তিন হয় বলা যেরূপ একান্ত ভ্রমপূর্ণ,
তোমার প্রতিজ্ঞাও সেইরূপ একান্ত ভ্রমপূর্ণ। কাজে (ফলে)ও
তাহা হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি এখন তাহার নিরপেক্ষতা-ব্রতের কপট
প্রতিজ্ঞার মুখোসটি উন্মোচন করিয়া দিবারাত্র সত্যের প্রতি
বিদ্বেষবহ্নি উদ্গীরণ করিতেছে।

কেহ কেহ মনে করেন যে, কোন দলবিশেষে প্রবেশ করিয়া
নিরপেক্ষ থাকা যায় না বটে, কিন্তু নিজের ঘরে বসিয়া থাকিলে
বা নির্জ্জন-ভজনানন্দী হইলে নিরপেক্ষ থাকা আদৌ অসম্ভব নহে।
কিছুদিন পূর্ব্বে এইরূপ বিচারসম্পন্ন দুই ব্যক্তি বলিয়াছিলেন—
"আমরা মঠে না গিয়া গৃহকেই মঠ করিব, তাহা হইলে নিরপেক্ষ
থাকিতে পারিব।" কিন্তু ঐ ব্যক্তিদ্বয় এখন নিরপেক্ষ-ধর্ম্মের যে
প্রদর্শনী খুলিয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী ব্যতীত অপরকে বুঝান
অসম্ভব। তাঁহাদের গৃহ এখন মঠত্যাগিগণের ও যোষিৎসঙ্গি-
গণের আড্ডা হইয়াছে এবং ইহা হওয়াই স্বাভাবিক; কারণ, ঐরূপ
নিরপেক্ষতার মুখোস ঘৃণ্য সাপেক্ষতার ষড়যন্ত্রের কারখানা-বিশেষ।

কেহ কেহ আবার বলেন,- যেখানে বৈষ্ণবগণের মধ্যে মত-
ভেদ দেখা যায়, সেখানে একপক্ষ হইয়া অপর পক্ষের নিন্দাবাদ
করা অপেক্ষা নিরপেক্ষ থাকাই সমীচীন। কারণ,—

"ইথে এক জনের হইয়া পক্ষ যেই।
অন্য জনে নিন্দা করে, ক্ষয় যায় সেই॥
সকল বৈষ্ণব-প্রতি অভেদ দেখিয়া।
যে কৃষ্ণচরণ ভজে, সে যায় তরিয়া॥"

(চৈঃ ভাঃ ম ২৪।৯৬,১০১)

শ্রীরূপানুগ সদ্‌গুরু-পদাশ্রয় না করিলে শ্রীচৈতন্যভাগবতের উপরিউক্ত পদ-সমূহের তাৎপর্য্য বিপরীতভাবে বুঝিয়া অনেকে নিরপেক্ষ থাকিবার ভাণে শুদ্ধভক্তি হইতে চ্যুত হয়। বৈষ্ণবতা চেতনের বৃত্তি; বৈষ্ণবতা কাহারও গায়ে মার্কামারা থাকে না। অন্যাভিলাষ-নির্ম্মুক্তা অহৈতুকী সেবার উদয়ে বৈষ্ণবতার অভিব্যক্তি, আবার উহার স্তব্ধভাব বা আবরণে অবৈষ্ণবতার প্রকাশ। কৃষ্ণদাস বিপ্র যখন মহাপ্রভুর দণ্ড-কমণ্ডলু বহন করেন, ছোট হরিদাস যখন কীর্ত্তনের দ্বারা মহাপ্রভুর সেবা করেন, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য যখন সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিয়া মহাপ্রভুর রন্ধনাদি সেবাকার্য্য করেন, তখন তাঁহাদের আদর্শে বৈষ্ণবতা প্রকাশিত। আবার কৃষ্ণদাস-বিপ্র যখন ভট্টথারি-স্ত্রীর প্রলোভনে প্রলুব্ধ হন, ছোট হরিদাসের আদর্শে যখন স্ত্রী-সম্ভাষণের নিদর্শন প্রকাশিত হয় বা বলভদ্র ভট্টাচার্য্যে বহির্ম্মুখ গণ-মতের কল্পিত কৃষ্ণ-দর্শনের অন্যাভিলাষ প্রকাশিত হয়, তখন বৈষ্ণবতার আদর্শ আবৃত। সেই সকল অন্যাভিলাষকে অর্থাৎ কাহারও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-কাঙ্ক্ষাকে পূর্ব্বের সেবার নজির দেখাইয়া বহুমানন করিলে তদ্দ্বারা সত্যকে ধামাচাপা দেওয়া হয়। অন্যাভিলাষীকে 'বৈষ্ণব' বলিলে

বৈষ্ণবের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এবং প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের অনর্থ-সমূহে প্রবিষ্ট হইতে হয়। অন্যাভিলাষের সহিত গোঁজামিল দিতে গিয়াই—খাঁটির সহিত ভেজালের—আসলের সহিত মেকির একাকার করিতে গিয়াই প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের গোত্র বর্দ্ধিত হইয়াছে। ঐরূপ দূষিত বীজ হইতে যে অজ্ঞাতসারে অঙ্কুরোদ্‌গম হয়, তাহারই সমূল উৎপাটনের কথা শ্রীল প্রভুপাদের সিদ্ধান্তের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। 'ইথে একজনের পক্ষ হইয়া যেই" প্রভৃতি পদের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয়-ভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"শ্রীঅদ্বৈতের শিষ্য-সম্প্রদায় সকলেই আচার্য্যের অপ্রকটের পর শ্রীগদাধরের আনুগত্য স্বীকার করেন, তাহাতে কতিপয় নির্ব্বোধ ব্যক্তি অদ্বৈতের পরিচয় বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে বহু-মানন করিবার ছলে গদাধর পণ্ডিতের ভক্তিধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যের গর্হণ করেন। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ঐরূপ অবৈধ-কর্ম্মের দ্বারা **শ্রীগদাধর বিরোধী পাষণ্ডিগণকে অদ্বৈতপ্রভুর নিত্যভৃত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না।** তাহারা শ্রীঅদ্বৈতপাদপদ্মে অপরাধী হওয়ায় **কপটতামূলে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রশংসার ছলে শ্রীগদাধরকে নিন্দা করেন,** তাহা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু কখনও সহ্য করেন না, পরন্তু **সেই সকল ভৃত্যব্রুবগণকে নিজ ভৃত্য না বলিয়া তাড়াইয়া দেন।**

বিষ্ণু বা তাঁহার নিত্য-ভৃত্য বৈষ্ণবগণ—সকলেই ঈশ্বর বা প্রভু। বিমুখ দাসগণ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। বিষ্ণুর

প্রকাশ বিশেষ পরস্পরের মধ্যে বৈচিত্র্য প্রকট করিয়া বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করে, অথবা বৈষ্ণবগণের মধ্যে ভগবৎপ্রেমবর্দ্ধনের নিমিত্ত আপাত আধ্যক্ষিক দৃষ্টিতে যে বিবাদের ছলনা বা অভিনয় দেখা যায়, সেই সকল কথা সাধারণ কর্ম্মফলবাধ্য ব্যক্তিগণের সমতা-বোধক নহে। বিষ্ণু ও বৈষ্ণব কর্ম্মফলবাধ্য জীবের ঈশ্বর বা প্রভু; সুতরাং প্রভুর সহিত অপর বৈষ্ণব প্রভুর, শ্রীনিত্যানন্দের সহিত শ্রীঅদ্বৈতের যে-সকল বিবাদপ্রতিম কথায় নির্ব্বোধ সরলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ অপর সাধারণ দৃষ্টান্তের সহিত সমজ্ঞান করিয়া নিন্দা-প্রশংসার মধ্যে প্রবেশ করেন, উহা তাহাদের মূর্খতামাত্র।

বিষ্ণু ও বৈষ্ণব বিষয়াশ্রয় ভেদে বিশেষধর্ম্মযুক্ত। সুতরাং বিষ্ণুর তাৎপর্য্য ও বৈষ্ণবের তাৎপর্য্যে ভেদ আছে জানিলে সমতার পরিবর্ত্তে বৈষম্য সেই স্থান অধিকার করে। এইরূপ বৈষম্য পাষণ্ডী ও নিন্দকগণের মধ্যেই প্রবল; কেন না, তাহারা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবকে ভিন্ন তাৎপর্য্যপর জানিয়া নিজ বিচারাধীন করে। বিষ্ণু-সেবা-বর্জ্জিত অহঙ্কার তাহাদিগকে 'প্রভু' সাজাইয়া বিষ্ণুবৈষ্ণবের সমতা ও বৈষম্য বিচার করে। **বিষয়াশ্রয়বোধাভাবই তাহাদের নিন্দা ও পাষণ্ড-প্রবৃত্তির জনক। তজ্জন্য বৈষ্ণব-মাত্রেরই শ্রীকৃষ্ণচরণ-ভজনে কৃষ্ণের লীলায় প্রবেশাধিকারের অভেদত্ব জানিলে জীবের ভজনের সুষ্ঠুতা হয়। পরিকর-বৈশিষ্ট্য-বিচার রহিত হইয়া ভগবানের যে নাম, রূপ ও গুণ-গ্রহণ, তাহাতে পরিকর-বৈশিষ্ট্যের উপযোগিতা না থাকায় জীবের ভগবদ্ভজনের সম্ভাবনা হইতে পারে না। তাই বলিয়া অবৈষ্ণবতাকে**

বা বিষ্ণুসেবা রাহিত্য-ধর্ম্মের যাজনকারীকে অবৈষ্ণব না জানিয়া বৈষ্ণব ভ্রান্তিতে অভেদ জানিলে ভগবদ্ভজনের সম্ভাবনা হয় না।

শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতে অভিন্ন দর্শন করিবার কথা বলিয়াছেন; কেন না, তাঁহারা উভয়েই সমচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট একই তত্ত্ব—মূল সঙ্কর্ষণ ও তদংশ মহাবিষ্ণু। উভয়েরই হৃদয় এক। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদের চিত্ত-বৃত্তি এক—তাঁহাদের হৃদয় এক। তাঁহাদের মধ্যে যাহারা আপাত বিরোধ দর্শন করেন, তাহারা সত্য হইতে ভ্রষ্ট হন। কিন্তু তাই বলিয়া ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর সিদ্ধান্ত হইতে ভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ যদি ঐসকল আচার্য্যের দোহাই দিয়া নিজদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে চাহেন, তবে সেখানে কোনপ্রকার সিদ্ধান্ত বিচার করা হইবে না, নিরপেক্ষতার ভাণে সিদ্ধান্তে অলসতা প্রদর্শন করা হইবে; এইরূপ বিচারও সমীচীন নহে। "সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস"—এই উক্তি সিদ্ধান্ত বিষয়ে নিরপেক্ষতাকে সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করিয়াছেন। ঐরূপ নির-পেক্ষতাই নাস্তিকতা। সিদ্ধান্ত শুনিব না, বিচার করিব না. শুনিলে বা বিচার করিলে আমাদের প্রচ্ছন্ন অসৎসাপেক্ষতার পুঁজিপাটা বিনষ্ট হইবে এই আশঙ্কায় যে নিরপেক্ষতার মুখোস পরিধান, তাহাই জীবের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণতম আত্ম-অমঙ্গল-বরণের অবস্থা।

সাপেক্ষতা-ধর্ম্মের মূলেই পুরুষোত্তমবাদ প্রতিষ্ঠিত। ভগবদ্ ভক্তগণ সকলেই সাপেক্ষধর্ম্মাশ্রিত। ব্রজবাসিগণ ও রূপানুগ-গণ

সর্ব্বাপেক্ষা সাপেক্ষধর্ম্মপর। যিনি যতটা বৈষ্ণবের পক্ষপাতী, তাঁহার ততটা বৈষ্ণবতা বা আস্তিকতা। যিনি বিষ্ণু হইতেও যতটা বৈষ্ণবের অধিক পক্ষপাতী, তিনি ততটা অধিক বৈষ্ণব। রূপানুগ-গণ বিষয়-বিগ্রহ হইতে আশ্রয়-বিগ্রহের অধিক পক্ষপাতী। শ্রীরূপমঞ্জরী, শ্রীরতিমঞ্জরী প্রভৃতি সেবক সম্প্রদায় বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা মূল আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর অধিক পক্ষ-পাতী। এই পক্ষপাতিত্ব যাঁহার যতটা অধিক, তাঁহাকে ততটা সেবাধর্ম্মে অধিক প্রতিষ্ঠিত বলা যায়। শ্রীরাধার পক্ষপাতী হইয়া শ্রীললিতাদি সখী ও তদনুগগণ চন্দ্রাবলীর বিপক্ষতা সাধনকেই তাঁহাদের সাধ্য বলিয়া বিচার করেন। চন্দ্রাবলীর পক্ষীয় শৈব্যাদি চন্দ্রাবলীকে কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ বা অভিমন্যুর পক্ষীয় জটিলাদি অভি-মন্যুকে শ্রীরাধার প্রিয়তম বলিয়া স্ব-স্ব পক্ষ সমর্থন করেন দেখিয়া 'দুঁহু পাল্লা ভারী"—এই বিচারে অপ্রাকৃত ব্রজবাসিগণ নিরপেক্ষ বা তৃতীয় পক্ষ থাকেন না। তাঁহারা প্রকৃত ভক্তিসিদ্ধান্ত বিচার করিয়া পক্ষপাতধর্ম্মকেই আদর করেন। বিপক্ষতার হাঙ্গামার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া নিরপেক্ষতার শান্তরস উপভোগ করিবার পিপাসা অভক্ত সম্প্রদায়ের কাম্য হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা কৃষ্ণভক্তসেবানন্দসিন্ধুর নিকট ব্রহ্মানন্দকে খাতোদকরূপে দর্শন করেন, তাঁহাদের নিকট ঐরূপ নিরপেক্ষতার আভাসও কালসর্পের ন্যায় মারাত্মক বলিয়া বিবেচিত হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু দামোদর-পণ্ডিতকে—

'নিরপেক্ষ নহিলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে।' (চৈঃ চঃ অ ৩।২৩)

—এই ব্যাজস্তুতি করিয়া শচীমাতার নিকট পণ্ডিতকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কোন বিধবা-ব্রাহ্মণীর বালককে আদর করিতেন দেখিয়া দামোদর পণ্ডিত মহাপ্রভুর নিরপেক্ষ সমালোচনা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শচীমাতা প্রাকৃত যোষিৎ নহেন বা মহাপ্রভুর দর্শনও প্রাকৃত যোষিদ্ দর্শন নহে, - ইহা শিক্ষা দিবার জন্য মহাপ্রভু দামোদর পণ্ডিতকে শচীমাতার নিকট রাখিয়াছিলেন।

নিরপেক্ষ-সমালোচনা ভাল এবং নিরপেক্ষ হইয়া ধর্ম্ম যাজন করাও ভাল। কিন্তু সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বা গুরুদেবকে নিরপেক্ষ সমালোচনার তৌলদণ্ডে ওজন (!) করিতে গেলে কি দুর্গতি হয়, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু রামচন্দ্রপুরীর আদর্শে প্রকাশ করিয়াছেন। রামচন্দ্রপুরী নিরপেক্ষ-সমালোচক হইয়া সন্ন্যাসীর মিষ্টদ্রব্য-ভোজন পতনের কারণ—এই বিচারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহ হইতে পিপীলিকা শ্রেণীর নির্গমন দেখিতে পাইয়া মহাপ্রভুকে জিহ্বা-লম্পট (!) পতিত (!) সন্ন্যাসী সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন ! শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী নিরপেক্ষতাধর্ম্ম আশ্রয় না করিয়া কেন সবিশেষ সাপেক্ষতাধর্ম্ম অবলম্বন-পূর্ব্বক "হা মথুরানাথ" বলিয়া ক্রন্দন করেন,—ইত্যাদি সমালোচনা করিয়া গুরুপাদপদ্মে অপরাধ করিয়াছিলেন। স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের একচেটিয়া কামদেবত্বকে নিরপেক্ষ তৌলদণ্ডে আরোহণ করাইবার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া অনেক অসুর ও মায়াবাদীর উদ্ভব হইয়াছে। অতএব নির-পেক্ষধর্ম্মের ক্ষুদ্র গণ্ডী একমাত্র আত্ম-অনর্থের অপনোদনে সীমাবদ্ধ

থাকিলেই মঙ্গলজনক হইতে পারে। গুরুদেব, মহাভাগবত-বৈষ্ণব বা ভগবানের সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতাকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিলে হিতে বিপরীত ফল হয়। এজন্য জীবের পক্ষে সর্ব্বদা শ্রীহরিগুরুর ও একান্ত শুদ্ধ-বৈষ্ণবের পক্ষপাতী হইয়া হরিভজন করাই শ্রেয়ঃ। সাপেক্ষতাকে নাস্তিক সম্প্রদায় গোঁড়ামি বলিয়া ঘৃণা করেন, করুন; তথাপি যেন আমরা কৃষ্ণবিদ্বেষগর্ভ নাস্তিকতাকে বরণ না করি।

—০—

শ্রীপ্রভূপদেশ

অধোক্ষজ-সেবাবিমুখ ক্রিয়াদক্ষতা বা নৈপুণ্য গৌড়ীয়মিশনে থাকিবার যোগ্যতা নহে। অধোক্ষজের সুখানুসন্ধান-প্রবৃত্তি থাকিলে পরতত্ত্বের সুখকর নৈপুণ্য স্বতঃই প্রকাশিত হয়। সেই নৈপুণ্যের সহিত দৈন্য স্বভাবসিদ্ধগুণরূপে প্রকটিত হয়। "উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম" অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবা-নিপুণ হইয়াও নিজের অযোগ্যতার সুতীব্র-অনুভূতি অধোক্ষজের সুখানুসন্ধানরত ব্যক্তিরই স্বরূপানুবন্ধী গুণ।

প্রাকৃত সদ্‌গুণ দম্ভদৈত্যের সহচর ও অনুচররূপে তামসিক ও রাজসিক প্রকৃতির ব্যক্তিগণের মধ্যেও থাকিতে পারে। তামসিক প্রকৃতির ব্যক্তিগণ রাক্ষসগণে গণিত; আর রাজসিক প্রকৃতির ব্যক্তিগণ অসুরগণে গণিত। দেবতা অপেক্ষা রাক্ষসগণের দান, অসুরগণের তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্যাদিগুণ খুব বেশী থাকিতে পারে, কিন্তু

উহাকে সাত্ত্বিক গুণ বলা যাইবে না। সাত্ত্বিক গুণ অবিদ্যা-বিনাশের দ্বারভূত। যাহা বিদ্যার উদয় করায়, তাহাই সত্ত্বগুণ; তাহা হইতে ভাগবত ধর্ম্মের আভাসমাত্র আরম্ভ হয়।

(১) ফলকামনা-ত্যাগ, (২) ঈশ্বরের সন্তোষচিন্তা ও (৩) দৈন্য —ভাগবতধর্ম্ম-বিদ্যালয়ের বর্ণপরিচয়-সদৃশ। এই তিনটি যাঁহাতে প্রকাশিত হইবে, তাঁহার দ্বারা পারমার্থিক সঙ্ঘের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে। ক্রিয়াদক্ষতা থাকিলেও পরমার্থ-বিরোধ হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত তিনটি লক্ষণ-ব্যতীত ক্রিয়াদাক্ষ্য পরমেশ্বরের সম্পর্কিত বস্তুর বিরোধী করিয়া তুলিবে। পরতত্ত্বের সন্তোষচিন্তার বাহ্য লক্ষণ বা নমুনা—ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিত্যাগ। যতক্ষণ-পর্য্যন্ত আমাদের পুরুষকারের অভিমান অর্থাৎ 'নিজে সব বুঝিয়া লইব' বা 'নিজের চেষ্টায়ই সব করিতে পারিব'—এইরূপ অভিমান প্রবল থাকে, ততক্ষণ-পর্য্যন্ত ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগ, দৈন্য ও ঈশ্বরের সন্তোষ-চিন্তা আসে না। নিজের অসুবিধা বা অযোগ্যতার উপলব্ধি না হইলে পরমেশ্বরের চিন্তা আসিতেই পারে না,—ইহাই পারমার্থিকের প্রথমমুখে একমাত্র অপরিত্যাজ্য যোগ্যতা বা গুণ। এই যোগ্যতাটি পরিহার করিয়া যিনি যতই কিছু করুন, তিনি ততটা নিজের ও পরের অনিষ্ট করিবেনই।

'স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ' (গী ২।৪০)—এই শ্রীভগবদ্বাণী হইতেও জানা যায় যে, ভাগবত-ধর্ম্মের স্বল্পই জীবকে ভয় হইতে ত্রাণ করে। শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও জানিতে পারি,—"ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ" (ভা ১১।২।৩৫)।

ফলাভিসন্ধানরাহিত্য ও পরমেশ্বর-চিন্তা হইতে সত্ত্বগুণ আরম্ভ হইল। বিষ্ণুর সন্তোষ-চিন্তাকারী ব্যক্তির দৈবাৎ পাপকার্য্য উপস্থিত হইলেও তাহা থাকিতে পারে না। —এখান হইতেই অনাদি বহির্ম্মুখ জীবের চরমকল্যাণ-লাভের সূত্রপাত আরম্ভ হয়। হৃদয়ের দ্বারা সেবকের পরিচয় না হইয়া যদি কেবল ইন্দ্রিয়ের দক্ষতা প্রভৃতির দ্বারা পরিচয় হয়, তাহাতে বিষময় ফল হইবে। ভগবৎসুখানুসন্ধানের দিকে আভাস-জাতীয় চেষ্টাই হইল—'কর্ম্মার্পণ'। এইটুকু যাহার না হইবে, তাহার পারমার্থিক সঙ্ঘে থাকিবার যোগ্যতাই হইবে না। শত-শত সভাসমিতির বিবরণী-নির্ম্মাণ বা কার্য্য-কুশলতার দ্বারা মায়া-জয় হয় না। পরমেশ্বরের সন্তোষ-চিন্তা যে সঙ্ঘে যতটুকু থাকিবে, ততটুকু তাহার মঙ্গলের দিকে অভিযান হইবে।

অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব তামসী রাক্ষসী প্রবৃত্তি ও রাজসী আসুর-প্রবৃত্তিতে নৈসর্গিকভাবে অভিনিবিষ্ট হইয়াছে। সত্ত্ব-প্রবৃত্তির নামই—'দৈব-প্রকৃতি'। এজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন,— "দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।" (গী ১৬৷৬)।

শ্রীবিষ্ণু দেবতার পক্ষপাতী, অসুর বা রাক্ষসের পক্ষপাতী নহেন। দেবতাগণ অসুর হইতে নৈতিকগুণে হীন হইতে পারেন। ইন্দ্র, চন্দ্র, বৃহস্পতি অনেক নীতি-বিগর্হিত কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন। দেবগুরু বৃহস্পতি যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা কিছুতেই নীতির দ্বারা সমর্থিত নহে; অথচ যিনি শ্রীকৃষ্ণের নিজ-বিগ্রহ অপেক্ষাও প্রিয়তর, সেই শ্রীউদ্ধব-মহারাজ সেই বৃহস্পতির শিষ্যত্বলীলা প্রকাশ

করিয়াছেন। দেবতাগণের 'সাত খুন মাপ' কেন হইল ? তাঁহারা বিষ্ণুর সন্তোষচিন্তা করেন—এজন্য ; অথচ এক একজন অসুর কম তপস্যা করে নাই ! তাহাদের তপস্যায় পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিয়াছে ! জীবজগতের বিচারে তাহাদের দান, ত্যাগ, বল ও পাণ্ডিত্য কম নহে। এমন অনেক অসুর আছে, যাহারা কখনও মিথ্যা কথা বলে নাই ; অথচ দেবতারা অনেক মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। সত্যধর্ম্মসেতু শ্রীবিষ্ণু কেন সেই দেবতার পক্ষে যান ? অসুরেরা ফল কামনা করে, বিষ্ণুর সন্তোষ-চিন্তা করে না ; দেবতারা ফল কামনা করেন না, বিষ্ণুর সন্তোষ-চিন্তা করেন। দেবতাগণের সত্ত্বগুণ আছে। মাধ্বমতে দেবতারা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্ত ; কিন্তু ভাগবতধর্ম্মের সিদ্ধান্তানুসারে তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ ভক্তের স্তরে স্থিত অর্থাৎ 'দৈব-প্রবৃত্তি' হইতেই 'ভাগবতধর্ম্ম' আরম্ভ হয়। শুদ্ধভক্তের সঙ্ঘ বা সম্প্রদায়ের কথা দূরে থাকুক্, যদি কাহাকেও সাধারণ পারমার্থিক হইতে হয়, তবে তাহাকে অন্ততঃ দেবতা হইতে হইবে,—ইহা ভাগবত-ধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন স্তর। যদি কোটি-কোটি সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎ বা 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' প্রভৃতি উচ্চারণ এবং কর্ম্মকুশলতাসহ প্রাণহীন ক্রিয়াকলাপ, গতানুগতিক 'গড্ডালিকা-প্রবাহে'র ন্যায় অরুচি, অশ্রদ্ধা, অহঙ্কারের আস্ফালন ও জড়াভিনিবেশ বজায় রাখিয়া অনুষ্ঠান করা যায়, তবে তাহাকে পরমাত্মা পারমার্থিক সঙ্ঘ হইতে নিশ্চয়ই বিতাড়িত করিবেন। ঐরূপ ব্যক্তি অধিক বিদ্বেষী ; স্পষ্ট বিরোধিগণ তত বিরোধি না-ও হইতে পারে।

পরমাত্ম-নারায়ণ-পুরুষ-অন্তর্যামীর 'সন্তোষাভাস' হইলে মঙ্গলের আরম্ভ হইল। ইহার পূর্ব্বে পরমার্থ বা নিঃশ্রেয়সের আলোক পাওয়া যায় নাই। ফল-কামনা-ত্যাগ ও পরমেশ্বরের সন্তোষচিন্তা থাকিলে ক্রিয়াকলাপে কিছু ভুল হইয়া গেলেও শ্রীবিষ্ণুই তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন। গোপবালকগণ খেলা করিতে করিতে অঘাসুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই-রূপ ভ্রমপ্রতিম ব্যবহার নিজেদের অমঙ্গলের কারণ হয় নাই; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পশ্চাতে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া-ছিলেন। তাঁহাদের এইপ্রকার মোহাভাস যোগমায়াই করাইয়া-ছিলেন। তাঁহাদের নিজেদের রক্ষার চিন্তা নাই; শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ-চিন্তা প্রবল বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের রক্ষার চিন্তা করিয়াছিলেন। মুক্তপুরুষগণের মস্তকে পদবিক্ষেপ করিয়া যাঁহারা বিচরণ করেন, ইহা তাঁহাদেরই কথা। শ্রীঅর্জ্জুন অনেক ভ্রান্তি-প্রতিম ব্যবহার করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন. শ্রীঅর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা ও মান ব্যর্থ হইতে দেন নাই।

শ্রীহ্লাদিনী-দেবীর দুইটি দিক্। এক দিকের দ্বারা তিনি ঈশ্বরের সুখবিধান করেন, আর এক দিকের দ্বারা জীবের মঙ্গল-বিধান করেন। মূলকথা—নিরপরাধ হওয়া চাই। নিরপরাধ হইলে হৃদয়ে দৈন্যের উদ্রেক হয়, নিজের অযোগ্যতা-উপলব্ধি হইতে আর্ত্তনাদ উপস্থিত হয়। যাঁহার আর্ত্তনাদ আছে, দুঃখ-মোচনের জন্য কায়মনোবাক্যে ইচ্ছা আছে, সেইরূপ ব্যক্তিরই মঙ্গল আরম্ভ হয়। কামুকতা হইতে অপরাধ হয়। মুমুক্ষা

পরমার্থরাজ্যে প্রবেশের প্রথম কথা।
(সাযুজ্যমুক্তিকাম নহে) পরমার্থরাজ্যে প্রবেশের প্রথম কথা।
যাহার অপ্রতিপত্তি অর্থাৎ নিজের মঙ্গলের চিন্তার প্রতি অত্যন্ত
ঔদাসীন্য আছে, তাহার কোনদিনই মঙ্গল হইবে না। আরুরু-
ক্ষুর ভ্রম হইতে পারে, বা বৈগুণ্য বা দোষ উপস্থিত হইতে পারে,
কিন্তু তাঁহার অপরিহার্য্য যোগ্যতাই হইবে—অন্যাভিলাষ-হীনতা,
দৈন্য ও ঈশ্বরের সন্তোষ-চিন্তা।

ভাগবতধর্ম্মের অনুশীলনের জন্য পারমার্থিক সঙ্ঘের আবশ্য-
কতা আছে, কেবল কর্ম্মকুশলতা পারমার্থিক সঙ্ঘের আদর্শ নহে।
ভাগবতধর্ম্ম-যাজনকারীর চেষ্টার মধ্যে কর্ম্মকুশলতার চরম আদর্শ
ও সর্ব্বাঙ্গীনতা আনুষঙ্গিকভাবেই প্রকট থাকে। ভাগবতধর্ম্ম—
নিরপেক্ষ। ভাগবতধর্ম্ম-যাজী তোষামোদকারী বা তোষামোদ-
প্রিয় নহেন। এজন্য ভাগবতধর্ম্ম-যাজনকারী অন্যান্য তথাকথিত
কর্ম্মি-জ্ঞানি-সঙ্ঘের ন্যায় চাঁদা-জীবী নহেন। তাঁহারা শ্রীবিষ্ণু-
সন্তোষপর মাধুকরী ভিক্ষা'র দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষময় জীবন
যাপন করেন ; শ্রীহরির শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণই তাঁহাদের একমাত্র
ব্রত ; তাঁহারা স্মৃতিরহিত কোন ক্রিয়া করেন না। চাঁদার মধ্যে
বহির্ম্মুখ বিষয়ীর বাধ্যবাধকতা আছে, অথবা পীড়ন-চেষ্টা আছে।
পীড়ন বা জুলুম দুই প্রকারে হয় ; এক-প্রকার—অভিশাপ-ভয়াদি
প্রদর্শন করিয়া অর্থ-সংগ্রহ, আর এক-প্রকার—তোষামোদ করিয়া
অর্থ-সংগ্রহ। তোষামোদ 'জুলুমে'র প্রকার-বিশেষ ; যেমন, তথাকথিত
অসহযোগ (Non-co-operation) হিংসানীতির (Violence-
এরই) প্রকার-বিশেষ। তোষামোদ—'মানদ-ধর্ম্ম' নহে, উহা

'গুপ্ত জুলুম'। মানদধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বেষ -'তোষামোদ'। মানদধর্ম্মটী—অলৌকিক; তাহার সমস্তই অলৌকিক। তোষা-মোদটি, কাপট্য ও হিংসাপূর্ণ প্রাকৃত ব্যাপার। প্রপঞ্চে প্রকা-শিত ভূতগ্রামে চেতনের তারতম্যানুসারে যে ঈশ্বরের স্ফূর্ত্তি ও সম্পর্ক-দর্শন. তাহাই 'মানদধর্ম্ম'।

মহতের কৃপা তোষামোদ অপেক্ষা করে না। নল-কুবর শ্রীকৃষ্ণোপাসক শ্রীনারদের কোন তোষামোদ করেন নাই; এমন কি, নলকুবরের অনুতাপলেশও উদয় হয় নাই, তথাপি নলকুব-রের প্রতি শ্রীনারদের অহৈতুকী কৃপা হইয়াছিল। ইহা এক-মাত্র শ্রীকৃষ্ণোপাসক মহতেই সম্ভব, অন্য শ্রীবিগ্রহের উপাসকে দৃষ্ট হয় না শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু যে কারারক্ষককে 'জিন্দাপীর' প্রভৃতি বলিয়া তাহাকে সাতহাজার মুদ্রা উৎকোচ দিয়াছিলেন, অথবা শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু যে 'সপ্তগ্রামে'র মোছলেম চৌধুরীকে 'সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ', 'জিন্দাপীর-প্রায়' প্রভৃতি বাক্য বলিয়া বিষয়ীর চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীগৌর-পাদপদ্মে মিলনের চেষ্টা; তাহা মায়ার প্রতি—মায়িক শঠতার প্রতি শঠতা-প্রদর্শন। "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্" (গী ২।৫০)। বাহিরে বিষয়ীর প্রায় ব্যবহার প্রকট করিয়া ইষ্টদেবের আনুকুল্য-বিধানের মূল উদ্দেশ্যে অন্তরে অনুরাগের আগ্নেয়গিরি লইয়া শ্রীশ্রীসনাতন-শ্রীশ্রীরঘুনাথ শ্রীশ্রীগৌরপাদপদ্মে মিলিত হইবার জন্য যে অখিল-চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা কিন্তু প্রাকৃত তোষামোদ নহে, তাহা অকৃত্রিম অনুকরণীয় শ্রীগৌরানুরাগ।

—০—

বিশুদ্ধ ভজন

"পড়িলে শুনিলে কভু কৃষ্ণপ্রাপ্তি নয়।
ভজিলে বিশুদ্ধভাবে তবে কৃষ্ণ পায়॥"

—কোন ভক্ত মহাজনের লেখনীতে এই উপদেশটী পাওয়া যায়। উপদেশটী নিগূঢ় সত্যমূলক। অনেকে অনেক পরিশ্রম করিয়া ভজন সাধন করেন, কিন্তু বহু আয়াসেও কোন সুফল উদয় হয় না। বিশুদ্ধ ভজন না হওয়াই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া বোধ হয়। কৃষ্ণ-ভজন-ব্যাপারে যে সমুদয় অশুদ্ধভাব এবং ক্রিয়া আছে, তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভজন করিতে পারিলেই বিশুদ্ধ ভজন হয়। অতএব সেই সমস্ত-অশুদ্ধ ভাব ও ক্রিয়া বিচার করিয়া পরিত্যাগ করা সকল ভজন-প্রয়াসীর আবশ্যক। বিশুদ্ধরূপে ভজন করিলে তাহার ফলে শুদ্ধভক্তি লাভ হয় এবং শুদ্ধা ভক্তির ফলেই ভগবানের শ্রীচরণ-লাভ হয়। তদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে না। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদ্বাক্য এইরূপ ;—

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মপ্রিয়ঃ সতাম্।
ন সাধয়তি মাং যোগো না সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥"

শ্রীমদ্রূপগোস্বামী শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ বলিয়াছেন,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

শ্রীকৃষ্ণ-সেবন ব্যতীত অন্য-অভিলাষশূন্য হইয়া এবং জ্ঞান-কর্ম্মাদির প্রতি স্বাধীন চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করাই শুদ্ধা ভক্তি। জ্ঞান ও কর্ম্ম যখন ভক্তির অনুগত হয়, তখন তাহার কোন দোষ থাকে না, কিন্তু তাহাদিগের প্রতি স্বাধীন চেষ্টা থাকিলে তাহারা ভক্তি-বিরোধী হইয়া পড়ে, তাহাতে ভজন বিশুদ্ধ হয় না। অতএব মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥"

বহু শাস্ত্রবচন অভ্যাস, বহু ধী-শক্তি, শাস্ত্রবিচারে বহু পাণ্ডিত্য—এই সকল দ্বারা কেহ অখিলাত্মা ভগবানকে লাভ করিতে পারেন না, যাঁহারা ভগবানের শরণাপন্ন—তাঁহাকেই যাঁহারা স্বীয় প্রভু বলিয়া বরণ করেন' ভগবান তাঁহাদিগের নিকট আত্মবিক্রয় করেন। তাৎপর্য্য এই যে, কেবল শাস্ত্র পড়িয়া বা সিদ্ধান্ত শুনিয়া কেহ ভগবৎ প্রসাদ লাভ করিতে সক্ষম হয় না। তাদৃশ জ্ঞান-কর্ম্ম প্রয়াস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই বিশুদ্ধ ভজনের মূল। তাহাতেই কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরম পুরুষার্থ লাভ হয়।

ভজন-কালে দুইটি অবস্থা আছে—অনর্থযুক্তাবস্থা এবং অনর্থমুক্তাবস্থা। যতদিন ভজনে অনর্থ-নাশ না হয়, ততদিন ভজন ন্যূনাধিক পরিমাণে অশুদ্ধ থাকে। সাধুসঙ্গে ভজন করিতে

করিতে সাধুকৃপায় অনর্থ বিগত হইলে ভজন বিশুদ্ধ হয়। জীবের অনর্থ চারি প্রকার—স্বরূপভ্রম, অসত্তৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য এবং অপরাধ। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস, ইহা না জানাই স্বরূপ-ভ্রমরূপ প্রথম অনর্থ। এই অনর্থ-ফলে নানারূপ উৎপাত জন্মিয়া ভজন বিশুদ্ধ হইতে দেয় না। জীব কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণ জীবের প্রভু, এই জগৎ ভগবৎশক্তিরূপা মায়া কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের কারাগারস্বরূপ এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের অভাব হেতু জীবে ব্রহ্মত্বের আরোপ, মায়া ব্রহ্মের ভ্রম এবং জগৎ মিথ্যা প্রভৃতি নানা প্রকার অসৎসিদ্ধান্তের উদয় হয়। তাহাতে কেহ মায়াবাদী, কেহ নির্ব্বিশেষবাদী, কেহ জ্ঞানী, কেহ যোগী এবং কেহ বা কর্ম্মী —এইরূপ নানা মতবাদী হইয়া ভজন অশুদ্ধ করিয়া ফেলে। তাহাতে কোনক্রমে জীবের মঙ্গল লাভ হয় না, পরন্তু অমঙ্গলই হইয়া থাকে। এইজন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভু কহিয়াছেন,—

> "প্রভু, কহে,—মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী।
> 'ব্রহ্ম', 'আত্মা', 'চৈতন্য' কহে নিরবধি॥
> অতএব 'কৃষ্ণনাম' না আইসে তার মুখে।
> মায়াবাদি-গণ যাতে মহাবহির্ম্মুখে।"

নির্ব্বিশেষবাদিগণ বলেন,—"ঈশ্বর নিরাকার।" ভগবানের নিত্য সচ্চিদানন্দঘন মূর্ত্তি তাঁহারা বিশ্বাস করেন না, কল্পিত মনে করেন। জীব ভজন-বলে অবশেষে ঈশ্বরে লীন হইয়া যাইবে, ইহাই তাঁহাদের

আশা। তখন জীবে ঈশ্বরে কোন ভেদ থাকিবে না। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে মহাপ্রভুর বাক্য এই,—

"ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড।
অদৃশ্য, অস্পৃশ্য, সেই হয় যমদণ্ড্য॥
যেই মূঢ় কহে—জীব ঈশ্বর হয় 'সম'।
সেই ত 'পাষণ্ডী' হয়, দণ্ডে তারে যম॥"

(চৈঃ চরিতামৃত)

জ্ঞানবাদিগণ শুষ্ক বৈরাগ্য, শাস্ত্রচর্চ্চা প্রভৃতি উপায় অবলম্বনে আত্মশুদ্ধির আশা করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"জ্ঞানী জীবন্মুক্ত-দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি 'শুদ্ধ' নহে কৃষ্ণ-ভক্তি বিনে॥
'শুষ্কজ্ঞানে জীবন্মুক্ত' অপরাধে অধো মজে।"

(চৈঃ চরিতামৃত)

যোগিগণ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম সহকারে আত্মা পরমাত্মার সংযোগ সাধন করেন, তাঁহারা অখিলাত্মা ভগবান্ কৃষ্ণ-চন্দ্রকে লাভ করিতে পারেন না। ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্র কহিয়াছেন,—

"জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণবশ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক—কৃষ্ণপ্রেমরস॥"

কর্ম্মিগণ কর্ম্মমার্গে নানা দেবদেবীর ভজন করেন, কিন্তু ভক্তি লাভ করিতে পারেন না। শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে প্রেম-ভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে॥"
(চৈতন্যচরিতামৃত)

এই সমস্ত দুষ্টমত পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত ভজন করিলেই বিশুদ্ধ ভজন হইতে পারে। জীব কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণ জীবের প্রভু, প্রেমই জীবের প্রয়োজন, প্রেমবলে কৃষ্ণ লাভ হয় এবং ভক্তি-ফলেই প্রেম উৎপন্ন হয়—এইরূপ জ্ঞানই বিশুদ্ধ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন জ্ঞান। এইরূপ জ্ঞানের সহিত ভজন করিলে ভজন বিশুদ্ধ হয় এবং বিশুদ্ধভজনের ফলস্বরূপ শুদ্ধা ভক্তি লাভ হয়।

জীবের দ্বিতীয় অনর্থ অসতৃষ্ণা। তাহা বহুবিধ। ভগবানের সেবা ব্যতীত যত কিছু বাঞ্ছা জীবের থাকে, সে সকলই অসতৃষ্ণা। ইহলোকে সুখৈশ্বর্য্য ভোগ, পরলোকে স্বর্গভোগ, মোক্ষসুখে লোভ—এই সমস্তই অসতৃষ্ণা। অসতৃষ্ণা থাকিলে কোন ক্রমেই ভজন বিশুদ্ধ হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"ভুক্তি-মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥"
(চৈতন্যচরিতামৃত)

কৃষ্ণভক্তগণ কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত অন্য প্রার্থনা করেন না। স্বর্গ ও মোক্ষ কৃষ্ণভক্তের নিকট নরকসদৃশ দুঃখপ্রদ বোধ হয়। পঞ্চবিধ মুক্তি ভগবান দিলেও ভক্তগণ তাহা স্বীকার করেন না। যথা—

"নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥

"সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥"

মোক্ষবাঞ্ছা জীবের অজ্ঞানতার চরম ফল। অজ্ঞ জীবের আপাত-মনোহর পরিণাম-ভয়ঙ্কর মোক্ষ, ভক্তির নিতান্ত বিরোধী তত্ত্ব। মোক্ষবাঞ্ছা হৃদয়ে থাকিলে কোন ক্রমে ভক্তি লাভ হয় না। শ্রীরূপের শিক্ষা এই,—

"ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

শ্রীচরিতামৃতে,—

"অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥"

সামান্য প্রতিষ্ঠাশা বা ভোগলালসার বশবর্ত্তী হইয়া জীব কপট ভক্ত হইয়া পড়ে, সেই সমস্ত দুরাশা ত্যাগ না করিলে কিরূপে বিশুদ্ধ ভজন হইবে? শ্রীমদ্দাস গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ।
কথং সাধু প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্ননু মনঃ॥"

প্রতিষ্ঠাশারূপিণী চণ্ডালিনী যতদিন হৃদয়-প্রাঙ্গণে নৃত্য করে, ততদিন পবিত্রস্বভাবা প্রেমদেবী তথায় কিরূপে আসিবেন? অতএব বহু যত্নে এই দুষ্টাশা হৃদয় হইতে দূর করা কর্ত্তব্য।

প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠা যত্ন সহকারে স্পর্শ না করাই ভাল। ইহাই শ্রীসনাতন
গোস্বামী প্রভুর উপদেশ,—

"কুর্য্যুঃ প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠায়া যত্নমস্পর্শনে বরম্।"

হৃদয়দৌর্ব্বল্য—জীবের তৃতীয় অনর্থ। অসতৃষ্ণা বৃদ্ধি হইতে
হইতে অসদ্বিষয়ে জীবকে এইরূপ অভিনিবিষ্ট করে যে, জীব
কোনও ক্রমে ভক্তিসাধন কর্ম্মগুলির আদর করিতে পারে না, পক্ষা-
ন্তরে ভক্তিসাধন কর্ম্মগুলি স্বভাবস্বরূপে পরিণত হয়। ইহাই
জীবের হৃদয়দৌর্ব্বল্য। এই অনর্থের ফলে অসৎসঙ্গ, কুটিনাটি,
বহির্ম্মুখাপেক্ষা প্রভৃতি বহু উৎপাতের সৃষ্টি হয়, তাহাতে ভজন
বিশুদ্ধ হইতে দেয় না, অসৎসঙ্গে নানারূপ অসদালোচনা হয়,
তাহাতে অসদ্বিষয়ে আসক্তি প্রবল হইয়া বিশুদ্ধ ভজনের অত্যন্ত
বিঘ্ন জন্মায়; অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা এই,—

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রী সঙ্গী - এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।।"

(চৈঃ চরিতামৃত)

হৃদয়দৌর্ব্বল্যজাত কুটিনাটি হইতে আদৌ বৈষ্ণবে জাতি-
বুদ্ধিরূপ মহান্ দোষ উপস্থিত হয়। আপনার জাতি; বিদ্যা বা
সম্ভ্রমগত অভিমানের উদয় হয়, তাহাতে বৈষ্ণব-অধরামৃত, চরণামৃত
ও পদরজে শ্রদ্ধা হয় না। বৈষ্ণবে প্রীতির পরিবর্ত্তে অশ্রদ্ধা দিন
দিন বৃদ্ধি হইয়া জীবকে অধঃপাতিত করে, তাহাতে ভজন-চেষ্টা
একেবারেই বিনষ্ট হয়। তজ্জন্য প্রভুর আজ্ঞা,—

"অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটিনাটি-পরিহরি' একান্ত হইয়া ॥"

(চৈঃ ভাগবত)

শ্রীল দাস গোস্বামীও বলিয়াছেন,—

"অরে চেতঃ প্রোদ্যৎকপটকুটিনাটিভরখর-
ক্ষরন্মূত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মানমপি মাম্।"

ওরে মন, কপটতা এবং কুটিনাটিরূপ মূত্রে স্নান করিয়া কি জন্য আমাকে এবং আপনাকে দগ্ধ করিতেছ? কুটিনাটি ত্যাগ না করিলে কিছুতেই সুখ হয় না। হৃদয়দৌর্ব্বল্য বশতঃ অনেক সময়ে ভজন-প্রতিকূল-ক্রিয়া বা সঙ্গত্যাগ করা যায় না। অসৎ-কার্য্যে বা অসৎসঙ্গে ভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধ জন্মে। তাহাতে ভজন অশুদ্ধ হয়। অতএব হৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া ভজনে উৎসাহ প্রকাশ এবং নিরপেক্ষতা রক্ষা করাই বিশুদ্ধ ভজনের সহায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ এই,—

"যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে ।।
'নিরপেক্ষ' না হৈলে 'ধর্ম্ম' না যায় রক্ষণে ॥"

(চৈতন্যচরিতামৃত)

অপরাধই—চতুর্থ অনর্থ। স্বরূপভ্রম হইতে অসত্তৃষ্ণা এবং অসত্তৃষ্ণার ফলে হৃদয়দৌর্ব্বল্য জন্মে। হৃদয়দৌর্ব্বল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অপরাধে পরিণত হয়। অপরাধ জন্মিলে বহু সাধনেও কোন ফল হয় না। যথা শ্রীচরিতামৃতে,—

"হেন কৃষ্ণ-নাম যদি লয় বহুবার ।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার ॥
তবে জানি, অপরাধ তাহাতে প্রচুর ।
কৃষ্ণ-নাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর ॥"

অপরাধ বহুবিধ হইলেও প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত হয়—বৈষ্ণবাপরাধ, সেবাপরাধ ও নামাপরাধ। বৈষ্ণবাপরাধ—যথা স্কান্দে,—

"হন্তি নিন্দন্তি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি ।
ক্রুদ্ধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্ ॥"

বৈষ্ণবকে হনন করা, নিন্দা করা, দ্বেষ করা, অভিনন্দন না করা, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা এবং বৈষ্ণব দর্শনে হর্ষযুক্ত না হওয়া—এই ছয়টি অপরাধে জীবের মহাপতন হয়। কোন ভজন-প্রয়াসীর যেন এই অপরাধ না হয়। সেবাপরাধ শ্রীমূর্ত্তি-সেবা সম্বন্ধেই বিচার্য্য। নামাপরাধ দশবিধ। (১) সাধু-নিন্দা,—যাঁহারা একান্তভাবে নামাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিন্দা বা দ্বেষ করা। তাঁহারা কেবল নাম-তত্ত্বই জানেন, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি কিছুই জানেন না, এরূপ মনে করিয়া তাঁহাদিগকে অবহেলা করিলেও অপরাধ হয়। (২) দেবান্তরে স্বতন্ত্র জ্ঞান অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, সর্ব্বেশ্বর, অন্যান্য দেবদেবী তাঁহার বিধিকর, কৃষ্ণকে ভজন করিলেই অন্যান্য দেবদেবীর ভজন হয়—এইরূপ বিশ্বাস না করিয়া, কৃষ্ণ একজন ঈশ্বর, শিব অন্য এক ঈশ্বর - এইরূপ স্বতন্ত্র শক্তিসিদ্ধ বহু ঈশ্বর কল্পনা করিলে নামাপরাধ হয়। (৩) গুর্ব্ববজ্ঞা—

যিনি নামতত্ত্বের সর্ব্বোৎকর্ষ শিক্ষা দেন, তিনি নামগুরু। যদি মনে করা যায়, তিনি নাম-শাস্ত্রেই বিশেষ ব্যুৎপন্ন, অন্য সাধন-বিষয়ে কিছুই জানেন না, তাহা হইলে অপরাধ হয়। সকল কর্ম্মের চরম ফল—নাম-তত্ত্বলাভ, তাহা যাঁহার হইয়াছে, তাঁহার অন্য কিছুই প্রয়োজন নাই, কিছু জানিতেও তাঁহার বাকি নাই। (৪) শ্রুতি-নিন্দা— বেদে নামের অনেক মাহাত্ম্য বলিয়াছেন, সেই সমস্ত নাম-মাহাত্ম্য-সূচক বেদবাক্যে অবিশ্বাসমূলক দ্বেষভাব বহন করিলে নামাপরাধ হয়। (৫) হরিনামে অর্থবাদ— অর্থাৎ রাম, কৃষ্ণ, হরি প্রভৃতি নাম কল্পিত, ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, কর্ম্ম নাই — এইরূপ মনে ভাবিলে অপরাধ হয়। (৬) নাম বলে পাপ,—নাম করিলে পাপ থাকিবে না, অথবা নাম করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্ত শুদ্ধ হইয়া আর পাপে রুচি থাকিবে না, আপাততঃ স্বার্থের জন্য একটী পাপ করিয়া লই, এইরূপ নামের ভরসায় যে পাপ করা যায়, তাহা বড় কঠিন অপরাধ। (৭) শুভকর্ম্ম-সাম্য—অর্থাৎ ধর্ম, ব্রত, তপঃ প্রভৃতি যেরূপ শুভকর্ম, নামও তদ্রূপ একটি শুভ-কর্ম্মবিশেষ, অতএব যে কোন একটি শুভকর্ম্ম আশ্রয় করিলে আত্মশুদ্ধি হইতে পারে, এইরূপ মনে করিয়া নামাশ্রয় না করা অপরাধ। (৮) প্রমাদ—নামে অনবধান অর্থাৎ ঔদাসীন্য, জাড্য ও বিক্ষেপ থাকিলে প্রমাদাপরাধ হয়। নামগ্রহণকালে নামের প্রতি উদাসীন হইয়া মুখে নাম ও মনে নানারূপ বিষয় চিন্তা করাই ঔদাসীন্য, নামগ্রহণে অরুচি এবং কতক্ষণে সংখ্যা-নাম শেষ হইবে—এইরূপ মনে করিয়া বারম্বার জপমালার সুমেরু প্রতি

কটাক্ষপাত প্রভৃতি জাড্যের লক্ষণ। প্রতিষ্ঠাশা বা শাঠ্যবশবর্ত্তী হইয়া নাম-গ্রহণই বিক্ষেপ। (৯) অজ্ঞ অশ্রদ্ধ ব্যক্তিকে নাম-মন্ত্রদান—অজ্ঞ ও অশ্রদ্ধজনের নিকট-নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া নামে তাহার বিশ্বাস হইলে তবে তাহাকে নাম-মন্ত্র প্রদান করা উচিত। গুরু সামান্য অর্থলোভে অযোগ্য শিষ্যকে নাম দিলে অপরাধে অধঃপতিত হন। (১০) অহং-মমভাব-নাম-মাহাত্ম্য জানিয়া শুনিয়াও বিষয়াসক্তির আধিক্যবশতঃ নাম-ভজনে প্রবৃত্ত না হওয়া বিশেষ অপরাধ। এই দশবিধ নামাপরাধ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে নামের ফলে প্রেম লাভ হয়। যথা, প্রভু-বাক্য—

"শ্রবণ কীর্ত্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় 'প্রেমা'।"
"নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।"

(চৈঃ চরিতামৃত)

কৃষ্ণনামানুশীলন ব্যতীত বৈষ্ণবের অন্য ভজন নাই, অন্য অঙ্গগুলি নামেরই সহচররূপে গৃহীত হয়। অন্যাভিলাষ, অন্য-দেব-পূজা এবং স্বাধীন জ্ঞান-কর্ম্ম-প্রয়াস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অপরাধ-শূন্য হইয়া নাম করিতে পারিলেই ভজন বিশুদ্ধ হয় এবং বিশুদ্ধ ভজনের ফলস্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম উদিত হয়। কৃষ্ণপ্রেম উদয় হইলেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে।

—০—

তোষামোদ ও মানদধর্ম্ম

লোকশিক্ষক শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর মানদধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করিবার প্রভূপদেশ প্রদান করিয়াছেন। চৌষট্টি-প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে "প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব" (চৈ চ ম ২২।১২০) এবং শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষার মধ্যেও "জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ অধিষ্ঠান" (চৈ চ অ ২০।২৫) প্রভৃতি উপদেশ পাওয়া যায়। অর্চ্চনকারী ব্যক্তির জন্যও ভূতা-দরের উপদেশ শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। 'ভূতাদর-রহিত অর্থাৎ প্রাণিমাত্রের প্রতি আদর বা সম্মান-রহিত হইয়া অর্চ্চনের অভিনয় করিলে তাহা বিড়ম্বনামাত্র, সেইরূপ অর্চ্চন ভস্মে ঘৃতাহুতি তুল্য।'—এরূপ উক্তি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। এইসকল শাস্ত্রবাক্য, প্রভূ-পদেশ, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগৌরপার্ষদগণের আচরণ কি সমস্বরে বহির্ম্মুখ-জীবমাত্রকে বহুমানন বা তাহাদিগকে তোষামোদ করি-বার নীতি শিক্ষা দিতেছে না? উন্মুখ ব্যক্তি বা সাধুর স্তব-স্তুতি সকলেই করেন। তাঁহারা নিত্য গুণী ও মানী; তাঁহাদিগকে মান প্রদান করিবার জন্য কোন নীতির আবশ্যক করে না। বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে (চৈ চ ম ১২।১৮২),

"কাকেরে গরুড় করে,—ঐছে কোন্ হয়?"

কাক—বিষ্ঠাভোজী, কর্ম্মফলবাধ্য নীচযোনিপ্রাপ্ত, অতিবদ্ধ সঙ্কুচিতচেতন জীববিশেষ; আর গরুড় শ্রীভগবৎপার্ষদ ও ভগবৎ-

সেবানুরক্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভু বিষ্ঠাভোজী বহির্ম্মুখ-জীবকেও ভগবৎ-পার্ষদরূপে পরিণত করেন।

এইসকল উপদেশ ও আচরণ দেখিয়া এরূপ অনুমিত হয় যে, বহির্ম্মুখ-জীবগণকে বহুমানন করা, তাহাদিগকে নানাপ্রকার চাটু-বাক্যে সম্মান প্রদান করা, তোষামোদ করা—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত মানদধর্ম্ম (?)।

মহাজনগণের আচরণের মধ্যে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তিতেও দেখিতে ও জানিতে পারা যায় যে, তাঁহারা কুক্কুর-চণ্ডাল পর্য্যন্ত প্রাণীকে বহুমান্য করিয়া দণ্ডবৎ প্রণামাদি করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন (চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।২৮-২৯),—

"ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর-চণ্ডাল অন্ত করি'।
দণ্ডবৎ করিবেক বহুমান্য করি'॥
এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম—সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্মধ্বজী, যা'র ইথে নাহি রতি।"
"প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্।"
"প্রবিষ্টো জীবকলয়া তত্রৈব ভগবানিতি॥"
(ভাঃ ১১।২৯।১৬)

'শ্রীভগবান্ স্বয়ংই জীবরূপ অংশ-দ্বারা সকল দেহে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন,—ইহা চিন্তা করিয়া কুক্কুর, চণ্ডাল, গো, গর্দ্দভ পর্য্যন্ত যাবতীয় জীবকে ভূপতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে।

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত-

সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা অন্তর্গত 'মানদমণ্ডলী'-নামে একটি সেবা-বিভাগ উন্মোচন করিয়াছিলেন। সেই মানদমণ্ডলীর বিশিষ্টা সেবা এই—'যাঁহারা ভগবানের বা ভগবদ্ভক্তের প্রিয় সেবা-কার্য্য করিবেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের সেবার নির্দ্দেশক যোগ্য সম্মান প্রদান করা।' ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও শ্রীধামপ্রচারিণী-সভায় বহু বিষয়ী ও জাগতিক আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তিকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোন না-কোন সেবায় যৎকিঞ্চিৎ উন্মুখ দেখিয়া তাঁহাদিগকে বহু ভক্তিসূচক উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকট-কালে প্রতি-বৎসর শ্রীধামপ্রচারিণী-সভায় বহু ব্যক্তি, সজ্জন ও সেবক ভক্তিসূচক নানা উপাধি বা নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই-সকল উদাহরণ ও আদর্শ মানদধর্ম্মই যে হরিকীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবের ধর্ম্ম, ইহা প্রমাণ করিতেছে।

মানদধর্ম্ম শ্রীহরিকীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবের ধর্ম্ম, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু মানদধর্ম্ম ও তোষামোদ কি এক?

প্রত্যেক জীবকে শ্রীভগবানের সহিত সম্পর্কিতরূপে দর্শন করিয়া তাহাকে যে যথাযোগ্য সম্মান-প্রদান,—ইহারই নাম 'মানদধর্ম্ম'। অন্তর্যামি-দৃষ্টি-রহিত হইয়া অর্থাৎ জীবের অন্তরে শ্রীনারায়ণ অন্তর্যামিরূপে বাস করিতেছেন,—এই দৃষ্টিতে এবং 'অন্তর্যামি-চালিত হইয়া জীব আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে'—এইরূপ অনুভবের সহিত অন্তর্যামীর সুখবিধানের জন্য যে প্রাণী

যেরূপ সম্মানের অধিকারী, তাহাকে সেইরূপ সম্মান না দিয়া যদি
কেবল জীবের বহির্ম্মুখতাকে বহুমানন করা যায়, নিজের কোন-
প্রকার অপস্বার্থ-সাধন বা উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য জীবের বহির্ম্মুখতার
স্তব-স্তুতি ও চাটুকারিতা করা যায়, তবে তাহাই 'তোষামোদ'।
তোষামোদে নিজের কোন অসৎ-স্বার্থসিদ্ধি অর্থাৎ লাভ, পূজা,
প্রতিষ্ঠা বা কোনপ্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অভিসন্ধি
আছে; আর মানদধর্ম্মে কেবলমাত্র অভীষ্টদেবের সুখানুসন্ধান
এবং অভীষ্টদেবের সুখানুসন্ধানকারীর অল্প-সেবাচেষ্টাকে বহু-
মাননমুখে আত্মদৈন্যময় অভীষ্ট-সেবায় উল্লাস, উৎকণ্ঠা ও প্রীতির
উত্তরোত্তর প্রগতির অনুসন্ধান আছে। যাঁহাদের চিত্ত শ্রীশ্রীগৌর-
কৃষ্ণের প্রীতিতে ভরপূর, সেই শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-প্রেমিক গুণগ্রাহী
অদোষদর্শী মহাজনগণ যে বিষয়ী, দুরাচার প্রভৃতির কদর্য্যস্বভাব
বা দুরাচারত্ব না দেখিয়া অতি ঈষৎ উন্মুখতাকে, অন্ততঃ একটুকু
কর্ম্মার্পণ চেষ্টাকেও বহুমানন করেন,—ইহা নিজের কোন অপ-
স্বার্থমূলক লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠা-সিদ্ধির উদ্দেশক নহে বলিয়া ও এক-
মাত্র তাঁহাদের প্রাণকোটি-সর্ব্বস্ব অভীষ্টদেবের সুখানুসন্ধান-
তাৎপর্য্যপর বলিয়া 'তোষামোদ'-পদবাচ্য নহে, পরন্তু ইহাই
'মানদ-ধর্ম্ম'। এইভাবেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল ঠাকুর
ভক্তিবিনোদ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা ও শ্রীশ্রীধাম প্রচারিণী-
সভায় স্ব-স্ব প্রাণকোটি-সর্ব্বস্ব শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীণনাভাসের
প্রতি ঈষৎ উন্মুখ ব্যক্তিগণকেও মান দান করিয়াছেন।
বহির্ম্মুখ জীব সমস্ত ক্রিয়া-কলাপ, অর্থ, বিত্ত, চিত্ত, দেহ, পরিজন

—সমস্ত বস্তুকে কেবলমাত্র নিজভোগের একচেটিয়া উপকরণ করিয়া রাখিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করিতেছে। যাঁহাদের কর্ণে মহতের বাণী অতি সামান্যও প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা অতি আংশিক ও সাময়িকভাবে তাঁহাদের সেই নৈসর্গিক চিত্ত, বিত্ত ও কায়শাঠ্যকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া পরদুঃখ-কাতর শ্রীশ্রীগৌরসেবা-সর্ব্বস্ব শ্রীগৌরজনগণ উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। এই যে জীবের সামান্য কর্ম্মার্পণ-চেষ্টারূপ শ্রীগৌরহরির গ্রীণনাভাস, তাহা সর্ব্বনিম্নস্তরের ভাগবতধর্ম্ম হইলেও নিজ-প্রভুর প্রতি বিমুখ-জীবের ঘাড়-ফিরান কার্য্য বা পরমার্থ-মন্দিরের দ্বারে প্রবেশের দিকে অতি প্রাথমিক-চেষ্টা মনে করিয়া গুণগ্রাহী মহদ্‌গণ বহুমানন করেন। এই গুণগ্রহণ-বৃত্তিতে বৈষ্ণবতা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু জীব যদি শ্রীগৌরপ্রেমিকগণের মানদানরূপ এই কৃপাকে মহতের আশীর্ব্বাদ ও কৃপারূপে বরণ না করিয়া উহাকে ভোগ করিবার অর্থাৎ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার সম্ভার বা প্রতীকরূপে গ্রহণ করে, তবে কৃপার পরিবর্ত্তে তাহা মায়া, দম্ভ বা বঞ্চনা হয়। যেরূপ 'মায়া'-শব্দে কৃপা ও দম্ভ (কাপট্য) উভয়ই বুঝায়, তদ্রূপ মহতের কৃপাই তখন বঞ্চনা হইয়া পড়ে। কর্ম্মার্পণের অভিনয় করিয়া যখন বিজ্ঞাপন বা প্রস্তরফলকে নিজের কর্ম্মবীরত্বের চিত্র মুদ্রিত বা খোদিত দেখিবার অভিলাষ হয়, তখন আর তাহা কর্ম্মার্পণ বা 'ভাগবতধর্ম্ম'-পদবাচ্য থাকে না, তাহা কর্ম্মফল আত্মসাৎ বা ভোগ করিবার চেষ্টায় পরিণত হয়।

শ্রীগৌরপ্রেমিকের চিত্তবৃত্তি ও কর্ম্মার্পণ করিবার নামে কর্ম্মফল

আত্মসাৎ করিবার প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য-স্বরূপ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির জন্য যে ব্যক্ত ও অব্যক্ত আগ্রহ—এই দুই চিত্তবৃত্তির মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীগৌরপ্রেমিক কাহাকেও 'ভক্তি-ভূষণ,' 'বিদ্যাভূষণ,' মহামহোপদেশক,' 'ভক্তিব্রত,' 'গৌরসর্ব্বস্ব' প্রভৃতি শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া নিজের শ্রীগৌরপ্রীতিরই পরিচয়প্রদান-পূর্ব্বক মানদধর্ম্ম-বিশিষ্ট হইলেন; আর যে ব্যক্তি মহতের ঐ-প্রকার কৃপাকে সার্টিফিকেট্ বা প্রশংসাপত্র, অথবা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার প্রতীকবিশেষরূপে গ্রহণ করিয়া প্রচ্ছন্ন দাম্ভিক হইয়া পড়িল, হৃদয়ে নিজের অযোগ্যতার উপলব্ধি দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইবার পরিবর্ত্তে প্রিয়শ্রবা বিষয়বিগ্রহের অবৈধ অনুকরণে নিজের প্রশংসা শুনিবার জন্য যাহার চিত্ত ও কর্ণ উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল, অথবা কপট-দৈন্যের আবরণে ও সেবার অভিনয়ে চিত্ত অন্য অভিসন্ধিতে আসক্ত হইল, যাহার কর্ম্মার্পণ-চেষ্টা ক্রমশঃ মহতের কৃপাশীর্ব্বাদ-মণ্ডিত হইয়া ক্রমভক্তিমার্গে বিচরণ করিতে করিতে অহৈতুকী অপ্রতিহতা নির্গুণা ভক্তির দিকে অভিসার না করিল, যাহার চিত্তে অভীষ্ট-বস্তুর সুখানুসন্ধানময় আবেশ ও ধ্রুবানুস্মৃতির উদয় না হইল, তাহা হইলে জানিতে হইবে, সেই ব্যক্তি মহতের কৃপাশীর্ব্বাদ ও মানদ শ্রীগৌরজনের অহৈতুক কৃপা-লাভের পরিবর্ত্তে নিজ দুর্ভাগ্য-ফলেই বঞ্চিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বিষ্ঠাভোজী বায়সের বিষ্ঠা-ভোজন-প্রবৃত্তি অটুট রাখিয়া তাহাকে গরুড় করেন নাই। আত্মদৈন্যের গঙ্গা-

প্লাবনে যাঁহাদের চিত্ত হইতে সমস্ত জড়মল বিদূরিত হইয়াছে এবং সেই স্বচ্ছ-হৃদয়ে শ্রীগৌরপ্রেমের সুরধুনীস্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছে, তাঁহাদের আদর্শরূপে কোন শ্রীগৌরজন দৈন্যমুখে শ্রীগৌরহরির মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"সার্ব্বভৌম কহে,—আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।
তোমার প্রসাদে মোর এ সম্পৎ-সিদ্ধি॥
মহাপ্রভু বিনা কেহ নাহি দয়াময়
কাকেরে গরুড় করে, ঐছে কোন্ হয়?
তার্কিক-শৃগাল-সঙ্গে ভেউ-ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি 'কৃষ্ণ', 'হরি'॥
কাহাঁ বহির্ম্মুখ তার্কিক-শিষ্যগণ-সঙ্গে।
কাহাঁ এই সঙ্গসুধা-সমুদ্র-তরঙ্গে!!"

(চৈঃ চঃ মঃ ১১।১৮৩-১৮৪)

একদিকে যেমন মানদশিরোমণি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় উদ্ভাসিত হইয়া শ্রীসার্ব্বভৌম দৈন্যের প্রস্রবণমূর্ত্তি হইয়াছেন; আর একদিকে যিনি মান দান করিয়াছেন, সেই প্রভুও নিজ-জনকে উপলক্ষ করিয়া জীবের নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রীতির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া কৃষ্ণপ্রীতিই যে জীবের নিত্য-স্বভাব এবং মহদ্গণ যে জীবকুলকে সেই স্বভাবে উদ্বুদ্ধ দেখিবার জন্য সতত ব্যাকুল, জীবকে কৃষ্ণপাদপদ্মে অঞ্জলি দিবার জন্যই তাঁহাদের অখিল-চেষ্টা ও তদন্তর্গতই মানদধর্ম্ম, বিপ্রলম্ভরসাশ্রিতেরই মানদধর্ম্ম স্বাভাবিক—ইহা শিক্ষা দিয়াছেন,—

"প্রভু কহে,—পূর্ব্বে সিদ্ধ কৃষ্ণে তোমার প্রীতি।
তোমা-সঙ্গে আমা-সবার হইল কৃষ্ণে মতি॥"
(চৈঃ চঃ মঃ ১২।১৮৫)

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু লিখিয়াছেন,—

"ভক্ত-মহিমা বাড়াইতে, ভক্তে সুখ দিতে।
মহাপ্রভু বিনা অন্য নাহি ত্রিজগতে॥"
(চৈঃ চঃ মঃ ১২।১৮৬)

অতএব যেস্থানে নিত্যসিদ্ধ মানদধর্ম্মবিশিষ্ট মহতের মান-
দানরূপ কৃপাভাসকে জীব বরণ করেন, সেস্থানে জীবের চিত্ত
দৈন্যের দ্বারা আপ্লুত হয়। অতএব 'মানদধর্ম্ম' আর 'তোষামোদ'
বা চাটুকারিতা এক নহে। মানদধর্ম্মের ছলে নিজ অপস্বার্থ-
সিদ্ধির উদ্দেশ্যে যে বহির্ম্মুখ বা বিষয়ী ব্যক্তিকে তোষামোদ,
তাহার ন্যায় নীচ-বৃত্তি ও বিষয়বিষ্ঠা লেহন করিবার দুর্দ্দমনীয়
পিপাসা আর কিছুই নাই। তোষামোদ বা চাটুকারিতাকে
"প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে"—এই বৈধী ভক্তির
প্রতি সম্মান ত' বলা যাইবেই না, পরন্তু তোষামোদের
ন্যায় জীবের প্রতি উৎপীড়নের এরূপ প্রচ্ছন্ন অবৈধচেষ্টা আর
কিছু আছে কি না, সন্দেহ। কারণ, তোষামোদ সর্ব্বাপেক্ষা
বড়-রকমের জুলুম। বিষয়ীর আসক্তির বস্তু স্ত্রী, পুত্র বা বিষয়-
বৈভবের বিনাশ হইবে,—এই ভয় বা কোনরূপ অভিশাপের
বিভীষিকা দেখাইয়া এক শ্রেণীর সাধুনামধারী, বিষয়িগণের নিকট
হইতে অর্থ বা দ্রবিণাদি শোষণ করে; ইহা স্পষ্ট জুলুম। আর
বিষয়ীকে তোষামোদ করিয়া স্ত্রৈণ বা বৃষলীপতির অর্থ-বিত্ত দোহন

করিবার উদ্দেশ্যে কখনও তাহার কামিনীকে তোষামোদ এবং কখনও বা কামুক বিষয়ীর যে স্তব-স্তুতি করা হয়, তাহা প্রচ্ছন্ন জুলুম। নাস্তিক বিষয়ী অনেক সময় স্পষ্ট জুলুমকে পরিহার করিতে পারে, কিন্তু সাধুর সজ্জায় সজ্জিত ব্যক্তিগণ তোষামোদের দ্বারা যে প্রচ্ছন্ন জুলুম করে, তাহার মোহন-জালে নাস্তিক বহির্ম্মুখও বদ্ধ হইয়া পড়ে। কারণ, বহির্ম্মুখ ব্যক্তিমাত্রই প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠার বুভুক্ষু ; সুতরাং প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠার বুভুক্ষুর সম্মুখে যে ব্যক্তি একগ্রাস অধিক বিষ্ঠা উপস্থিত করিয়া দেয়, সে ব্যক্তি কখনও মানদ-ধর্ম্মযাজী নহে। প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা-লেহনের জন্য সর্ব্বদা ঐ ব্যক্তির জিহ্বা লেলিহান বলিয়াই সে বিষয়ীকে প্রতিষ্ঠা দান করিতে উদ্যত হয় এবং বিষয়ীকে ঐরূপভাবে পীড়ন করিয়া তামসী ও রাজসী ভক্তির প্রশ্রয় দান করে। কারণ, শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

"অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্‌ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ॥"

(ভাঃ ৩।২৯।৮)

যে সক্রোধ ও উদরভেদবাদী নির্দ্দয় ব্যক্তি হিংসা, দম্ভ বা মাৎসর্য্য সঙ্কল্প করিয়া আমার প্রতি ভক্তির অভিনয় করে, সেই ব্যক্তি 'তামস-ভক্ত' নামে অভিহিত হয়।

"বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা।
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ্‌যো মাং পৃথগ্‌ভাবঃ স রাজসঃ॥"

(ভাঃ ৩।২৯।৯)

যে পৃথগ্‌ভাব (অর্থাৎ আমা হইতে অন্যত্র বিষয়াদিতে স্পৃহাযুক্ত) ব্যক্তি বিষয়-সমূহ, প্রতিষ্ঠা ও অর্থবিত্ত সঙ্কল্প করিয়া

অর্চ্চাদিতে আমার অর্চ্চন করে, সে 'রাজস-ভক্ত' নামে কথিত।

তোষামোদকারী অপর প্রাণীকে বাহিরের দিকে 'মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব'—এই উপদেশের ছলনা লইয়া তাহার প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা আচরণ করে অর্থাৎ তাহাকে কর্ম্মার্পণরূপ ভাগবতধর্ম্মের মহত্ত্ব শিক্ষা দিবার পরিবর্ত্তে তাহাকে ট্যাব্‌লেট্ (tablet) বা প্রস্তরফলক, উপাধি বা সার্টিফিকেট্ প্রভৃতির লোভ দেখাইয়া তাহার উন্মুখতার অতি প্রাথমিক-চেষ্টাকে হত্যা করে এবং কোন ব্যক্তি পরতত্ত্বের দিকে একটুকু মাত্র ঘাড় ফিরাইয়াছে, সেই সুযোগে সেই ব্যক্তির গলা কাটিয়া দিয়া (তোষামোদরূপ খড়গের দ্বারা) হিংসা করিয়া থাকে এবং কাপট্য ও মাৎসর্য্যের প্রশ্রয় দিয়া নিজে প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা-লেহনে অতৃপ্তকাম হইয়া সংরম্ভী অর্থাৎ ক্রোধযুক্ত থাকে। ক্রুদ্ধ তোষামোদকারী সেই তামসিক শক্তি-পূজকের অভিনয়কারী দস্যু ও বাটপাড়গণের ন্যায় পরমার্থের পথের দ্বারে প্রথম পদবিক্ষেপেচ্ছু ব্যক্তিগণকে তোষামোদ—খড়্গের দ্বারা বিনাশ করিয়া থাকে। তোষামোদকারিগণ নিজেরা অদ্বিতীয়-বিষয় অদ্বয়জ্ঞানের শ্রীপাদপদ্ম হইতে পৃথক্ হইয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি-বিষ্ঠার প্রতি স্পৃহাযুক্ত; সুতরাং অন্যকেও তাহাদের ভাণ্ডারের মাল অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠার দুর্গন্ধা দ্বারা তৃপ্ত করিয়া নিজে-দের বিষ্ঠার ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে চাহে, ইহা জঘন্যতম বণিগ্-বৃত্তি।

শ্রীগুরুসেবার ছলে, ভিক্ষাদি সংগ্রহের নামে, মানদধর্ম্ম যাজন করিবার ছদ্মবেশে বস্তুতঃ নিজের লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠার ভাণ্ডার

বর্দ্ধন করিবার উদ্দেশ্যে যে বহির্ম্মুখতার তোষামোদ, তাহা কখনও মানদধর্ম্মী গুরুসেবক বা হরিকীর্ত্তনকারীর কৃত্য নহে। কোন-কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, গুরু বা আচার্য্যের ছদ্মবেশ-পরিহিত, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠার ভিক্ষুক ব্যক্তিগণ বিষয়ী ও দুরাচার শিষ্য-ব্রুবগণের দুরাচারিতার তোষামোদ করিয়া নরক-পথের যাত্রী হয়। এই-সকল কার্য্য—মানদধর্ম্ম নহে। শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বা শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কখনও তোষামোদকে 'মানদধর্ম্ম' বলেন নাই। যাঁহারা সেইসকল শ্রীগৌরপ্রেমিকের চিত্তবৃত্তির অতি সামান্য দিগ্‌দর্শনেরও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন। কিন্তু প্রেমিকগণের চিত্তবৃত্তির সেই উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া যাহারা কৃপাকে মায়া ও দম্ভরূপে বরণ করিয়াছে, তাহাদের নির্ঘৃণ্যতম দুর্ভাগ্যের সংস্পর্শে কোন জীব পতিত না হয়, এজন্য অহৈতুক জীবদুঃখকাতর অবঞ্চনার অভূতপূর্ব্ব-অবতার ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ-পুরী গোস্বামি-ঠাকুর শ্রীগৌরপ্রেমিক শ্রীগুরুপাদপদ্মদ্বয়ের আদর্শের অবৈধ অনুকরণ হইতে স্বয়ং বিরত থাকিয়া স্নিগ্ধ সেবকগণকে মঙ্গলের পথে টানিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীধামপ্রচারিণী-সভায় বা শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভায় উপাধি-প্রদানের প্রথা দেখিতে না পাইয়া অব্যক্তবাগ্‌বেগশালী কেহ কেহ মনে মনে ভাবিতে পারেন,—"সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই! শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার প্রধান কার্য্যটি উঠিয়া গেল, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার মানদমণ্ডলী-বিভাগ-যাহা সমস্ত বিভাগের শীর্ষদেশে অবস্থিত ছিল, তাহা লুপ্ত হইল;

সুতরাং মানদধর্ম্ম বা হরিকীর্ত্তনকারীর ধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্ম গৌড়ীয়-সম্প্রদায় হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল!"

তোষামোদপ্রিয় ও তোষামোদকারী হিংসক, দাম্ভিক, সমৎসর, ও বঞ্চক। তামসী-রাজসী প্রকৃতির ব্যক্তিগণের এইরূপ চিত্তবৃত্তি স্বাভাবিক। মানদধর্ম্ম-যাজন ও তাহার সংস্পর্শে আসিবার উভয়তই ফল—নিজের অযোগ্যতার তীব্রতম উপলব্ধির সহিত হরিকীর্ত্তন। যিনি অমানী অর্থাৎ নিজের প্রতিষ্ঠাশার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ও লজ্জাশীল, তথা সমস্ত প্রতিষ্ঠা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-নখচ্ছটায় সতত সন্দর্শনকারী এবং যিনি কেবল নিজের হরিভজন হইল না, "সবে কৃষ্ণ ভজন করে,—এইমাত্র জানে" (চৈঃ চঃ অঃ ৩।১৩৩), তিনি মানদধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া অপরকে মান দান করেন এবং তাঁহার মানদানরূপ কৃপাশীর্ব্বাদ-শক্তিসঞ্চারে যে ব্যক্তি প্রকৃত-প্রস্তাবে অভিষিক্ত হইতে পারেন, তাঁহাতেও সেই অতিমর্ত্ত্যদীনতা প্রকাশিত হয়। মহাভাগবতের সর্ব্বত্র কার্ষ্ণ দর্শনরূপ মানদানের মধ্যে বহির্ম্মুখতার প্রতি চাটুকারিতা নাই, কোন হিংসা নাই, কোন-প্রকার অন্যাভিলাষময় অভিসন্ধি নাই।

তোষামোদের মধ্যে দালালি-বুদ্ধি, পাটোয়ারিবুদ্ধি ও বঞ্চনা-বৃত্তি আছে; অভক্তকে প্রতিষ্ঠা দিয়া, বিষ্ঠার ক্রিমিকে কঞ্চির আগায় করিয়া কল্পিত স্বর্গে উঠাইয়া তাহাকে অবৈধভাবে পীড়ন বা হিংসা করিবার অভিসন্ধি আছে। অমানি-মানদ শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর শ্রীল রঘুনাথদাস প্রভুকে তাঁহার পূজ্য পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে মহাপ্রভুর মানদ-ধর্ম্মের

ব্যাঘাত হয় নাই। যেহেতু তিনি বিষয়ীকে ভাগবতোত্তম বা শুদ্ধবৈষ্ণব বলিয়া তোষামোদ করেন নাই, সেইহেতু শ্রীমহাপ্রভুকে মানদধর্ম্মের লঙ্ঘনকারী বলা যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথকে বলিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ অঃ ৬।১৯৭-১৯৮),—

"তোমার বাপ-জেঠা – বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া।
সুখ করি' মানে বিষয়-বিষের মহা-পীড়া।।
যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়।
শুদ্ধবৈষ্ণব নহে, বৈষ্ণবের প্রায়॥"

দৈন্যের মূর্ত্তি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু—যিনি আপনাকে "পুরীষের কীট হইতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ" (চৈঃ চঃ আঃ ৫।২০৫) প্রভৃতি বাক্যে জীবজগৎকে দৈন্য শিক্ষা দিয়াছেন, তিনি মানদ ধর্ম্মের ছলে সত্যকথা গোপন বা কোন সম্প্রদায়বিশেষকে তোষামোদ করিয়া নিজের প্রতিষ্ঠাকে বহুমানন করেন নাই। সেই অমানী, মানদ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু লিখিয়াছেন (চৈঃ চঃ আঃ১০।৮৯),

"পশ্চিমের লোক-সব মূঢ় অনাচার।"

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন আধুনিক প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা-লেহনকারী কপটী প্রাকৃত সাহিত্যিকগণের ন্যায় "তুম্‌ভি চুপ্, হাম্‌ভি চুপ্"-নীতি অবলম্বন করিয়া, অথবা নিজের প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠার ভাণ্ডারবৃদ্ধির জন্য অপর প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠাভোজীর তোষামোদ করিবার নীতি অবলম্বন করিলে প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠার ক্রিমি-কীট প্রাকৃত সাহিত্যিক-সমাজে অধিক সম্মান লাভ করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি বিষয়-বিষ্ঠার কীড়াগণের স্তবস্তুতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া

নিজ-অভীষ্টদেবের অকপট সেবা করিয়াছেন। এজন্যই অমানি-
মানদধর্ম্মের শিক্ষকশিরোমণির দাস-সূত্রে তিনি শ্রীনিত্যানন্দ-
নিন্দককে একাধিকবার "তবে লাথি মারেঁ। তা'র শিরের উপরে"
বলিতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত হন নাই। কারণ, শ্রীগৌরপ্রেমিকগণ
জানেন,—তোষামোদ মানদধর্ম্ম নহে।

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের অহৈতুকী কৃপায় শ্রীগৌরজনের
অবঞ্চনাময়ী কৃপার এইরূপ আদর্শ প্রতিমুহূর্ত্তে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ
করিবার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে বলিয়া আপনাকে ধন্যাতিধন্য
মনে করিতেছি। 'তোষামোদ' বলিয়া কোন শব্দ যাঁহার অভি-
ধানে নাই, অথচ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অকৃত্রিম ও অতিমর্ত্ত্য
স্তুতিতেই যাঁহার সমগ্র সত্তা সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত, সেইরূপ কোন অনি-
র্ব্বচনীয় মহাপুরুষ বহির্ম্মুখ লোকের প্রাণে আপাততঃ উদ্বেগ-
প্রদানের অভিনয় করিয়াও তাহার সর্ব্বোত্তম কল্যাণ বিধান ও
নিজপ্রাণকোটি সর্ব্বস্বের সুখবিধান করিতেছেন। শ্রীশ্রীল প্রভু-
পাদ অনেক সময়ই বলিতেন, বিশেষতঃ "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য
সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্" (ভা ১১।২৬।২৬)—এই শ্লোকের ব্যাখ্যা-
কালে সকল সময়ই বলিতেন,—'অনাদিবহির্ম্মুখ জীবের হৃদয়ে
মর্ম্মান্তিক ব্যথা প্রদান করিয়াও তাহার মঙ্গল করিতে হইবে।"
মহাপুরুষের বাণীর মধ্যে এই বাস্তব সত্য সম্প্রকাশিত ছিল;
কিন্তু আমার ন্যায় দুর্ভাগা সেই আলোক-বর্ত্তিকার নিম্নে ছায়ারূপে
অবস্থান করিয়া তোষামোদকেই মানদধর্ম্ম, কৃপাকেই মায়া ও দম্ভ
বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে! এই আত্মবঞ্চনা হইতে আমাকে

রক্ষা করিবার জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম পুনরায় আর এক অভিনব-মূর্ত্তিতে অর্থাৎ কেবল তাঁহার বাণীর মধ্যে নহে, তাঁহার সমস্ত আচার ও আদর্শের মধ্যে জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয়তর্পণ-পিপাসাকে উপমর্দ্দিত করিয়া অভীষ্টদেবের সুখানুসন্ধান-সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন। সেবার অভিনয়কারীকে তোষামোদ করিবার জন্য যে-সকল বহুরূপী অস্ত্র আছে এবং তন্মধ্যে বণিগবৃত্তির যে মোহন-বিদ্যা লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহার সর্বপ্রকার প্রচ্ছন্ন-স্বরূপ তিনি উদ্ঘাটন করিয়াছেন। যে শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে বঞ্চনা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি শিষ্যকে তোষামোদ বা তদনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠা-দ্রবিণাদি প্রদান করেন। শ্রীপ্রহ্লাদের ভাষায়—"ন সভৃত্যঃ স বৈ বণিক্" (ভা ৭।১০।৪) যাহাকে স্নিগ্ধ শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন, তাহাকেই তিনি অমায়ায় শাসন করিয়া থাকেন। কাজেই শিষ্যব্রুবকে তোষামোদ, সতীর্থব্রুবকে তোষামোদ, মানব-সমাজকে তোষামোদ, জাগতিক প্রতিষ্ঠাশালীকে তাহাদের প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠার লেশে লুব্ধ হইয়া যে তোষামোদ, স্ত্রৈণকে তোষা-মোদ, বিষয়ীকে তোষামোদ, ভণ্ডকে তোষামোদ, ভক্তিমাতার ধর্ষণ-প্রয়াসীকে তোষামোদ, গুর্ব্বপরাধীকে তোষামোদ, বৈষ্ণবা-পরাধীকে তোষামোদ, নামাপরাধীকে তোষামোদ, ধামাপরাধীকে তোষামোদ যে কেবল বিষয়বিষ্ঠার কুণ্ডে নিমজ্জিত হইবার লোলু-পতা এবং তাহা হইতে মানদ-ধর্ম্মের অমৃতসিন্ধু বহু বহু দূরে অবস্থিত,—ইহা আমরা এই মহাপুরুষের শিক্ষায় প্রাপ্ত হই।

—০—

ওজন ও অনুকরণ

আর্‌বী ভাষায় 'রজন্' শব্দের অর্থ 'পরিমাপ করা'। বহির্ম্মুখ মানবমাত্রেরই 'পরিমাপ' করার বুদ্ধি ও অনুকরণ করিবার প্রবৃত্তি বদ্ধমূল নিসর্গরূপে পরিণত হইয়াছে। প্রকৃতিকে যিনি যত অধিক পরিমাণে পরিমাপ ও তাহার অনুকরণ করিতে পারেন, তিনি জগতে তত অধিক বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিত বলিয়া প্রচারিত হ'ন। প্রকৃতিকে পরিমাপ ও তাহার অনুকরণ করিবার বুদ্ধির মধ্যে এতটা মাদকতা রহিয়াছে যে, সেই মাদকতার বশীভূত হইয়া মানব অপ্রাকৃত বস্তুরও পরিমাপ ও অনুকরণ করিবার ধৃষ্টতা করে। মানব প্রকৃতিকেই পরিমাপ করিতে গিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে, প্রকৃতির অনুকরণ করিতে গিয়া তাহার অষ্টপাশে আবদ্ধ হয়; আর অপ্রাকৃত-তত্ত্বকে পরিমাপ ও অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিতে গেলে যে তাহার কি দশা হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না; তথাপি অপ্রাকৃত-বস্তুকে পরিমাপ ও অনুকরণ করাই বহির্ম্মুখতার চিরন্তন স্বভাব।

ওজন বা পরিমাপ করিবার যন্ত্র মানবের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক, যে মস্তিষ্ক প্রকৃতির মাল-মশলার দ্বারা নির্ম্মিত। মস্তিষ্কের তৌলদণ্ডে যাহা ওজন করা যায়, তাহা সবই 'প্রাকৃত'। আবার প্রাকৃত সকল ব্যাপারও সকলের মস্তিষ্কের তৌলদণ্ডে পরিমাপ করিবার সমান যোগ্যতা নাই। আবার সমস্ত প্রাকৃত-বস্তুও মস্তিষ্কের তৌলদণ্ডে ওজন করা যায় না। পৃথিবীতে কত পরিমাণ ধূলিকণা আছে,

তাহার ওজন এ পর্য্যন্ত প্রাকৃত মস্তিষ্ক করিতে পারে নাই। প্রাকৃত মস্তিষ্ক রুদ্র-শক্তি হইতে ঋণ করিয়া 'আণবিক বোমা' বা পাশুপতাস্ত্র আবিষ্কার করিতে পারে সত্য, কিন্তু পৃথিবীতে কতগুলি অণু-পরমাণু, ত্রসরেণু অবস্থিত রহিয়াছে বা কোন্ সময় উহার কতগুলির আবির্ভাব-তিরোভাব হইতেছে তাহা এখন পর্য্যন্ত ওজন করিতে পারে নাই। এখনও পর্য্যন্ত প্রাকৃত মস্তিষ্ক কোন জীবকে জীবনীশক্তি দান করিতে পারে নাই, কেবল জীবনী-শক্তি হরণ করিবার কৌশল আবিষ্কার করিতেছে। সুতরাং মস্তিষ্কের তৌলদণ্ডে প্রাকৃত-বস্তুসকলও সম্পূর্ণভাবে ওজন করা যায় না। প্রাকৃত মস্তিষ্কের তৌলদণ্ড ভাঙ্গিতে পারে, কিন্তু গড়িতে পারে না; আর রক্ষা করিতে ত' পারেই না। অথচ সেই মস্তিষ্ক অপ্রাকৃতকে পরিমাপ করিবার জন্য স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে,— ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের কথা।

লঘু মানব গুরু-নরোত্তমকে ওজন করিতে চাহে। যুগমানবের পরিভাষায় যাঁহারা 'মহামানব' বা 'অতি-মানব', তাঁহাদিগকেও ওজন করিবার পূর্ণ শক্তি মানবে দৃষ্ট হয় না; আর যাঁহারা মহা-পুরুষ বা পুরুষোত্তমের কায়ব্যূহ, তাঁহাদিগকে ওজন করিবার ও অনুকরণ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি হৃদয়ে উদিত হইলে জীবের যে পতন অবশ্যম্ভাবী ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। অনেক সময় আমরা মুখে লঘু বা শিষ্য অভিমান করিয়া গুরু বা প্রভুকে ওজন করিয়া থাকি। মুখে দৈন্যের আবরণ দিয়া, আনুগত্যের কাচ কাচিয়া, অন্তরে সর্ব্বক্ষণ গুরুবস্তুকে ওজন করি এবং গুরুর উপদেশের আনুগত্য না করিয়া তাঁহার সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র আচরণের অবৈধ অনুকরণ করি;

ইহার ফল যে কি বিষময়, তাহা লোকশিক্ষক শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর নিজ পার্ষদের দ্বারা লীলা করাইয়া শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র শ্রীশ্রীল রায়-রামানন্দ প্রভুকে ওজন করিবার প্রাক্‌লীলা দেখাইয়াছিলেন; রামচন্দ্রপুরী. তাঁহার গুরুদেব শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরীপাদকে ওজন করিতে গিয়া স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরকে পর্য্যন্ত ওজন করিবার দুর্ব্বুদ্ধি করিয়াছিলেন! যেখানে ওজন করিবার বুদ্ধি. সেখানে গুরুবুদ্ধি নাই, প্রীতির কথা ত' না-ই। মহাভাগবতবর শ্রীগুরুপাদপদ্ম একমাত্র প্রীতির পাত্র,—এইরূপ জ্ঞান ও অনুভব যাহার নাই. তাহারই মধ্যে ওজন ও অনুকরণ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হয়। মহাভাগবতের ক্রিয়ামুদ্রা মাপিতে গেলে মায়ার অন্ধকূপে পতিত হইতে হয়। প্রীতির পাত্রের প্রতি 'মাপা'-বুদ্ধি থাকিতে পারে না। মহাভাগবতের ক্রিয়ামুদ্রা শ্রীকৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যপর বলিয়া নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি বা যুক্তির দ্বারা উহাদিগকে মাপিতে গেলে তথায় প্রীতি বা আরাধনা-দেবী দূরে পলায়ন করেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামিপ্রভু ঈশ্বরগণের সম্বন্ধে যে কএকটী উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে ওজন ও অনুকরণ প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত ব্যক্তিরই পরমমঙ্গল-লাভের সম্ভাবনা আছে। 'পরমমঙ্গল' বলিতে 'প্রেমভক্তি', আর 'অমঙ্গল' বলিতে অপরাধ, হৃদয় কাঠিন্য বা সংসার।

শ্রীশুকদেব বলিতেছেন,—

"ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্‌যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্‌॥
ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ॥
কুশলাচরিতেনৈষামিহ স্বার্থো ন বিদ্যতে।
বিপর্য্যয়েণ বানর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো॥"

(ভা ১০।৩৩।২৯-৩২)

অগ্নি সর্ব্বভুক্‌ হইয়াও যেরূপ দোষভাক্‌ অর্থাৎ অপবিত্র হ'ন না, তদ্রূপ সমর্থবান্‌ তেজস্বী পুরুষদিগেরও ধর্ম্ম মর্য্যাদালঙ্ঘন-প্রতিম ও জীবের পরিমিত বুদ্ধির অতীত কার্য্যে যে সাহস দৃষ্ট হয়, তাহা দূষণীয় নহে। প্রশ্ন হইতে পারে,—'তাহা হইলে শ্রেষ্ঠগণ যাহা আচরণ করেন, অন্যান্য ব্যক্তি তাহারই অনুগমন করিয়া থাকে,—এই ন্যায়ে অসমর্থগণও ত' সমর্থগণের অনুকরণ করিতে ধাবিত হইবে?' তদুত্তরে বলিতেছেন,—ঈশ্বর ব্যতীত ঐরূপ আচরণ কেহ দেহের দ্বারা দূরে থাকুক্‌, মনের দ্বারাও কখনও করিবেন না। রুদ্র ব্যতীত অন্য কেহ সমুদ্রোত্থ বিষ পান করিলে যেরূপ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, মূঢ়তাহেতু যদি কেহ ঈশ্বরের আচরণের অনুকরণ করে, সেও তদ্রূপ বিনষ্ট হয়। তাহা হইলে কিরূপে সদাচারের প্রমাণ পাওয়া যাইবে? সাধুগণের আচারই ত' সদাচার? যদি সাধুগণের আচরণেরই অনুবর্ত্তন করিতে না পারা গেল, তবে ত' 'সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তন' কথাটি বৃথা হইয়া যায়? তদুত্তরে বলিতেছেন,—'ঈশ্বরগণের বাক্য বা উপদেশই সত্য; তাঁহাদের আচরণ কখনও কখনও তদ্রূপ।

অতএব যে-যে আচরণ তাঁহাদের উপদেশের অবিরুদ্ধ, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাই আচরণ করিবেন। সাধক জীবের প্রতি ঈশ্বরগণের যে-সকল উপদেশ, সেইসকল উপদেশের বিরুদ্ধ কোন আচরণ সাধকজীব কখনই অনুবর্ত্তন করিবেন না। বুদ্ধিমান্ হইয়া ঈশ্বরের উপদেশের অবিরুদ্ধ আচরণ করিতে হইবে, উহার অন্ধ অনুকরণ বা ঈশ্বরগণের প্রতিযোগী ভাবিয়া তদ্রূপ আচরণ করিতে গেলে পতন ও অপরাধ অবশ্যম্ভাবী। প্রশ্ন হইতে পারে,—'ঈশ্বরগণ এইরূপ সাহসিক কার্য্য অর্থাৎ জীবের পরিমিত বুদ্ধির অতীত, ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত আচরণ কেন করেন ? তাঁহারা উহা না করিলেই ত' সাধক-জীবের কোনপ্রকার অসুবিধা হয় না ?' তদুত্তরে বলিতে-ছেন,—'ঈশ্বরগণের জন-সংগ্রহার্থ যে ধর্ম্মানুষ্ঠান, তদ্দ্বারা ইহলোকে বা পরলোকে কোন স্বার্থ নাই এবং ধর্ম্মবিপর্য্যয় অর্থাৎ পরমেশ্বরের ইচ্ছায় অধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারাও কোনপ্রকার অনর্থ উৎপন্ন হয় না।'

প্রশ্ন হইতে পারে,—'এইরূপ অবস্থায় ঈশ্বরকল্প মহাপুরুষগণের জগতে না আসিলেই বা ক্ষতি-বৃদ্ধি কি ? আর তাঁহাদের বাক্য ও আচরণের মধ্যে যখন পার্থক্য, তখন সেইরূপ আচারহীন উপদেষ্টার দ্বারা জগতের কি কল্যাণ হইতে পারে ? বরং মহাজনের বাণীতে ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচারে দেখা যায়,—

"আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।"

"আপনে আচরে কেহ, না করে' প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥

'আচার' 'প্রচার'—নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি—সর্ব্বগুরু, তুমি—জগতের আর্য্য।।"

(চৈঃ চঃ অঃ ৪।১০২-১০৩)

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে—অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষগণ যদি জগতে অবতীর্ণ না হইতেন, তবে শ্রীভগবানের বাণী কীর্ত্তিতই হইতে পারিত না এবং ভগবদ্রাজ্যের সংবাদও আর কেহ বহন করিয়া আনিতে পারিতেন না; জীবের অনাদিবিমুখতা কিছুতেই দূরীভূত হইত না; শ্রীভগবানের কৃপা জগজ্জীবের নিকট পৌঁছিত না। অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষগণ পরতত্ত্বের দূত। পরতত্ত্বের কৃপা একমাত্র তাঁহাদিগকেই বাহন করিয়া জগতে অবতীর্ণ হন। তাঁহারা সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, এজন্য তাঁহারা ঈশ্বর। তাঁহাদের এই সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসের নামই 'ভক্তি' বা তাঁহাদিগকে গুরুরূপে বরণ। যাঁহারা পরতত্ত্বের দূতকে, কৃপার বাহনকে ঈশ্বর বা দেবতা, আত্মা বা প্রেষ্ঠ বলিয়া বরণ করেন, তাঁহারাই গুরু-দেবতাত্মা হইয়া অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ ও প্রেমভক্তির অধিকারী হইতে পারেন। সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ঈশ্বরে—দেবতায়, গুরুতে বা আত্মাতে অর্থাৎ প্রীতির পাত্রে কখনও 'মাপা'-বুদ্ধি আসিতে পারে না। তাঁহার আচরণগুলি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যপর; তাহা বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়সুখতাৎপর্য্যপর অথবা মস্তিষ্কের যুক্তি বা তৌলদণ্ডের সঙ্গতিপর হইবে,—এইরূপ নহে। লোকশিক্ষক-লীলাভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'স্ত্রী-পরশ হইলে আমার হইত মরণ' (চৈঃ চঃ অঃ ১৩।৮৫)—এই উক্তিতে একরূপ শিক্ষা;

আবার অন্য সময় অন্য আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। আদিবস্থা এক স্ত্রীলোক প্রভুর স্কন্ধে পদার্পণ করিয়া শ্রীজগন্নাথ-দর্শন করিতে-ছিলেন ; তখন গোবিন্দ ঐ স্ত্রীকে নামাইতে চেষ্টা করিলে মহাপ্রভু তাহাকে নিবারণ করিলেন ; তখন আর স্ত্রী স্পর্শের আশঙ্কা বা নীতি নাই। প্রভুর এই দুই শিক্ষাই শ্রীকৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যপর ; মস্তিষ্কের বিচারে মহাপ্রভুর উক্ত বাক্য ও আচরণে পার্থক্য লক্ষিত হইতে পারে।

একদিকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাক্যে—'রাজদর্শন বিষভক্ষণ-সম' ; "বিরক্ত সন্ন্যাসী তেঁহো রহেন নির্জ্জনে। স্বপ্নেও না করেন তেঁহো রাজদরশনে॥" (চৈঃ চঃ মঃ ১০।৮) অথচ সেই বিষয়ীর পুত্রকে 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ'-নীতি-অনুসারে আলিঙ্গন অথবা মহা-রাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রকেই পরবর্ত্তিকালে আলিঙ্গন—আপাত-দৃষ্টিতে নিজ বাক্যের বিরুদ্ধ আচরণ বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু ভক্ত-ভাবাঙ্গীকারলীলাকারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐ আচরণ যে শ্রীকৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যলীলাপর, তাহা মাপাবুদ্ধি বা ওজন-করা-বুদ্ধির লোক ধরিতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদিবস্থা নারীর স্পর্শ বা বিষয়ী রাজার স্পর্শ হয় নাই। তিনি যে স্ত্রী ও বিষয়ীর আকার হইতে সাধক-জীবকে সতর্ক হইতে বলিয়াছেন, সেই আকারই শ্রীমন্মহাপ্রভু দর্শন করেন না। তিনি দেখিয়াছেন—আদিবস্থা অর্থাৎ 'আদি' বা 'শৃঙ্গার' রসের বশীভূতা গোপীর আকার। তাই গোপীর কিঙ্করী-অভিমানে তাঁহার পদস্পর্শ-লাভ ও শ্রীশ্যাম-সুন্দর-মুরলীবদন শ্রীগোপীনাথের নয়নোৎসব বিধান করাইয়াছেন।

তিনি বিষয়ী রাজার পুত্রের আকার দর্শন না করিয়া শ্যামলবরণ কিশোরবয়স পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিতেই উদ্দীপ্ত হইয়াছেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্রকে আলিঙ্গনকালেও বিষয়ী রাজার আকার দর্শন করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানকারিণী বিরহতপ্তা গোপীগণের স্মৃতিতেই বিভাবিত হইবার লীলা প্রকট করিয়াছেন। সুতরাং বাহিরের আকার দেখিয়া যাহারা ওজন করিবে বা উহার অনুকরণ করিতে যাইবে, সেইসকল অনীশ্বরগণের মৃত্যু অনিবার্য্য। শ্রীরাম-রায়ের দেবদাসী-সেবার আকার দেখিয়া কিন্তু শ্রীরাম-রায়ের চিত্তবৃত্তি বুঝিতে না পারিয়া শ্রীপ্রদ্যুম্ন-মিশ্র যে ওজন করিবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা সাধক-জীবের প্রতি শিক্ষার আলোকস্তম্ভরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। শ্রীরাম-রায়—ঈশ্বর। সেই ঈশ্বরের অনুকরণ করিতে গেলে অনীশ্বরগণের পতন অনিবার্য্য। শ্রীনিত্যানন্দ-ভৃত্য শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন,—

"মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিলু তোমারে।"

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৬।১২৩)

সেই শ্রীনিত্যানন্দ-ভৃত্য তাঁহার প্রভু ও ঈশ্বর শ্রীগুরুপাদপদ্মকে যেমন ওজন করেন নাই, তেমন অনুকরণও করেন নাই। অনুকরণ করার নাম শ্রীগুরুপদাঙ্কানুসরণ বা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তন নহে। ঈশ্বরকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ওজন করিবার দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইলেই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাঁহার অনুকরণ করিবার প্রবৃত্তিও হয়।

গুরুদেবের অনুকরণ করা অর্থে তাঁহার সহিত পাল্লা দেওয়া, আপনাকে তাঁহার সমকক্ষ অর্থাৎ তাঁহারই ন্যায় ঈশ্বর বলিয়া কল্পনা করা ; ইহা অপেক্ষা অপরাধ আর নাই। কেহ কেহ মনে করেন ও প্রচার করেন যে, তাঁহারা আপনাদিগকে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের সমকক্ষ মনে না করিলেও দুর্ব্বলতাবশতঃ গুরুদেবের বাক্য অপেক্ষা আচরণের অধিক অনুকরণপ্রিয় হইয়া পড়েন। কেহ বা অজ্ঞাত-ক্রমে ঈশ্বরগণের আচরণের অনুকরণকারী হয়। বস্তুতঃ ইহা দুর্ব্বলতা নহে, ইহা অপরাধের পরিপক্ক ফল। অন্তরে অন্তরে ঈশ্বরের উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া আধ্যক্ষিক দৃষ্টিতে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র আচরণকে পরিমাপ করিতে গিয়া যে অপরাধের বীজ বিষবৃক্ষ-রূপে পল্লবিত হইতে থাকে, তাহা মহতের স্বতন্ত্র ও সাহসিক আচরণের অনুকরণের প্রতীক হইয়া বহুদিনের সুদৃঢ় ভিত্তিযুক্ত সেবাসৌধের বিরাট্ আকারকেও ধূলিসাৎ করিয়া দেয়। এজন্য শ্রীশুকদেব পুনঃ পুনঃ মহতের বাক্যের অবিরুদ্ধ আচরণকে অনু-বর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু বাক্যের বিরুদ্ধ স্বতন্ত্র সাহসিক আচরণকে অনুকরণ করিতে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়াছেন। শ্রীগৌরহরি "এক রামানন্দের হয় এই অধিকার। তা'তে জানি অপ্রাকৃত-দেহ তাঁহার।" (চৈঃ চঃ অঃ ৫।৪১)—এই বাক্যের দ্বারা ঈশ্বর শ্রীরামানন্দের আচরণ অনীশ্বরগণকে ওজন অনুকরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

মহতের এইপ্রকার বাক্য ও স্বতন্ত্র আচরণের মধ্যে যে পরস্পর পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহা আচারহীন প্রচার বা সরাগ-বক্তার

পরোপদেশে পাণ্ডিত্য নহে। ইহার দ্বারা মহতের ঈশ্বরত্ব, সর্ব্ব-তন্ত্রস্বতন্ত্রত্ব, গুরুত্ব ও প্রভুত্বই মুক্তপ্রগ্রহ-বৃত্তিতে প্রকাশিত হয়। 'কর্ত্তৃমকর্ত্তৃমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থঃ' যিনি, তিনিই প্রভু, তিনিই গুরু, তিনিই ঈশ্বর। যদি মহতের দ্বারা এইরূপ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতা প্রকাশিত না হইত, যদি তিনি ক্ষুদ্র জীবের বা শিষ্যের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের বিচারের আসামীই হইতেন, তবে তাঁহাকে 'ঈশ্বর' বলা যাইত না, তিনি মায়িক জীবমাত্র হইতেন ; কিন্তু তিনি মায়াধীশের দূত, তিনিও মায়ার অতীত। তাঁহাকে মাপা যায় না। 'মীয়তে অনয়া ইতি মায়া'। মহতের ক্রিয়ামুদ্রা মাপা যায় না। বিরাটের অংশাংশকেই সম্পূর্ণ মাপা যায় না, আর যিনি বিরাটের অতীত তাঁহাকে মাপিবার ধৃষ্টতা করিতে গেলে মায়াজালে বদ্ধ হইতে হয়। কিন্তু পৃথিবীতে ইহার অপব্যবহার হইতে পারে ও হইয়া থাকে। যাহারা 'ঈশ্বর' নহে, সেইসকল ব্যক্তিও ঈশ্বরের কাচ কাচিয়া ও অনুকরণ করিয়া সাহসিক স্বতন্ত্র আচরণ করিয়া থাকে। ঐ সকল তাহাদের আত্মেন্দ্রিয়তর্পণমূলক ; উহাতে শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধান নাই। ঐসকল ময়ূরপুচ্ছধারী বিষ্ঠাভোজী বায়সের স্বরূপ প্রকাশিত হইতে বেশীদিন লাগে না।

অজ্ঞ শরণাগত ব্যক্তি মঙ্গল লাভ করিতে পারে, কিন্তু ওজন-কারী ব্যক্তি কখনই মঙ্গল লাভ করিতে পারে না ; সে অপরাধী, নাস্তিক হইয়া পড়ে, অথবা অনুকরণকারী ভণ্ড হইয়া যায়। শ্রীশ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন জগতের জীবকে একটী মহামূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন,—

"অধমজনের যে আচার, যেন ধর্ম্ম।
অধিকারি-বৈষ্ণবেও করে' সেই কর্ম্ম॥
কৃষ্ণ কৃপাতে সে ইহা জানিবারে পারে।
এ সব সঙ্কটে কেহ মরে, কেহ তরে'॥
সবে ইথে দেখি এক মহাপ্রতিকার।
সবারে করিব স্তুতি বিনয়-ব্যবহার॥
অজ্ঞ হই' লইবেক কৃষ্ণের শরণ।
সাবধানে শুনিবেক মহান্তবচন॥
তবে কৃষ্ণ তা'রে দেন হেন-দিব্যমতি।
সর্ব্বত্র নিস্তার পায়, না ঠেকয়ে কতি॥"
(চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।৩৮৮-৯২)

—০—

সাধুসঙ্গের প্রণালীবিচার

সঙ্গ হইতে স্বভাব। যে ব্যক্তি যাহার সঙ্গ করে, তাহার তদ্রূপ স্বভাব হইয়া উঠে। পূর্ব্বজন্মের সঙ্গরূপ কর্ম্মদ্বারা জীবের যে স্বভাব গঠিত হয়, তাহা আধুনিক জন্মের সঙ্গদ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং সঙ্গই মানব-স্বভাবের মূল। অতএব কথিত হইয়াছে যে,—

"যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্গুণঃ।"

স্ফটিক-মণি যে-কোন বর্ণের নিকট থাকে, তাহাতেও সেই বর্ণ প্রতিভাত হয়; তদ্রূপ যে পুরুষ যে পুরুষের সঙ্গ করে, তাহাতে তদ্বৎ গুণগণ প্রতিভাত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন,—

"সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে ॥"

(শ্রীভাঃ ৩।২৩।৫৫)

অসজ্জনের সঙ্গ করিলে ঘোরসংসাররূপ ফলপ্রাপ্তি হয়। কে অসৎ, কে-বা সৎ,—এ বিচার না করিলেও সঙ্গফল অবশ্য লাভ হয়। সাধুলোকের সঙ্গ করিলে নিঃসঙ্গত্বরূপ ফলোদয় হয়। অসৎসঙ্গ-সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন,—

'সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ম্ ॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ ॥"

(শ্রীভাঃ ৩।৩১।৩৩-৩৪)

সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, হ্রী, যশঃ, ক্ষমা, শম, দম ও ভগ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য—এসমস্তই যে অসৎসঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেই অসাধু, অশান্ত, মূঢ় ও যোষিৎক্রীড়ামৃগদিগের সহিত সঙ্গ নিতান্ত শোচনীয় জানিয়া একেবারেই পরিত্যাগ করিবে।

কেবল অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিলেই যথেষ্ট হইবে না। যত্নপূর্ব্বক সৎসঙ্গ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। যে সকল সাধুজনের সঙ্গ করিতে হইবে, সেই সাধুগণের লক্ষণ বলিতেছেন,—

"তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রব: শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূর্ষণাঃ ॥
মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টা: শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।
তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্মদ্গতচেতসঃ ॥
ত এতে সাধব: সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেম্বথ তে প্রার্থ্য: সঙ্গদোষহরা হি তে ॥"

(শ্রীভাঃ ৩।২৫।২১, ২৩-২৪)

শ্রীকপিলদেব কহিলেন,—হে মাতঃ! তিতিক্ষাযুক্ত, কারুণিক, সর্ব্বদেহীর সুহৃৎ, অজাতশত্রু, শান্ত সাধুগণ সাধু-ভূষণ। শুদ্ধ-ভক্তদিগেরই এইপ্রকার স্বভাব। ভক্তগণ মদ্গতচিত্ত; সুতরাং কর্ম্ম, জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গযোগগত বহুবিধ কষ্টাভ্যাস করেন না। সহজে মদাশ্রয়-কথাদ্বারা মার্জ্জিতঅন্ত:করণে পরস্পর হরিকথা বলেন ও শ্রবণ করেন। হে সাধ্বি! সর্ব্বসঙ্গবিবর্জিত সেই সাধু-গণ সঙ্গদোষ নাশ করেন। তুমি তাঁহাদের সঙ্গ প্রার্থনা কর।

আমরা যে-কোন বেশ দেখিয়া কোন ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া স্থির করিব না। পরচর্চ্চা, পরনিন্দা—এ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াও আমরা পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ না-দেখিলে কাহাকেও সাধু বলিয়া গ্রহণ করিব না। কলিকালে সাধুর বিচার একেবারে উঠিয়া যাইতেছে। দুঃখের বিষয় এই যে, যাহাকে-তাহাকে বাহ্যিক বেশ দেখিয়া সাধু বলিয়া সঙ্গ করতঃ আমরা সকলেই ক্রমশ কপটী হইয়া পড়িতেছি। আমাদের এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। সাধু অনেক পাওয়া যায় না। সাধুসংখ্যা আজকাল এত অল্প

হইয়াছে যে, বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া ও বহুদিন অনুসন্ধান করিয়া একটি প্রকৃত সাধু পাওয়া দুর্ল্লভ হইয়াছে।

মহাদেব দেবীকে কহিলেন,—হে ভগবতি! সহস্র সহস্র মুমুক্ষুদিগের মধ্যে কদাচিৎ কেহ মুক্তলক্ষণ লাভ করেন। আবার সহস্র সহস্র মুক্তজনের মধ্যে কেহ কদাচিৎ সিদ্ধি লাভ করেন। আবার কোটি কোটি সিদ্ধ ও মুক্তজনের মধ্যে কদাচিৎ কেহ সৎসঙ্গ-সুকৃতিবলে নারায়ণপরায়ণ হন। দেখুন, নারায়ণভক্ত প্রশান্তাত্মা, অতএব সুদুর্ল্লভ। এখন দেখুন, দাস্যরসাশ্রিত শুদ্ধ নারায়ণভক্ত যখন এত দুর্ল্লভ, তখন মাধুর্য্যরসাশ্রিত কৃষ্ণভক্ত যে কত দুর্ল্লভ, তাহা আর কি বলিব!

উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তই আমাদের পক্ষে পরম সাধু। কৃষ্ণভক্তসঙ্গই আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন। কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ পাইলে আমাদের যে লাভ হয়, তাহা ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—

"তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রি নিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ॥"

(শ্রীভাঃ ১০।১৪।৩৬)

স্বভাবতঃ বিষয়াবিষ্ট রাগ-দ্বেষ আমাদের সমস্ত স্বত্ব অপহরণ করিয়েছে। আমাদের গৃহ কারাগৃহ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা মোহরূপ অঙ্ঘ্রি নিগড়ে সর্ব্বদা আবদ্ধ আছি। আমাদের কি দুর্দ্দশা! হে কৃষ্ণ! যেদিন তোমার শুদ্ধভক্তসঙ্গে আমাদের তোমাতে মমতা জন্মে, সেইদিন হইতে আমাদের রাগাদি প্রবৃত্তি আর চোরের ন্যায় আচরণ করে না, পরম বন্ধুবৎ আচরণ করিয়া

তোমার ভক্তির চরণে লীন হয়। সেইদিন হইতে আমাদের গৃহ অপ্রাকৃত হইয়া নিত্যানন্দ দান করে। সেইদিন হইতে আমাদের মোহ কেবল ভক্তিসেবক হইয়া আমাদের আত্মোন্নতি বিধান করে। অতএব ব্রহ্মা আবার প্রার্থনা করিলেন,—

"তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্॥"

(শ্রীভাঃ ১০।১৪।৩০)

হে কৃষ্ণ! আমি এই ব্রহ্মজন্মেই থাকি বা অন্য জন্ম লাভ করি বা পশুপক্ষী হই, আমার প্রার্থনা এই যে, আমার সেই ভাগ্য লাভ হউক্, যদ্দ্বারা আমি আপনার ভক্তজনের মধ্যে কেহ হইয়া আপনার পাদপল্লব সেবা করি।

শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের সঙ্গফলেই জীবের এবম্ভূত অসীম অবস্থা লাভ হয়। কি কার্য্য করিলে সাধুসঙ্গ হইতে পারে, ইহার বিচার অতীব প্রয়োজনীয়। অনেকে মনে করেন যে, যাঁহাকে সাধু বলিয়া স্থির করা যায়, তাঁহার পদসেবা, তাঁহাকে প্রণতি, তাঁহার চরণামৃত সেবন, তাঁহার প্রসাদসেবা এবং তাঁহাকে কিছু অর্থ দান করিলেই সাধুসঙ্গ হয়। সেই সমস্ত কার্য্যের দ্বারা সাধুসম্মাননা হয় বটে এবং তাহাতে কোন-না-কোন প্রকার লাভ আছে, কিন্তু তাহাই যে সাধুসঙ্গ, তাহা নয়। সাধুসঙ্গ যেরূপে করিতে হয়, তাহা বলিতেছেন,—

"তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রী-শূদ্র-হূণ-শবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥"

(শ্রীভাঃ ২।৭।৪৬)

'অদ্ভুতক্রম' শব্দে 'শ্রীকৃষ্ণ'। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণ অদ্ভুত ক্রম-পরায়ণ। সেই ভক্তগণের শীল অর্থাৎ স্বভাব ও সচ্চরিত্র যিনি বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষা করেন, তিনি নিশ্চয় ভগবানের মায়াশক্তিকে জানিতে পারেন ; আর কেহ জানিতে পারে না। তিনিই কেবল মায়াসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইতে সক্ষম হন। যে-কোন স্ত্রী, শূদ্র হূণ শবর, অন্য পাপীজীব ও পশুপক্ষী কৃষ্ণ-ভক্তের স্বভাব শিক্ষা করিতে পারেন ; তিনিই অনায়াসে ভব-সাগর পার হইবেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভক্তচরিত্র অনুকরণ করিয়া যে অনায়াসে ভবসাগর পার হইবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি ? তাৎপর্য্য এই যে, বহু শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিলেও মায়াবল অতিক্রম করিতে পারে না ; উত্তম জাতি লাভ করিলেও কোন চরম লাভ হয় না ; শাস্ত্রবিচার দ্বারা শুষ্কবৈরাগ্য অবলম্বন করিলেও সংসার পার হওয়া যায় না। ধন ও সৌন্দর্য্যের দ্বারাও সে-লাভ হয় না। কেবল শুদ্ধভক্ত সাধুগণের স্বভাব ও সচ্চরিত্র বহুযত্নে অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাহা নিষ্কপটে অনুকরণ করিতে পারিলে বিশুদ্ধা কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। বিষয়ীগণ সাধুর নিকট প্রণতিপূর্ব্বক বলিয়া থাকেন,—"হে দয়াময়! আমাকে কৃপা করুন ; আমি

অতিশয় দীনহীন। আমার সংসারবুদ্ধি কিরূপে দূর হইবে?” বিষয়ীর এই বাক্যগুলি কপটবাক্যমাত্র। তিনি মনে জানেন যে, কেবল অর্থলাভই লাভ, বিষয়সংগ্রহই জীবনের উদ্দেশ্য। তাহার হৃদয়ে শ্রীমদ অহরহঃ জাগ্রত আছে; কেবল প্রতিষ্ঠালাভের বাসনা ও ‘সাধুগণের শাপের দ্বারা আমার বিষয় ক্ষয় না হয়’—এই ভয় হইতে তাহার নিকট কপট-দৈন্য ও কপট-ভক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি ঐ সাধু তাহাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন যে, ‘ওহে, তোমার বিষয়বাসনা দূর হউক্ এবং তোমার ধনজন ক্ষয় হউক্’, তখনই ঐ বিষয়ী বলিবেন,—“হে সাধু-মহারাজ! আপনি আমাকে এরূপ আশীর্ব্বাদ করিবেন না। এরূপ আশীর্ব্বাদ কেবল শাপমাত্র – সর্ব্বদা অহিতজনকবাক্য।” এখন দেখুন, সাধুগণের প্রতি এরূপ ব্যবহার নিতান্ত কপট। জীবনে অনেক সাধুজনের সহিত সাক্ষাৎ হয়. কিন্তু আমাদের কপট-ব্যবহারে আমরা সাধুসঙ্গের কোন ফল লাভ করি না। অতএব সরল শ্রদ্ধার সহিত আমরা সংপ্রাপ্ত সাধু-মহাত্মার সচ্চরিত্র নিরন্তর যত্নপূর্ব্বক অনুকরণ করিতে পারিলে সাধুসঙ্গ-দ্বারা আত্মোন্নতি লাভ করি। এই কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া প্রকৃত সাধুর সন্নিকটস্থ হইয়া তাঁহার স্বভাবচরিত্র অবগত হইব এবং যাহাতে আমাদের স্বভাবচরিত্র তদ্রূপে গঠন করিতে পারি, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিব,—ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের শিক্ষা।

—•—

"শিখায়ে শরণাগতি করহে উত্তম"

শ্রীহরিভজনের কথা অনেক শুনিয়াছি (?), শুনিতেছি (?), বলিয়াছি (?), বলিতেছি (?); হরিভজনের ক্রিয়াকলাপের অভিনয়ও অনেক করিয়াছি, করিতেছি; তথাপি চিত্ত মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক কেন, পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন কেন? মনে পড়ে সেই স্মৃতি, যখন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এক একদিন ভোর পাঁচটা হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত বিশ্রামাদি ভুলিয়া গঙ্গোত্রীধারার ন্যায় অবিরাম শ্রীহরিকথা-মন্দাকিনীধারা আমাদের কর্ণে ঢালিয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। অবাক্ হইয়া শুনিতাম, অভিমতও প্রকাশ করিতাম,— "বাঃ, বেশ গাহিয়া গেলেন।" কিন্তু তৎপরমুহূর্ত্তেই শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় "বামুন গেলেন ঘর, লাঙ্গল তুলে' ধর।"—এই চিত্তবৃত্তির যবনিকাপাত হইত। সহস্রাধিকবার সহস্রভাবে সেই শ্রীহরিকথামৃত-প্রপাত-ধারা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আমাদের উপরে বর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সেই সকল কথা অন্যমনস্কতা ও বিক্ষেপের মোহ ভঙ্গ করিবার অভূতপূর্ব্ব দক্ষতা লইয়া আরও তীব্রভাবে সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করিলেও, অনুক্ষণ শাণিত শাসনের মধ্যে আমাদিগকে রাখিলেও কি জানি কি দুর্দ্দৈবফলে হৃদয় একটুকুও গলিতেছে না! হৃদয়ে প্রীতি কোথায়, অভিনিবেশ কোথায়, আবিষ্টতা কোথায়, আঠা কোথায়? বিধির লগুড়, কশাঘাত, শাণিত অস্ত্র—এই সকল কতক্ষণ আমাদের জন্মজন্মান্তরের বিমুখতা-চঞ্চল মনকে উন্মুখতায় রক্ষা করিতে পারে?

মন যে সর্ব্বদাই চঞ্চল, পাগল,—"না মানে শাসন, সদা অচেতন, বিষয়ে রয়েছে ঘোর", "প্রবল ইন্দ্রিয়-বশীভূত মন না ছাড়ে বিষয়-রতি ।" সত্য সত্যই "হার যে মেনেছি আমি" !

স্বাভাবিক প্রীতি বা অনুরাগ না হইলে ধরিয়া বাঁধিয়া কতক্ষণ বিমুখকে উন্মুখ রাখা যায়। শ্রীভাগবত-শ্রবণ, শ্রীমথুরা বাস, শ্রীমূর্ত্তি-সেবন, সাধুসঙ্গ ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন—এই শ্রেষ্ঠ সাধন-পঞ্চক অনুশীলন (?) করিবার অভিনয় করিয়াও অশ্মসার হৃদয় বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় না—হৃদয় গলে না। কত কথা, কত বক্তৃতা, কত গান, কত গ্রন্থপাঠ, কত গ্রন্থ লেখা, কত তীর্থভ্রমণ, কত সাধুর দর্শন-লাভ করিবার অভিনয় হইল, তথাপি হৃদয়ে স্বাভাবিকী অহৈতুকী প্রীতির লেশমাত্রও হইল না! শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভু এইরূপ অবস্থাকে দুরন্ত বৈষ্ণবাপরাধের কারণ বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা ত' পাঠ করি, শ্রবণ করি, বিচার করি ; তথাপি ত' বৈষ্ণবে প্রীতি হয় না, বৈষ্ণবে বৈষ্ণববুদ্ধিই হয় না, আধ্যক্ষিকতা-পিশাচী কিছুতেই আমাকে পরিত্যাগ করে না, নামে রুচি, জীবে দয়াপ্রবৃত্তি ত' উদিত হয় না। নিজের দেহটীকেই সর্ব্বস্ব ও সারাৎসার করিয়া উহারই অভিনিবেশ ও আবেশে মত্ত থাকি। সাধুসঙ্গের ফলে দেহ-গেহ-বিস্মৃতি ও ব্যসনার্দ্দন তীব্র রতি-রাস উদিত হয় ; একথা শ্রবণ করি, পাঠ করি, অপরকে শ্রবণ করাই, বক্তৃতায় বলি, অপরকে শিক্ষা দিবার ধৃষ্টতাও করি ; কিন্তু যখন নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন দেখি, সর্ব্বক্ষণ, সর্ব্বত্র দেহচিন্তা-ব্যতীত, দেহধ্যানব্যতীত আর কিছুই চিত্তে জ্ঞাতসারে

ও অজ্ঞাতসারে, অবশে ও অভ্যাসে আঠার ন্যায় লাগিয়া রহে নাই। শ্রীবাসুদেবে তীব্র রতি-রাস কোথায়? এ কি স্বপ্নের কথা, এ কি প্রহেলিকা, এ কি কেবল কথার ইন্দ্রজাল, এ কি অবাস্তবতা? সেই প্রেমভক্তি-কল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী, মধ্যমূল শ্রীল পরমানন্দপুরী, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপাদি শ্রীগৌরপার্ষদবৃন্দ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর-সরস্বতী-পুরী প্রভৃতি শ্রীগৌরনিজ-জনগণ তাঁহাদের নিত্যারাধ্য-বস্তুর সেবার জন্য যে প্রগাঢ় অভিনিবেশ, আবিষ্টতা, প্রীতিযোগ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ ও দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াও ঐ রতিরাস-সিন্ধুর একবিন্দু লাভের জন্য লৌল্য কোথায়? যদি ঐ প্রীতিযোগ বাস্তব না হয়, তাহা হইলে কি দেহসর্ব্বস্বতাই বাস্তবতা?

পৃথিবীতে দেহ ও দেহস্থ ইন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষ-জ্ঞানই বাস্তব বলিয়া বহুমানিত হয়। চিৎপ্রত্যক্ষকে প্রহেলিকা, কল্পনা কিংবা mysticism এর সহিত সমান জ্ঞান করিবার যে প্রবণতা আধ্যক্ষিক চিন্তাস্রোতে সর্ব্বদা ভাসমান রহিয়াছে, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় কি?

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

"ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার॥"

বাস্তব অনুশীলন ত' করিতে পারিই না, তাঁহার নিকট যে নিজ অযোগ্যতার প্রার্থনা জানাইব, তাহাও হয় না। মরুভূমি-সদৃশ শুষ্ক ও চঞ্চল চিত্ত হইতে প্রার্থনা আসে না। যাহা কিছু

মৌখিক প্রার্থনা করি, ষড়ঙ্গ শরণাগতির কোন অঙ্গই আমাতে না থাকায় সেই প্রার্থনা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছে না।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু পতিতপাবন, শ্রীগুরুদেব পতিতপাবন, তিনি যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার করেন না। এই কথা শুনিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে চিত্তে সাময়িক সাহস হয় বটে, কিন্তু যখন শুনিতে পাই, ষড়ঙ্গ শরণাগতি না হইলে শ্রীনন্দনন্দনের শ্রীচরণান্তিকে প্রার্থনা উপনীত হয় না, তখন নিরাশ হইয়া পড়ি। কিন্তু সেই সময় শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে এক আশার বাণী কর্ণে প্রদান করিয়া বলেন,— কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের শ্রীপাদপদ্মে হৃদয়ের কথা জানাও,—"আমি অতি অধম, পতিত; আমার বিন্দুমাত্রও শরণাগতি নাই, আমাকে শরণাগতি শিক্ষা দিয়া উত্তম করিয়া লও। কিসে ভাল হয় তাহা ত' আমি বুঝি না। যাহাতে আমার ভাল হয়, তাহাতে আমাকে স্বাভাবিকী মতি দাও। আমি ত' মূর্খ, অজ্ঞ, আমার পক্ষে যাহা মঙ্গলকর, তাহাকে আমি অমঙ্গলজনক মনে করি। 'মূঢ়ের মঙ্গল তুমি অন্বেষিবে এ দাসে না ভাব পর'। এই বলিয়া ক্রন্দন কর,—

"গোপীনাথ, আমার উপায় নাই।
তুমি কৃপা করি', আমারে লইলে
সংসারে উদ্ধার পাই॥
গোপীনাথ, হার যে মেনেছি আমি।
অনেক যতন, হইল বিফল,
এখন ভরসা তুমি॥"

যখন এইরূপভাবে প্রার্থনা করি, তখন মন সাময়িকভাবে একটুকু দমিত হয় বটে, কিন্তু বাস্তব স্বাভাবিক প্রীতিযোগ ত' হৃদয় হইতে প্রকাশিত হয় না। যে যোগ কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না, যে অভিনিবেশ কখনও ভঙ্গ হয় না, যে ধ্যানে কখনও বিক্ষেপ নাই, সেইরূপ স্বাভাবিক নিত্যাবস্থা কি করিয়া লাভ হইবে ?

দুর্ব্বল জীবের ক্রন্দন-ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। সকলের বহু সাধন ও সাধ্য আছে, কিন্তু দুর্ব্বলের উপায় ও উপেয় একমাত্র ক্রন্দন। তাই শরণাগতির শিক্ষক শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের শ্রীপাদপদ্মযুগলে যেন তাঁহারই শিক্ষার অনুসরণ করিয়া বলিতে পারি,—

'কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে আমি ত' অধম।
শিখায়ে শরণাগতি কর হে উত্তম ॥"

আবাল্য জড়সুখের সঙ্গ করিতে করিতে সর্ব্বক্ষণ জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে দেহের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে এই দেহ শরণাগতি-শিক্ষার সম্পূর্ণ প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যখন প্রার্থনা করি, তখনও দেহের সুখদুঃখের চিন্তা উপস্থিত হয়, দেহের সুখে সুখী ও দেহের দুঃখে দুঃখী হইয়া পড়ি ; যখন আত্মনিবেদন করিবার জন্য চিত্ত একটুকু ব্যাকুল হয়, তখন কোথা হইতে দেহস্মৃতি আসিয়া সেই ব্যাকুলতাকে শিথিল ও স্তব্ধ করিয়া দেয়, কৃপা-লাভের জন্য ক্রন্দন থামিয়া যায়, তখন দেহের সুখদুঃখে চিত্ত অভিভূত হইয়া পড়ে। মায়ার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল, নির্দ্দিষ্ট আয়ু ফুরাইয়া গেল, তথাপি শরণা-গতির জন্য চিত্ত অবিচ্ছিন্নভাবে ব্যাকুল হইল না।

"শৈশব যৌবনে, জড়সুখসঙ্গে,
অভ্যাস হইল মন্দ।
নিজকর্ম্ম-দোষে, এ দেহ হইল,
ভজনের প্রতিবন্ধ॥
বার্দ্ধক্যে এখন, পঞ্চরোগে হত,
কেমনে ভজিব বল।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, তোমার চরণে,
পড়িয়াছি সুবিহ্বল॥

* * *

যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হ'লে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
প্রাণ না রাখিব আর॥"

—এরূপ-কথা হৃদয় হইতে বলিতে পারি কোথায়? ক্রন্দন করিতে করিতে যদি প্রাণপাত করিতে পারিতাম, তবে বুঝিতাম যে, আমি দুর্ব্বল হইলেও শ্রীবলদেবের বল সত্য সত্যই প্রার্থনা করি। কিন্তু ক্রন্দন করিতে করিতে পাছে দেহারামতা নষ্ট হয়, সেদিকে তীব্র দৃষ্টি রহিয়াছে! যখন এই-দেহের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, তখন তাহাকেও যদি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা বলিয়া বরণ করি, তবে মঙ্গল হইতে পারে এবং সেইরূপ অবস্থাতেও যদি শরণাগতির-শিক্ষকের নিকট কাঁদিয়া রূপ বিচারটী হৃদয়ে উপস্থিত হয়,

কাঁদিয়া শরণাগতি-শিক্ষা প্রার্থনা করিতে পারি, তবুও মঙ্গল সুদূর-পরাহত হইবে না।

শ্রীশ্রীগদাধর-মিত্রবর শ্রীশরণাগতি-শিক্ষক শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীচরণে আমি যেন নিয়ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া কেবল এই প্রার্থনা জানাইতে পারি—শত শত অযোগ্যতা, অসামর্থ্য, অজ্ঞানতা, মূঢ়তার মধ্যেও যেন মুহূর্ত্তের জন্যও এই প্রার্থনাটী না ভুলি,—

'শিখায়ে শরণাগতি কর হে উত্তম।'

—০—

কৃপণ

'কৃপণ'-শব্দে সাধারণতঃ 'ব্যয়কুণ্ঠ', 'অনুদার' ব্যক্তিকেই বুঝায়। কিন্তু শ্রুতিতে 'কৃপণ'-শব্দের একটী বিশেষ অর্থ দৃষ্ট হয়। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে মহর্ষি শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য শ্রীগার্গীকে বলিতেছেন,—

"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ"।

(বৃহদারণ্যক ৩।৮।১০)

হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অক্ষর-পরব্রহ্মকে না জানিয়াই এই পৃথিবী হইতে চলিয়া যায়, সে ব্যক্তি **কৃপণ**।

শ্রুতির এই মন্ত্রের তাৎপর্য্যানুসারে যে ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করে নাই, সে-ই **'কৃপণ'**। যিনি ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, শ্রুতি তাঁহাকে 'ব্রাহ্মণ' বলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত-ধর্ম্মে কৃপণের অত্যন্ত নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায়। কৃপণগণ নিজের ভোগের জন্যও ব্যয় করে না, শ্রীভগবানের সেবার জন্যও ব্যয় করে না। ইহাদের ন্যায় দুর্ভাগ্য জীব আর নাই। ইহাদের কোনদিন মঙ্গল হইবে না। যাহারা ভোগের জন্য অর্থ ব্যয় করে, তাহারা কোন-না-কোনদিন হয় ত' শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা লাভ করিতে পারে। আর যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার জন্য অর্থ ব্যয় করেন, তাঁহাদের ভক্তিলাভ হয়। কিন্তু কৃপণগণ অদোষদর্শী পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা পর্যন্ত লাভ করিতে পারে না, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে ভক্তিলাভ ত' দূরের কথা।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কৃপণদিগকে 'অযাত্রা' বলিতেন। ভ্রমেও তিনি তাহাদের নাম-উচ্চারণ করিতেন না। তিনি বলিতেন,—"উহাদের নাম করিলে পিতলের হাঁড়ি পর্য্যন্ত ফাটিয়া যায়, সারাদিন উপবাসী থাকিতে হয়, সে-দিন আর কোনও সৎকার্য্য হয় না।" যাহারা হরিভজন করে না, অথচ ব্যয়কুণ্ঠতানিবন্ধন বৈরাগ্যের পোষাক ধারণ করে, তাহারা তপোবেষোপজীবী পাষণ্ডী; তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৈষ্ণব-বিরোধী, কুটিল ও জড়াসক্ত। ইহাদের জড়াসক্তির নোঙর পোতা রহিয়াছে; ইহারা কেবল ক্ষৌরকারের পয়সা বাঁচাইবার জন্য চাতুর্ম্মাস্যে দাড়ি রাখে—ব্যয়-সঙ্কোচ করিবার জন্য আহার-সঙ্কোচ, পরিধেয়-সঙ্কোচ করিয়া থাকে। ইহাদের কৃষ্ণপ্রীত্যে ভোগত্যাগের বিন্দুমাত্রও চেষ্টা হয়

নাই। ইহাদের যে বৈরাগ্যের অভিনয়, তাহা অত্যন্ত জড়াসক্তি ও ব্যয়কুণ্ঠতারই প্রতীকবিশেষ। ইহাদের মুখদর্শন করিলে সচেল গঙ্গাস্নান করা কর্ত্তব্য। 'গৌড়ীয়' ও 'নদীয়া-প্রকাশে'র গ্রাহক হইবার সময় বা তজ্জন্য ভিক্ষা প্রদান করিবার সময় ইহাদের অর্থের অভাব দৃষ্ট হয়। ইহারা সেই অর্থ বাঁচাইয়া ও বৈরাগ্যের বেষ দেখাইয়া অর্থসঞ্চয় করে। এই প্রকার চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভক্তির বিরোধী। এক মায়াবাদী ভক্তির বিরোধী—অপ্রাকৃত-তত্ত্বের চরণে অপরাধী, আর কৃপণও ভক্তির বিরোধী। যাহারা অর্থলাভের আশায় সেই কৃপণদিগকে ভজনা করে, তাহাদিগকে তোষামোদ করে, তাহারা পশু হইতেও পশু; তাহাদেরও সমস্ত সুকৃতি বিনষ্ট হইবে। কৃপণের কাণাকড়ি গ্রহণ করিলে বহুকাল পূর্ব্বে উদরস্থ অন্নপ্রাশনের অন্নের লেশমাত্র থাকিলে তাহাও বমন হইয়া যায়।

ব্যয়কুণ্ঠতা অত্যন্ত অপরাধের ফল। এই বাস্তবসত্যকথা যে বিশ্বাস করিবে না, সেইব্যক্তিও নিশ্চয়ই শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর বিরোধী। অতএব তাহাকে শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুর বিরোধী বলিয়াই জানিতে হইবে। সুতরাং সে কোন জন্মেই শ্রীযুগল-সেবা পাইবে না।

কৃপণের প্রতি কোনদিনই শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর ও তাঁহার দাসগণের কৃপা হইবে না। কৃপণ হইতে ম্লেচ্ছ বরং ভাল। ম্লেচ্ছ, বৈষ্ণবঠাকুর শ্রীল গদাধরদাস প্রভুর কৃপা পাইতে পারেন; কিন্তু কৃপণের প্রতি বৈষ্ণবঠাকুরগণ কখনও দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন না।

হিমালয়ের ন্যায় বিরাট্ অপরাধের স্তূপ সঞ্চিত হইলে জীব কৃপণ হয়। শ্রীপ্রকাশানন্দ তত্ত্ববিষয়ে অপরাধ করিবার লীলা-প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু কৃপণ তদপেক্ষা অধিক অপরাধী। মহা-মহা-পাষণ্ডীর প্রতিও পতিতপাবন বৈষ্ণবগণ সদয় হইয়াছেন; কিন্তু ব্যয়কুণ্ঠের প্রতি তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টি পতিত হয় নাই। এজন্য শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু গৃহস্থগণের পক্ষে পরিচর্য্যামার্গের বিধি প্রদান করিয়াছেন। তাহারা যদি বিত্তশাঠ্য করে, তবে নিশ্চয়ই নরকভাগী হইবে। পৃথিবীতে যত ভাল ভাল জিনিষ আছে, সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের ভোগে লাগাইয়া গৃহস্থগণ সেই প্রসাদ বৈষ্ণবগণকে প্রদান করিবেন, নিজে গ্রহণ করিবেন না; করিলে প্রসাদে ভোগবুদ্ধি হইবে, প্রসাদের কৃপা লাভ করিতে পারিবেন না।

শ্রীগৌরপার্ষদ গৃহস্থগণ কিরূপ উদার ছিলেন! শ্রীগৌর-সুন্দর শ্রীশিবানন্দ সেনকে অসঞ্চয়ী শ্রীল বাসুদেবদত্ত ঠাকুরের তত্ত্বাবধায়ক হইয়া তাঁহার ব্যয় সমাধান করিতে বলিয়াছিলেন—

"শিবানন্দ সেনে কহে করিয়া সম্মান।
বাসুদেব-দত্তের তুমি করিহ সমাধান॥
পরম উদার ইঁহো, যেদিন যে আইসে।
সেই দিনে ব্যয় করে, নাহি রাখে শেষে॥
ইঁহার ঘরের আয়-ব্যয়, সব—তোমার স্থানে।
'সরখেল' হঞা তুমি করিহ সমাধানে॥"

শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।৯৩,৩০,৯৬)

শ্রীল বাসুদেব-দত্ত ঠাকুর এইরূপ 'পরম-উদার' ছিলেন বলিয়াই জীবের দুঃখে তাঁহার চিত্ত বিগলিত হইত। এইজন্যই তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন,—

"জীবের দুঃখ দেখি' মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্বজীবের পাপ প্রভু দেহ' মোর শিরে॥
জীবের পাপ লঞা মুঞি করোঁ নরক ভোগ।
সকল জীবের, প্রভু, ঘুচাহ ভবরোগ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫। ৬২-১৬৩)

স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার গৃহস্থ-লীলায় যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীশ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন,—

"প্রভু সে পরম-ব্যয়ী ঈশ্বর-ব্যভার।
দুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার॥
দুঃখীরে দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি'।
অন্ন, বস্ত্র, কড়ি-পাতি দেন গৌরহরি॥
নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু-ঘরে।
যার যেন যোগ্য, প্রভু দেন সবাকারে॥
কোনদিন সন্ন্যাসী আইসে দশ বিশ।
সবা' নিমন্ত্রেন প্রভু হইয়া হরিষ॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১১-১৪)

"কৃপণ অতিথিসেবা, তীর্থভ্রমণ প্রভৃতি দূরে থাকুক্ আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়া অর্থসঞ্চয় করে। যে-ব্যক্তি ব্যয়কুণ্ঠ, বিত্তশঠ, তাহার

হৃদয় কখনও জীবের দুঃখে ব্যথিত হয় না। পশুঘ্ন ব্যাধের হৃদয় হইতেও তাহার হৃদয় অধিকতর কঠিন। ব্যয়কুণ্ঠের হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের অভিনয় কেবল কাপট্যমাত্র। উহা আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার কৌশল-বিশেষ। তাহার হরিকথায় বিন্দুমাত্রও রুচি নাই। তাহার জড়াসক্তির নোঙর সপ্ত অধোলোক পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কাজেই সে দ্রবিণ বা কনককে নিজরক্ত হইতেও অধিক মূল্যবান্ মনে করে এবং নিজের পূর্ণ-মাত্রায় দেহাত্মবোধ থাকা সত্ত্বেও দেহারামতাকে উৎসর্গ করিয়া ব্যয়কুণ্ঠতারূপ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-সাধন করিয়া থাকে। এইরূপ ব্যক্তির ভগবানে প্রীতি হওয়া অসম্ভব। এইজন্যই শ্রুতিমন্ত্র যে ব্যক্তি শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করে নাই, তাহাকে 'কৃপণ' বা 'শূদ্র' বলিয়াছেন। ব্যয়কুণ্ঠ কখনও ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবে না। পাছে একটি কাণাকড়ি নষ্ট হয়, এইজন্য কৃপণের চিত্ত সর্ব্বদা ভয়াকুল ; অতএব সে শূদ্রাধম।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীবৈষ্ণবঠাকুরগণ "দীনবন্ধু", "পতিতের বন্ধু" প্রভৃতি নামে খ্যাত। কিন্তু তাঁহারা কখনও 'কৃপণবন্ধু' বলিয়া পরিচিত নহেন। 'দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।' কিন্তু কৃপণকে দয়া করেন বলিয়া কোথায়ও নাই। বৈষ্ণব-পদকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দ দাস গাহিয়াছেন,—

"শীত আতপ বাত বরিষণ
এ দিন-যামিনী জাগি' রে।

বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন
চপল সুখলব লাগি' রে।"

কৃপণ-দুর্জ্জনের সেবা করিলে ধন ত' লাভ হয়ই না, পরন্তু নিজের ধন, যৌবন, শক্তি, সামর্থ্য সমস্ত নিঃশেষিত হইয়া পরিণামে হতাশ হইতে হয়। অতএব হে সাধো, কৃপণ হইতে সাবধান! শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর কৃপা-কশাঘাতে যদি আমার ন্যায় কোন কৃপণ নির্ব্বেদ-গ্রস্ত হইয়া শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় আত্মনিয়োগ করে, তবেই মঙ্গল, নতুবা আর রক্ষা নাই।

—০—

শ্রীল গুরুমহারাজের বাণী

মঙ্গল পেতে হলে, ভগবানের কৃপা পেতে হলে চিত্তকে নির্মল করবার চেষ্টা করতে হবে। এটাই বদ্ধজীবের প্রথম ও প্রধান সাধন। চিত্ত নির্মল না হ'লে সাধন ফলদায়ক হয় না। চিত্তকে নির্মল করতে হলে, নিজেকে খুব ছোট ভাবতে হ'বে বা দেখতে হ'বে। শুধু মুখে বলা নয় অন্তরে অনুভব করতে হবে। তখন ব্যবহারে নম্রতা আসবে. দম্ভ থাকবে না। তখন সকলের মধ্যে যেটা ভালগুন, সেটাই নজরে পড়বে। অন্যের দোষ দেখার প্রবৃত্তি কমে যাবে। অন্যের দোষ না দেখে অন্যের গুণ দেখতে শিখলে মঙ্গল লাভ সুনিশ্চিত। আমার নিজের কত শত দোষ রয়েছে—সেইগুলির চিন্তা করতে হবে। বদ্ধজীব মায়ার প্রভাবে নিজের দোষ দেখতে পায় না বা বুঝতে পারে না। এটাই বদ্ধজীবের বদ্ধতা এবং defect বা গলদ। এই গলদ বা ভুল যত কম হতে থাকবে, ততই চিত্ত সুন্দর হবে। তখন ছোট, বড় সকলের প্রতি সম্মান দিতে ইচ্ছা হবে। ঘৃণার পাত্র কেউ থাকবে না অর্থাৎ কাউকে আর ঘৃণা করতে পারবে না। সকলেই সম্মানের পাত্র এইরূপ চিত্তে অনুভব হবে—এটাই আনন্দের পথ, সকলের প্রতি ভালবাসা আসবে, অনর্থ চলে যাবে। সকলের মধ্যে ভগবান রয়েছেন এটা অনুভব হবে। কাহারও প্রতি বিদ্বেষ করলে ভগবানের প্রতি বিদ্বেষ করা হয়, এই জ্ঞান হবে।

অপরের দোষ একেবারেই দেখবে না, যদি অপরের দোষ তুমি দেখতে থাকো. তখন জানতে হবে, তোমার মধ্যে ঐ দোষ প্রবলভাবে রয়েছে, তোমার জড়বুদ্ধিতে তুমি বুঝতে পারছ না। যতই সাধন ভজন করা যাক পর বিদ্বেষ নিয়ে পরচর্চা করলে নিজের পায়ে কুড়ুল মারা হবে এবং কড়ায় গণ্ডায় সেই অপরাধের মাশুল জন্মে জন্মে দিতে হবে। তাই মহাপ্রভূ বললেন,—"অপরাধ শূন্য হয়ে লহ কৃষ্ণ নাম"। ভজন করতে হলে সাবধান হতেই হবে, নিজের খেয়াল বা whims-কে প্রাধান্য দিলে হবে না। আমি ওসব জানি. আমাকে আর জানতে হবে না, এটা ভয়ানক দাম্ভিকতা। এটা মঙ্গলের পথ নয়। গুরু বৈষ্ণবের কথা শুনতে হবে।

অনেক কষ্টের পর এই মানব জীবন পাওয়া গেছে, একে সার্থক করতে হলে, মঙ্গল পেতে হলে চিত্তকে নির্মল রাখার সাধন অত্যন্ত প্রয়োজন। নির্মল চিত্তে ভক্তি দেবীর আবির্ভাব হয়। সুতরাং বর্তমান কর্মগুলি যাতে অপরাধমূলক না হয়, তার জন্য যত্নবান হওয়া অত্যাবশ্যক। মঙ্গল পেতে হলে, ভগবানের কৃপা পেতে হলে, এটাই সরলপথ।

—:০:—